ধূমপান: স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক দিক/ জোলাপ চিকিৎসা যেখানে
কেন এত/ নিষিদ্ধ ওষুধ - কি ও কেন/ পেপটিক আলসারে স

প্রেসক্রিপশন

নুরুল ইসলাম

যেখানে সংকট/ কেন এত ওষুধ— প্রতিরোধে সম
সঙ্গে / কিডনী রোগে করণীয়/ যদি ঘুম না
যদি/ হৃদ রোগ: চিকিৎসকের দোষে/ এ তিন
সাবধান/ যে দু'টো ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভ
সর্বনাশা/ আপনি ধূমপান না করলেও / খা
কুসংস্কার / হজমীতে টাকা হজম/ জোল
যন্ত্রণা/ কিডনী রোগে করণীয়/ বহুমূত্রের
দিক/ অতি প্রিয় অথচ অপ্রয়োজনীয়
নেশাসর্বনাশা/ আমাশয়ে অমানি
/প্রতিরোধে সমাধান/ প্রশান্তিতে মু
শতাব্দীর অভিশাপ এইডস / প্রশা

প্রেসক্রিপ্‌শন

জাতীয় অধ্যাপক (ডা:) নুরুল ইসলাম

এম.বি.(কলি), টি.ডি.ডি.(ওয়েল্‌স), এফ.সি.সি.পি.(আমেরিকা),
এফ.সি.পি.এস.(পাক), এফ.আর.সি.পি.(লন্ডন),
এফ.আর.সি.পি.(এডিন), এফ.এ.এস.(বাংলাদেশ)।

প্রেসক্রিপ্শন

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৫

তৃতীয় সংস্করণ : ২৬শে মার্চ, ১৯৯৪

প্রকাশনায় : আনোয়ারা ইসলাম ও নীনা ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : আনোয়ারা-নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

'গুলমেহের'
৬৩ সেন্ট্রাল রোড
ঢাকা–১২০৫

কম্পোজ : নূশা কম্পিউটারস
৩৪ আজিমপুর সুপার মার্কেট
ঢাকা – ১২০৫

প্রচ্ছদ : কাইয়ূম চৌধুরী

মুদ্রণে : মমিন অফসেট প্রেস
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা – ১২০৫

মূল্য : সাদা - ১৩০.০০
অফসেট - ১৫০.০০

Prescription : A Compilation of Articles against misuse and overuse of drugs, and on general health guidance by Dr. Nurul Islam, Published by Anwara Islam and Neena Islam, 'Gulmeher', 63 Central Road, Dhaka 1205, Bangladesh. Revised 3rd Edition 26th March1994. Composed at Nusha Computers, 34 Azimpur Super Market, Dhaka. Printed at Momin Offset Press, 9, Nilkhet Babupura, Dhaka-1205. Price : Tk. White One hundred Thirty, Offset One hundred Fifty.

রোগের বিরুদ্ধে যাদের সংগ্রাম
রোগীর সেবায় যারা নিবেদিত
তাদের উদ্দেশ্যে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁরা যেভাবে সাহায্য করেছেন

পত্র–পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখায় :
স্ত্রী আনোয়ারা, মেয়ে দীনা ও নীনা

পাণ্ডুলিপি লেখায় :
ডা: আবদুল ওয়াদুদ, ড: সিরাজুল করিম,
ডা: লুৎফর রহমান, ডা: নাসির, মনফিক, রহিম

প্রবন্ধ সংকলনে :
অধ্যাপক মাহমুদ হাসান (পেপটিক আলসার সমাচার),
অধ্যাপক হারুন–উর রশিদ (কিডনী রোগে করণীয়),
অধ্যাপক মবিন খান (হেপাটাইটিস সি ও ই),
ডা: তাহমিনুর রহমান ও অধ্যাপিকা হাজেরা মাহতাব (বহুমূত্রের কয়েক দিক)

ছাপাখানায় সংযোগ রক্ষায় :
সুকুল মিত্র বড়ুয়া

সার্বিক মুদ্রণ–তত্ত্বাবধানে, মুদ্রণ–প্রমাদ বর্জনে,
বানানের ভুল সংশোধনে :
আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রোগের চিকিৎসায় ওষুধ ব্যবসায়ী, রোগী এবং চিকিৎসক এই তিন গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব এমন ওষুধ তৈরি করা যা অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর নয়। প্রচারপত্র এমন হতে হবে যাতে উপকারিতা সম্বন্ধে অহেতুক দাবি থাকবে না, অপকারিতা কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গোপন করা হবে না। মোট কথা, সহজ সরল ভাষায় জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে এমন করে বিভিন্ন উপায়ে, যথা : লেখা, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। ওষুধনীতিতে যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে। এতে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা পাবে, ওষুধ প্রস্তুতকারকদের স্বার্থে কোন আঘাত আসবে না। জনবহুল বাংলাদেশে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ওষুধ কোম্পানীগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, এই ধারণা অবাস্তব।

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ১৫০টি ওষুধ কয়েকটি জটিল রোগ ছাড়া প্রায় সব রোগের জন্য যথেষ্ট। ওষুধনীতির ফলে কোন রোগী বিশেষ কোন ওষুধের অভাবে মারা যেতে পারে বলে কেউ যদি দাবি করে, সেটা সত্য নয়। ১৫০টি ওষুধ ছাড়াও অতিরিক্ত ১০০টি ওষুধ নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেগুলো বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ক্যান্সারের মতো অনেক জটিল কিংবা বিশেষ রোগে ব্যবহৃত হবে। তাহলে দেখা গেল আইনের আওতায় ২৫০টি ওষুধ বাংলাদেশে চালু থাকবে। বহুজাতিক আলোচনার ভিত্তিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওষুধের তালিকায় মোট ২৫০টি ওষুধ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের অধিকাংশ রোগী চাহিদা অনুসারে খাবার পায় না। তার উপর ওষুধের খরচের বোঝা এদের দৈনন্দিন জীবনে একটা আঘাত। বাঁচার তাগিদে ওষুধ যেখানে অপরিহার্য, তা তাদের পেতে হবে। তবে দেখতে হবে এই ওষুধের পেছনে সামান্য আয়ের সবটুকু ব্যয় করে অনাহারে তারা যেন মারা না যায়। তাদের সামর্থ্য বিবেচনা করে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহারের সুব্যবস্থা করতে হবে। কি ধরনের প্রেসক্রিপশন তাদের দিতে হবে, সেটাই এখানে বিচার্য। সামান্য সর্দির জ্বরে সস্তা এসপিরিন না দিয়ে ব্যয়বহুল এন্টিবায়োটিক প্রদান করা ন্যায়নীতি–বহির্ভূত ; এবং তা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা বা প্রেসক্রিপশন নয়। এখানেই চিকিৎসকের দায়িত্ব। যেহেতু বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীল, এবং চিকিৎসক বলতে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রামীণ ডাক্তার থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক সবাইকে বুঝায়, আর শতকরা ৮০ ভাগ লোক শিক্ষিত চিকিৎসকের নাগাল পায় না, সেখানে এমন

একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জনসাধারণ এবং যাদের উপর তারা চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল, তারা যেন বিভিন্ন উপায়ে বিভ্রান্ত না হয়। কোম্পানীগুলোর প্রচার-মাধ্যম যেমন : প্রচারপত্র বা তাদের প্রতিনিধি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুসরণ করে এদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবে। সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকের দায়িত্ব এখানে নগণ্য নয় বরং অপরিসীম। তাঁরা যা লেখেন, তাঁরা যা করেন, আর সবাই তা অনুকরণ বা অনুসরণ করে। তাঁদের সঠিক নির্দেশ শুধু রোগী নয় গোটা চিকিৎসকগোষ্ঠীকে ঠিক পথে চলতে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে তাঁদের ভুলের মাশুল দিতে হয় অগণিত ব্যাধিগ্রস্ত জনসাধারণকে।

বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে এই সংকলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রচিত হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু নতুন লেখাও সংযোজিত হয়েছে। অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে চিকিৎসাক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করেই অধিকাংশ লেখা।

বাংলাদেশের ওষুধনীতি দেশ-বিদেশে এখন স্বীকৃত এবং অভিনন্দিত। কেন এই ওষুধনীতি — তা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে। ওষুধনীতির নীতিমালা, কিছুসংখ্যক ওষুধের বর্ণনা, ক্ষতিকর ওষুধের তালিকা সকলের উপকারে আসবে এই বিশ্বাসে সংযোজিত হয়েছে।

বহুজাতিক কোম্পানীর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকমহল তার প্রত্যুত্তরে কি বলেছেন বা প্রকাশ করেছেন, সকলের গোচরে আনার প্রয়াসে কিছুটা সন্নিবেশিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিনন্দনবাণী এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ছোটখাট একটা গ্রন্থে পরিণত হবে বিধায় মাত্র কয়েকটা বাছাই করে নেয়া হয়েছে।

কোন পেশাকে হেয় করা কিংবা কাউকে ছোট করে দেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসকসমাজ নিজেদের দায়িত্ব পালনে বাধার সম্মুখীন হবেন না, দুঃস্থ দরিদ্র জনগণ অযথা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পেছনে সীমিত সম্পদের অপচয় করবেন না, ব্যবসায়ীমহল মুনাফার লোভে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না — এই সংকলন এমন একটি প্রেসক্রিপশন।

নুরুল ইসলাম

গুলমেহের
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'প্রেসক্রিপশন'-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তৃতীয় সংস্করণ সময়মতো উৎসাহী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারিনি বলে দুঃখিত।

বেসরকারী পর্যায়ে দেশে প্রথম বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে আমাকে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে — শারীরিক ও মানসিক উভয় পর্যায়ে। নিতান্ত নিঃসঙ্গ না হলেও সক্রিয় সঙ্গীর প্রকট অভাব অনুভব করেছি। তবে কয়েকজন নিঃস্বার্থ সহকর্মীকে নিয়ে আমার প্রতিষ্ঠিত আই.এ.এইচ.এস. থেকে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলাভে গুণী পাঠকসমাজ আমার আনন্দের এবং গৌরবের অংশীদার হবেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এমন একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সানন্দে তুলে ধরলাম। কারণ সহৃদয় পাঠকদের অনুরোধ সত্ত্বেও এ ব্যস্ততার কারণে তৃতীয় সংস্করণ সময়মতো প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

বিলম্বিত তৃতীয় সংস্করণ নতুন প্রবন্ধ সংযোজনে সমৃদ্ধ। এতে 'কিডনী রোগে করণীয়', 'পেপটিক আলসার সমাচার', 'বহুমূত্রের কয়েক দিক', 'প্রতিরোধে সমাধান', 'নেশা সর্বনাশা', এমনকি 'শতাব্দীর অভিশাপ এইডস্', সবশেষে 'প্রশান্তিতে মুক্তি' সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ফলে নতুন সংস্করণ কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে তার বিচার পাঠকদের হাতে।

স্বাস্থ্য বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের লোককে সজাগ করে তোলার উদ্দেশ্যে 'প্রেসক্রিপশন'-এর জন্ম। এ প্রেসক্রিপশন ওষুধের নয়, ওষুধের অপব্যবহার প্রতিরোধের, সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের। বিগত দিনগুলো প্রমাণ করেছে এমন একটি প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। দেশ-বিদেশে এর সুনাম আমাকে একদিকে যেমন উৎসাহিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে তুলেছে বহুগুণ। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হয়তবা কোথাও না কোথাও কিছু না কিছুর অভাব রয়ে গেছে। গঠনমূলক সমালোচনা ভবিষ্যতে এর সমাধানের সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'প্রেসক্রিপশন'-এর আগামী দিনগুলো সুখের হোক, সুন্দর হোক, এর অগ্রযাত্রা সুগম হোক এই কামনা করি।

গুলমেহের **নুরুল ইসলাম**

সূচীপত্র

চিকিৎসা যেখানে সংকট	১
কেন এত ওষুধ	১৬
সব অসুখে ওষুধ লাগে না	২৪
যদি ঘুম না হয়	৩০
হৃদ্‌রোগ: চিকিৎসকের দোষে	৩৫
এ তিন থেকে সাবধান	৪১
যে দু'টো ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব	৪৭
ধূমপান : স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক দিক	৫৩
আপনি ধূমপান না করলেও . . .	৫৭
খাবারে কুসংস্কার	৬০
ভোজনে ওজন	৭৩
হজমীতে টাকা হজম	৭৯
জোলাপে যন্ত্রণা	৮৫
আমাশয়ে অমানিশা	৯২
গর্ভবতী মায়ের জন্য	৯৭
অতি প্রিয় অথচ অপ্রয়োজনীয়	১০২
যা না হলে চলে	১০৭
নিষিদ্ধ ওষুধ — কি ও কেন	১১৬
কিডনী রোগে করণীয়	১৩০
পেপ্‌টিক আলসার সমাচার	১৩৫
বহুমূত্রের কয়েক দিক	১৪১
প্রতিরোধে সমাধান	১৪৮
নেশা সর্বনাশা	১৫২
শতাব্দীর অভিশাপ এইডস্‌	১৫৭
প্রশান্তিতে মুক্তি	১৬৫
গ্রন্থকারের সাথে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাক্ষাৎকার	১৭০
ওষুধনীতি প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকার মতামত	১৮৪
গ্রন্থকারের কাছে কয়েকটি পত্র	১৮৮

চিকিৎসা যেখানে সংকট

বাংলাদেশে সোয়া এগার কোটি লোকের বাস। আর পাস করা ডাক্তার আছেন সাকুল্যে ষোল হাজার। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত হাজার লোকের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু পাস করা ডাক্তারদের শতকরা ৯০ ভাগই বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আর্থিক কারণে বসবাস করেন শহরে। প্রতি সাড়ে সাত হাজারের জন্য হিসেবমতে একজন ডাক্তার হলেও আসলে গ্রামাঞ্চলের প্রতি পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লোকের জন্য আছেন মাত্র একজন ডাক্তার। এদিকে শহরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি দেড় হাজারে একজন।

গ্রাম এবং শহরে লোকসংখ্যা ও ডাক্তারের অনুপাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকলেও উন্নত দেশের তুলনায় এবং চাহিদা অনুসারে এদেশে ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। অনেকে গর্ব করে বলে থাকেন, বিগত কয়েক বছরে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭টি থেকে ১১টিতে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৮টি কলেজে ক্লিনিক্যাল বিভাগ আছে। ঢাকায় আছে ২টি। এছাড়া বিশেষ ধরনের ইন্‌স্টিটিউট রয়েছে যেমন পি.জি., বক্ষব্যাধি, হৃদ্‌রোগ, পঙ্গু চিকিৎসা ইত্যাদি — এগুলোর সবই রাজধানী ঢাকায়। চিকিৎসক এবং চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টন এই ব্যবধানকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এই কারণে গ্রামবাংলার জনগণ ও শহরাঞ্চলীয় লোকদের রাজধানীর বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আবার এসব চিকিৎসকদের অনেকেরই ন্যূনতম যোগ্যতাও নেই।

কলেজ এবং ইনস্টিটিউটগুলোর সংখ্যা নগণ্য না হলেও এগুলো শিক্ষা এবং পেশাগত যোগ্যতার মান নিরূপণে কতটুকু অবদান রাখছে, তা ভেবে দেখার মতো। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কারণ অনেক। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা-বহির্ভূত নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলি এর অন্যতম। তাছাড়া শিক্ষক এবং এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে পেশাগত যোগ্যতার মান নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। যদিও অনেক উন্নয়নশীল দেশে বহুকাল থেকে এটা প্রচলিত আছে। শিক্ষার্থীদের ব্যালটের মাধ্যমে শিক্ষক যাচাই অনেক দেশে চালু আছে। সন্দেহাতীতভাবে এটা শিক্ষকের মান বাড়ায়। এ ধরনের একটা ব্যবস্থা না থাকা বাংলাদেশের জন্য বিরাট এক প্রশাসনিক দুর্বলতা। ফলে অনেক অযোগ্য, এমনকি অপদার্থ ব্যক্তি বিভিন্ন কলাকৌশলে শিক্ষাঙ্গনে এমন স্থান দখল করে আছে যা জাতির জন্য দুঃখজনক এবং শিক্ষার্থী তথা রুগ্ন জনগণের জন্য বিপদজনক। ফলে অসহায় ছাত্ররা যেমন তাদের হাতে বিপথগামী হয়, তেমনি রোগীরাও উপশমের স্থলে সংকটের সম্মুখীন হন। এই নিবন্ধে চিকিৎসা কিভাবে সংকটে পরিণত হতে পারে, তাই আলোচিত হয়েছে।

রোগের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসংখ্য

প্রত্যেক চিকিৎসকের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে অন্ততঃ কিছুটা সময় নিয়ে মনোযোগ দিয়ে রোগের ইতিহাস জানা। অথচ তাড়াহুড়ো করে রোগীকে বিদায় দিতে গিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে যায়। তার পরিণতি হিসেবে অনেক ব্যয়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং উপদেশ দেয়া বর্তমানে চিকিৎসকদের কারও কারও নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এতে একজন অসহায় রোগীর কিভাবে শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে, তার দু'একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরব।

সেদিন এক তরুণী পেটের উপরিভাগে সামান্য অস্বস্তি, বুক জ্বালা এবং ঘন ঘন পেশাব — এ ক'টি উপসর্গ নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসেন। এ কথা ক'টি শোনামাত্রই তাড়াহুড়ো করে রোগীকে পরীক্ষা করে তিনি রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করতে উপদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য এই তিনটে জিনিস পরীক্ষা করা এখন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আরও উপদেশ দিলেন ইন্ট্রাভেনাস পায়লোগ্রাফী (এক রকমের

ওষুধ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বৃক্ক (কিডনী) এবং মূত্রাশয়ের পরীক্ষা করা) এবং বেরিয়াম খেয়ে পাকস্থলী পরীক্ষা করার জন্য। এই দু'ধরনের এক্সরে করানর উদ্দেশ্য, ডাক্তার সাহেব ধরে নিয়েছেন, এই রোগীর লক্ষণগুলো আলসার কিংবা বৃক্কের পাথরের জন্য হতে পারে। উক্ত দু'রকমের এক্সরে করার পর একটা না একটা ধরা পড়বেই। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগেছে। সব রিপোর্টগুলো নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার সময় তাঁর স্বামীও সাথে গেলেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত যুবক। ছ'মাস আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। ডাক্তার সাহেব দেখতে পেলেন এক্সরে এবং অন্যান্য রিপোর্টে কিছুই ধরা পড়েনি। চিন্তিত ডাক্তারকে স্বামী জানালেন বিগত তিন মাস ধরে তাঁর স্ত্রীর মাসিক বন্ধ। সাথে সাথেই বলা হল মূত্র পরীক্ষা করতে এবং একজন গাইনোকোলজিস্ট দেখাতে। এই দুই সূত্র থেকে প্রমাণিত হল যে তরুণী অন্তঃসত্ত্বা। ডাক্তার সাহেব বলতে বাধ্য হলেন, তাঁর লক্ষণগুলো এ-কারণেই।

গর্ভাবস্থায় এই ধরনের লক্ষণ হতে পারে এটা নিশ্চয়ই ডাক্তার সাহেবের অজানা নয়। কিন্তু ছ'মাস আগের বিবাহিতা তরুণী তিন মাসের গর্ভধারণের এইসব লক্ষণ নিয়ে আসতে পারেন, এই চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা তাঁর রোগের সম্পূর্ণ ইতিহাস নিতে গিয়ে তাঁর মাসিক সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সময় তাঁর কোথায়। তারই পরিণতি হিসেবে অসহায় রোগীর ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। ল্যাবরেটরী এবং এক্সরে ক্লিনিকে শুধু ছোটাছুটি নয়, গ্লাসভর্তি বেরিয়াম খাওয়া, সিরিঞ্জভর্তি ইন্‌জেক্‌শন এগুলো নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আরামদায়ক ছিল না। অন্যদিকে এগুলোর ব্যয়ভারও কম নয়। আজকের দিনে অনেকের এক মাসের বেতনের সমান।

ধরা যাক, তাঁর ইন্ট্রাভেনাস পায়লোগ্রাফী স্বাভাবিক দেখে পেপ্‌টিক আলসার বলেও যদি একটা ব্যবস্থাপত্র দেয়া যেত, তাহলে তিন-চার সপ্তাহ পরে স্ফীত তলদেশ দেখে তাঁর গর্ভধারণ ধরা পড়ত এবং এরপর নিশ্চয়ই তিনি তা ডাক্তারকে জানাতেন। ডাক্তার তাঁর ভুল বুঝতে পেরে চিকিৎসার ধারা বদলে দিতেন এবং কিছু ভিটামিন, আয়রন (গর্ভধারণের সময়কার স্বাভাবিক প্রেসক্রিপ্‌শন) খেতে উপদেশ দিতেন।

গর্ভধারণের প্রথম তিনমাসে এক্সরে করা ভ্রূণের জন্য বিপদজনক এবং বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে এটা অনস্বীকার্য যে

শারীরিক যন্ত্রণা ও আর্থিক কষ্ট অনায়াসে পরিহার করা যেত যদি শুরুতেই তাঁর উপসর্গগুলোর বিবরণ মনোযোগ ও যত্নের সাথে শোনা যেত। প্রাকটিসে নিমগ্ন ডাক্তারের অতি ব্যস্ততা কিংবা উদাসীনতা থেকে জন্ম নেয়া এই 'অকাজের পরীক্ষা' অনেকগুলো উদাহরণের একটি।

অজ্ঞতা ও অযৌক্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিকিৎসকের অজ্ঞতার জন্য রোগীকে করতে হয়। রিমেটেন্ট জ্বর নিয়ে চতুর্থ দিনে জনৈক রোগী ডাক্তারের কাছে এলেন। উপসর্গ শুনে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর তিনটাই তাঁর সন্দেহ হল। তিনি টাইফয়েডের জন্য ব্লাড কালচার ও ভিডাল এবং কালাজ্বরের জন্য এ.টি., সি.টি., সি.এফ.টি. পরীক্ষা করতে বললেন। কিন্তু চার দিনের জ্বরে এইসব রোগের জন্য এই পরীক্ষাগুলো খুবই অযৌক্তিক। কারণ এসব রোগ এত অল্প সময়ের উপসর্গে এসব দ্বারা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় না। আরও সময় লাগে।

কাজেই এক্ষেত্রে টাইফয়েড বা কালাজ্বর হয়ে থাকলেও এসব পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ হবে না। ম্যালেরিয়ার জন্য একটি ব্লাড স্লাইডের সতর্ক পরীক্ষাই যথেষ্ট। কালাজ্বরের জন্য এ সমস্ত পরীক্ষা এই পর্যায়ে নেগেটিভ হবে জানা সত্ত্বেও এগুলো পরীক্ষার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এসব পরীক্ষা করতে বলার অর্থ হচ্ছে রোগের সাথে সময়ের যে সম্বন্ধ, তা না জানার ফল। কোন্ সময়ে কোন্ রোগের কি পরীক্ষা দরকার, সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর জানা নেই। নেগেটিভ রিপোর্টের কারণে রোগী বেচারীর খামোকা অর্থদণ্ড হয়, যার হয়ত এ রকম বিলাসিতা করার মতো সঙ্গতি নেই। অন্যদিকে এই রিপোর্ট ডাক্তারকে বিপথে চালিত করে। অসময়ের পরীক্ষার ফল বা রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় তিনি রোগীর অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নিয়ে হয়ত ভাবতে পারেন। উপরোক্ত ধরনের পরীক্ষা-সংকটের জন্য ডাক্তারদের পাশাপাশি ল্যাবরেটরীর লোকজনও কোন অংশে কম দায়ী নয়। টেকনিক্যাল জ্ঞানহীন ব্যবসায়ীদের ল্যাবরেটরী ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এই ধরনের ল্যাবরেটরীগুলো খুবই হীন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। অনেক ল্যাবরেটরী দাবি করে যে তারা বিভিন্ন

ধরনের পরীক্ষা করতে পারদশী। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, সেসব পরীক্ষা করার জন্য তাদের যোগ্য ব্যক্তি এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা এর কোনটাই নেই। একই সময়ে একই রক্ত বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক–এক ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট এক–এক রকমের। যৌন রোগ ও পরজীবী–আক্রান্ত মল পরীক্ষার রিপোর্ট এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অনেক ল্যাবরেটরী আছে যেখানে এ ধরনের পাঠান কেসের শতকরা ৮০ ভাগের পরীক্ষার রিপোর্ট হয়েছে পজিটিভ। যেসব ল্যাবরেটরী এসব রিপোর্ট দিচ্ছে তাদের কাছে ব্যাপারটা যেন অনেকটা ডালভাতের মতোই। যদি সিফিলিস পরীক্ষায় ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট পজিটিভ বলা হয়, তখন রোগী শুধু মানসিক দিক দিয়েই বিপর্যস্ত হন না, সামাজিক লাজলজ্জা এবং অপমানেরও সম্মুখীন হন। এ কারণে পারিবারিক অশান্তি চরমভাবে দেখা দেয়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্যি যে বেশকিছু তথাকথিত প্যাথলজিস্ট আছেন যাঁরা অনুমান করে রিপোর্ট দিয়ে থাকেন — যাঁদের রিপোর্ট প্রাণঘাতী না হলেও এর কাছাকাছি। এটা চরম অবমাননাকরও বটে। তথাকথিত কৃমি, বক্র কৃমি, আমাশয় এবং **giardia** রোগের পরীক্ষায় হয় সবগুলো রোগ নতুবা দু'টো কিংবা তিনটা রোগ একসাথে মিলিয়ে মলের রিপোর্ট নির্ভুল বলে ধরা হলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ঢাকা নগরীর মোট জনসংখ্যার প্রত্যেকেই এসব রোগে ভুগছেন। নিরীহ ডাক্তারগণ এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। ফলে বেচারী রোগীদের অর্থদণ্ড হয়, অথবা টেবলেট কিংবা সিরাপ গিলতে হয়। তাঁরা হয়ত কোন একটি রোগে আক্রান্ত অথবা কোন রোগেই আক্রান্ত নন। এই অজ্ঞতা ক্ষমার অযোগ্য হলেও এই অবস্থা দিব্যি চলছেই।

বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় ম্যালেরিয়ার পুনরাবির্ভাবে ডাক্তার এবং প্যাথলজিস্টগণ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। কতক ক্ষেত্রে এ অবস্থা চরমে এসে গেছে। শতকরা প্রায় ৮০–৯০টি স্লাইড পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া জীবাণু পজিটিভ আছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বেশির ভাগ পুনরায় পরীক্ষা করা হয়েছে। এবং দেখা গেছে রিপোর্টের ফলাফল হচ্ছে নেগেটিভ অর্থাৎ এতে ম্যালেরিয়া জীবাণুর কোন নামগন্ধও নেই। দুঃখজনক হলেও কিন্তু একথা সত্য যে, অধিকাংশ রোগীই চিকিৎসা শুরু করার আগে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করাতে আর্থিক দিক দিয়ে অসমর্থ।

এসব ক্ষেত্রে স্যালাইন এবং কুইনাইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। আমরা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ক্লোরোকুইন এবং কুইনাইনের বিষক্রিয়ার কথা বলে থাকি। কিন্তু এই ওষুধগুলো সাধারণভাবে বহুলব্যবহৃত। যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো রোগীর আরোগ্যলাভের জন্য নয় বরং অজ্ঞতাজনিত কারণে রোগীকে দেয়া হয়।

অনেক রোগ আছে যেগুলো ম্যালেরিয়া বলে ভুল হয়। যেমন সেরেব্রো ভাসকুলার দুর্ঘটনা, মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কশন, মৃদু নিউমোনিয়া। এমনকি টাইফয়েড জ্বরেও 'পজিটিভ স্লাইড' দেখে তথাকথিত ম্যালেরিয়া রোগীদের বারটা বাজান হচ্ছে। চিকিৎসা চলছে ম্যালেরিয়ার। কিন্তু রোগটা আসলে অন্য কিছু। এই যে রোগীদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এর খেসারত দেবে কে?

চিকিৎসক যেখানে দুর্বল

চিকিৎসক যেখানে দুর্বল, এবং রোগ নির্ণয়ে যাঁর দক্ষতা অতি সীমিত, ল্যাবরেটরী রিপোর্টের উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ফলে সংকটের সৃষ্টি হয় অনেক। পরবর্তী পর্যায়ে একই ল্যাবরেটরী কিংবা ভিন্ন ল্যাবরেটরীতে নেগেটিভ রিপোর্ট পাওয়া গেলে অর্থাৎ আগের পরীক্ষায় যা পাওয়া গেছে, তা যদি পাওয়া না যায়, তাহলে যুক্তি দেখান হয় বিভিন্ন ধরনের। কখনও বলা হয় চিকিৎসার ফলে আসল যে রোগ তা সেরে গেছে, বর্তমান অবস্থাটা একটা উপসর্গ। কখনও বলা হয় রোগী একই সময়ে একাধিক রোগে ভুগছেন। আসলে কিন্তু প্রথমবারের রিপোর্টেই গোলমাল ছিল। ওটা ভুল তথ্যপূর্ণ — ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞতাবশতঃ। অনেক সময় এ ধরনের রিপোর্ট দুর্বল চিকিৎসকের হাতে পড়ে রোগীকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। পরিণতি ভয়াবহও হতে পারে। যেমন ধরুন যেটাকে ম্যালেরিয়া বলে চিকিৎসা করা হচ্ছে, সেটা যদি টাইফয়েড হয়, তাহলে? সময়মতো টাইফয়েড উপসর্গ দেখা দেয়া স্বাভাবিক। বর্তমানে যেখানে টাইফয়েডের চিকিৎসা চিকিৎসকের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন সেখানে দূরদর্শিতার অভাবে একজন রোগীকে উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা সত্যিই দুঃখজনক। তবুও এমন ঘটনা আজকালকার দিনে অজানা নয়।

সম্প্রতি এক্সরে মেশিন বসিয়ে যেখানে-সেখানে ব্যবসা শুরু করা সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাকা খাটালে মেশিন বসবে — এটা যেমন সোজা কথা, তেমনি মেশিন থেকে কতগুলো এক্সরে তোলাও তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যেমন বুকের (ফুসফুসের), হাড়ের, গলার, হাতের, পায়ের, সাইনাসের। কিন্তু মেরুদণ্ড, পাকস্থলী, পিত্তথলি, বৃক্ক এবং মূত্রথলি ইত্যাদি অঙ্গের যেখানে ওষুধ খেয়ে বা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে এক্সরে করতে হয় — সেগুলো যেখানে-সেখানে করা যায় না এবং যে-কোন লোক করতে পারে না। আর সব এক্সরের বেলায় একটা সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রিপোর্ট লেখা যার তার কাজ নয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং উপযুক্ত অভিজ্ঞতা না থাকলে ভুল রিপোর্টের মাধ্যমে এ ধরনের তথাকথিত রেডিওলজিস্ট মহাবিপদের কারণ হতে পারে। অনেক জায়গা থেকে এক্সরে করলে প্যাথলজী রিপোর্টের মতো কিছু-না-কিছু দোষ সবক্ষেত্রেই যেন পাওয়া যায়।

অপ্রচলিত চিকিৎসা ও দুর্মূল্য ওষুধ

পেপ্‌টিক আলসার বা পাকস্থলীতে ঘা বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান রোগ। এক্সরে করে এই রোগ নির্ণয় অনেকটা সহজ। কিন্তু পেটের এক্সরে করালেই আলসার বলে প্রায়শঃ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। অথচ গুণগত বিচারে অনেক এক্সরেই নিকৃষ্ট ধরনের এবং রিপোর্টগুলোও সম্পূর্ণ মনগড়া। এইসব রোগী অনভিজ্ঞ কিংবা দুর্বল চিকিৎসকের হাতে পড়লে রেহাই পান না এটা যেমন সত্য, তেমনি দেখা যায় সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত এমনকি শিক্ষকতায় নিযুক্ত অথবা চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এমন ব্যক্তিও এ ধরনের রিপোর্টের শিকার হন। তাঁরা ওষুধের দীর্ঘ একটা তালিকা এবং তার সাথে একটা নির্দেশনামা দেন। কোন-কোন ক্ষেত্রে ছাপান নির্দেশনামাও দেয়া হয়। এসবের পেছনে আবার ডাক্তারবিশেষের পেশাগত যোগ্যতা প্রচারের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নিহিত থাকে। ছাপান নির্দেশনামার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ : পেট খালি রাখবেন না ; প্রতি দু'ঘণ্টা পর অবশ্যই কিছু খাবেন; প্রচুর বিশ্রাম নেবেন ; ধূমপান হারাম ; ঝাল ও মশলা একেবারে নিষিদ্ধ, ইত্যাদি। খাবারদাবারের এ রকম ফিরিস্তির সাথে আরও আধা ডজন ওষুধ জুড়ে দেয়া হয়। এর মধ্যে এন্টাসিড, এন্টিকোলিনারজিক্‌স্‌, সেডেটিভ, টনিক, হজমী এনজাইম

উল্লেখযোগ্য। রোগীর কপাল যদি ভাল না হয়, তবে তাঁর ব্যবস্থাপত্রে সাইমেটিডিন একটা আইটেম হিসেবে থাকতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দু'ঘণ্টা পর-পর খাবার কি প্রয়োজন আছে? এমন এক সময় ছিল যখন হাসপাতালে প্রতিটি আলসার রোগীর জন্য একটা এক ঘণ্টা সময়ের চার্ট থাকত। এতে খাবার এবং ওষুধ গ্রহণের সময় দেয়া থাকত এবং এই চিকিৎসা ব্রিটিশ চিকিৎসা নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এটা এখন অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি ঘণ্টা অন্তর খাবার গ্রহণ আরও এসিড ক্ষরণ বাড়ায়। সম্প্রতি আমরা এ তথ্য অবগত হয়েছি।

সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা হল এন্টিকোলিনারজিক্স্ এবং এন্টাসিডের মধ্যে সময়ের সামঞ্জস্য বিধান করা। খাবারের আধঘণ্টা আগে প্রথমটা এবং খাবারের একঘণ্টা পর দ্বিতীয়টা দিলে গ্যাস্ট্রিক অম্লতা বা এসিডিটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। সেইসাথে ওষুধের সুফলও বেশি পাওয়া যায়।

সমাজের যে স্তরের লোক হোন না কেন, কাজে-কর্মে যাঁরা ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের পক্ষে প্রতি দু'ঘণ্টা পর খাবার গ্রহণ মোটেও সম্ভব নয়। রোগী বেচারী ওষুধের কার্যকর ফলাফল না পেয়ে নিজেকেই দোষারোপ করেন। এ কুফল তাঁর নিজের দোষে নয় বরং ভুল উপদেশ-নির্দেশের কারণে ঘটে থাকে। যে ডাক্তার প্রাকটিস করে যাচ্ছেন এবং বাস্তব ও বর্তমান ধ্যান-ধারণা থেকে বহু পিছিয়ে আছেন, তাঁর অজ্ঞতার কারণে রোগী নির্মম অবস্থার শিকার হন। এখানে সাইমেটিডিন (টেগামেট)-এর উল্লেখ প্রয়োজন। পেপ্‌টিক আলসারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি সর্বশেষ সংযোজন। আলসার নিরাময়ের ক্ষেত্রে এর প্রতি প্রাথমিক আগ্রহ এবং সাফল্যের দাবি পরবর্তী পর্যায়ে অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। স্বল্পকালীন চিকিৎসায় রোগের পুনরাবির্ভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের পার্শ্ব- প্রতিক্রিয়া তদুপরি এর অস্বাভাবিক দাম এর তথাকথিত জনপ্রিয়তা হারানর অন্যতম কারণ।

এখন আমরা জানি যে এন্টাসিডের উপযুক্ত মাত্রা সুফল বয়ে আনে। আলসারের চিকিৎসায় সাইমেটিডিনের বিশেষ স্থান থাকলেও তার অর্থ এই নয় যে পেপ্‌টিক আলসারের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে। বিশ্বের অন্যতম গরিব দেশ বাংলাদেশে সাইমেটিডিনের মতো মূল্যবান ওষুধের বিকল্প যখন বর্তমান, তখন বেশি দামের এই ওষুধ কেন ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে কথা উঠেছে।

অনেকে বলতে পারেন জীবনের চেয়ে মূল্যবান তো কিছুই নেই। যখন জীবন রক্ষার জন্য একটা দামী ওষুধ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, সেখানে একথা প্রযোজ্য। কিন্তু যেখানে অপেক্ষাকৃত কম দামে একই ফলদায়ক ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে? যে দেশে শতকরা ৯০ জন লোক দারিদ্র্যের চাপে অসহায় এবং নিরুপায় তাঁদের মাথায় এত দামী ওষুধের বোঝা চাপিয়ে দেয়া কি চরম নিষ্ঠুরতা নয়?

সেকেলে প্রত্যাখ্যাত ধারণা রোগীর সংকট বৃদ্ধি করে

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে জন্ডিস বা পাণ্ডু রোগ অপরিচিত নয়। কিন্তু সাধারণের কাছে এটি একটি মারাত্মক রোগ বলে পরিচিত। হলুদ চোখ, হলুদ প্রস্রাব, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল — সব মিলে ব্যাপারটা ভয়াবহ। যে-কোন মূল্যে এই ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য একমাত্র ডাক্তারই ভরসা। সতর্কতার সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে গলস্টোন বা পিত্তথলির পাথরের মতো রোগ নির্ণয় সম্ভব। এটা জন্ডিসের অন্যতম প্রধান কারণ। অপারেশনের সাহায্যে এর আরোগ্য লাভ করা যায়। জন্ডিসের আরও একটি প্রধান কারণ ভাইরাল হেপাটাইটিস। অর্থাৎ ভাইরাসের কারণে লিভারের প্রদাহ। এ ধরনের জন্ডিসের নির্দিষ্ট কোন ওষুধ নেই। কিন্তু রোগী বা তাঁর আত্মীয়স্বজন রোগের ওষুধ নেই একথা মানতে রাজি নন। তাই খুব স্বাভাবিক কারণে তাঁরা কিছু ওষুধ আশা করেন। সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পক্ষে তিন, চার, এমনকি পাঁচ ধরনের ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লিখে দেয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। এগুলোর মধ্যে টেরামাইসিনের মতো এন্টিবায়োটিক এবং কতগুলো এমাইনো এসিডের তৈরি ওষুধ যাতে মেথিওনাইন এবং কোলিন আছে, সেসবও ডাক্তার লিখে দেন। এসব অনেক ওষুধের নামের আগে আবার লিভার কিংবা হেপা (যার মানে লিভার) লাগান থাকে যেমন : লিভারজেন, হেপাটোন, লাইপেস ইত্যাদি।

প্রেসক্রিপশনে গ্লুকোজ সেলাইন লেখা আর একটা অতি সাধারণ বিষয়। অথচ যে রোগের জন্য এসব ওষুধ লেখা হয়, সে রোগের কোন উপকারই হয় না। এছাড়া এটা সর্বজনবিদিত যে টেরামাইসিনের মতো এন্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে যেসব টনিক দেয়া হয় — সবই লিভারের জন্য ক্ষতিকর। এসব ওষুধ দেয়ার অর্থই হল রোগের আক্রমণে ইতিমধ্যে লিভারের যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তা আরও বাড়িয়ে

দেয়া। যেসব ক্ষেত্রে লিভারের বিশেষ ক্ষতির কারণে গুরুতর জন্ডিস হয়েছে, সেক্ষেত্রে শিরায় টেরামাইসিন দেয়ার ফলে মৃত্যু হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

দেশ–বিদেশে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, জন্ডিস রোগে খাবারদাবারের প্রতি বিধিনিষেধ একেবারে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক। রোগী তাঁর অভ্যাসমতো খাবার খেয়ে যেতে পারেন। অতি সীমিত পরিমাণ চর্বিজাতীয় এবং বেশি পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাদ্য খাবার যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। চিকিৎসকের ভুল নির্দেশে অনেকেই গ্লাসের পর গ্লাস গ্লুকোজ–এর শরবত খেতে থাকেন। এবং এর ফলে বমি–বমি ভাব, মাথা ঘোরা ইত্যাদিতে ভোগেন। অধিকন্তু খাবারদাবারের বিধিনিষেধ একজন রোগীর প্রাত্যহিক নিয়মিত আহার কমিয়ে দেয়। ফলে সেটা তাঁর মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই ডেকে আনে। কারণ এতে আরোগ্য বিলম্বিত হয়। রোগীর সাধারণ দৈনন্দিন খাবারই প্রয়োজন। সর্বশেষ যুক্তিসম্মত ও বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে একটা দীর্ঘদিনের প্রাচীন, সেকেলে, সর্বোপরি প্রত্যাখ্যাত ব্যবস্থা মনেপ্রাণে আঁকড়ে রাখার ফলে রোগীদের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতাই করা হয় এবং এতে সংকট কমে না, বরং বেড়ে যায়। প্রতিদিন শিরায় গ্লুকোজ এবং ভিটামিন দেয়া কোন–কোন চিকিৎসকের পক্ষে একটা নিয়মিত ব্যাপার। এতে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন কাঁপুনি, অতি মাত্রায় জ্বর ইত্যাদি।

ভাইরাস হেপাটাইটিস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্প্রতি অনেক বদলে গেছে। এই হেপাটাইটিস যেসব ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে, সেগুলো ছিল এককালে তিন প্রকার — ভাইরাস–এ, ভাইরাস–বি এবং ভাইরাস নন্–এ–নন্–বি। এখন এ সংখ্যা বেড়ে গেছে। যেকোন একটির আক্রমণ অন্যটির আক্রমণ প্রতিহত করে না। ভাইরাস–এ এবং –ই সবচেয়ে কম শক্তিশালী এবং কোন রকমের জটিলতা সৃষ্টি করে না। খাবারদাবারের মাধ্যমে এ দু'টোর সংক্রমণ। অন্যদিকে ভাইরাস–বি,–সি নন্–এ–নন্–বি বিভিন্ন ধরনের ইন্জেক্শনের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। একাধিক রোগীর দেহে একই সিরিঞ্জের বারবার ব্যবহার এই তিন ধরনের ভাইরাসের বিস্তৃতি ঘটায়। এছাড়া কোন কারণে রোগীকে যদি রক্ত দিতে হয় তবে তার মাধ্যমেও এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করতে পারে — যদি উক্ত রক্ত এই ভাইরাসে সংক্রমিত বা দূষিত হয়ে থাকে।

ভিন্ন কোন রোগের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ভাইরাস হেপাটাইটিসের শিকার হয়েছেন এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তথ্য নিলে দেখা যাবে যে,

হাসপাতালে থাকাকালে তাঁদের কয়েক ধরনের ইন্‌জেক্‌শন দেয়া হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে ইন্‌জেক্‌শনের সুচ ও সিরিন্জ একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেয়া হলেও আমাদের দেশে এখনও একই কাচের সিরিন্জ ও সুচ অবিরাম ব্যবহৃত হচ্ছে। হাসপাতালে একই ওয়ার্ডের প্রায় সব রোগীকে একই সিরিন্জ দিয়ে ইন্‌জেক্‌শন দেয়া হয়। এই সিরিন্জ দিয়ে ভাইরাস হেপাটাইটিস অতি সহজে আরেক জনের শরীরে সংক্রমিত হয়। এক ওয়ার্ডে ভাইরাল হেপাটাইটিসের একটা কি দু'টো রোগী প্রায়ই ভর্তি থাকেন। কাজেই অন্যান্য রোগীরা যে রোগের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন তা থেকে আরোগ্য লাভ করলেও বাসায় ফিরে যাবার সময় ভাইরাল হেপাটাইটিস সাথে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁদের সামান্যতম ধারণাও থাকে না যে তাঁদের শরীরে ইতিমধ্যে ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে গেছে এবং কয়েক মাসের সুপ্তিকালের পর রোগের প্রকাশ ঘটতে পারে। অতীতের দিকে তাকালে বর্তমান যুগের যে-কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক অন্ততঃ মনেপ্রাণে স্বীকার করবেন অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা মানুষকে কতটা ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। রোগ নির্ণয় বা রোগের চিকিৎসা বা প্রতিরোধ যাই হোক না কেন, চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের জন্য তা এক দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনে। বিভিন্ন সময়ে ভাইরাল হেপাটাইটিসের বিভিন্ন নামকরণ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা তথা অজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে।

রক্তহীনতা

রক্তহীনতা আসলে কোন রোগ নয় — রোগের উপসর্গ। লোহিত কণিকার জটিলতা কিংবা অস্বাভাবিকতার মূলে এটি। এই উপসর্গ এমনই-যে এটা হলে রোগী খুব বেশি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান এবং ডাক্তার ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ খুঁজে পান না। কয়েক ধরনের রক্ত সৃষ্টিকারী টনিক ঝট্‌পট্‌ লিখে দেয়া ডাক্তার সাহেবের জন্য অতি সাধারণ ব্যাপার। অনেককে আবার কিছু-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে উপদেশ দেয়া হয়। অথচ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য যেমন : রোগীর আর্থিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা, খাবার অভ্যাস — এসব জানার কোন আগ্রহ বোধ করেন না। কি কারণ রক্তহীনতার জন্য দায়ী — তাও উপেক্ষা করা হয়। ডাক্তার হয়ত একথা ভুলে যান যে রক্তহীনতার মূলে শরীরের কোন অঙ্গে প্রচ্ছন্ন বা

লুক্কায়িত ক্যান্সার থেকে শুরু করে স্বল্পাহারের মতো সাধারণ কারণও থাকতে পারে।

রক্ত সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের টনিকের মধ্যে চিকিৎসা করার মতো প্রয়োজনীয় মাত্রার আয়রন থাকে না বলে তা অপুষ্টিজনিত অভাব পূরণ করতে পারে না। অন্যদিকে এসব টনিক কিনতে যে দাম পড়ে, তার চেয়ে অনেক কম দামের সাধারণ আয়রন ট্যাবলেটে একই কাজ হয়। এতে যে পয়সার অপচয় হয়, সেই পয়সা দিয়ে বাড়তি খাবার খাওয়া যায়। কিন্তু যাঁদের মধ্যে মারাত্মক কোন রোগ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাঁদের জন্য এটা খুবই বিপদজনক এজন্য যে, এসব ব্যবহারের পর শুরুতে কিছুটা উন্নতি হচ্ছে মনে হলেও পরবর্তীতে রোগ নির্ণয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং প্রচ্ছন্ন রোগটি বেড়েই চলে। অবশেষে চিকিৎসা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। শরীরে হেমোগ্লোবিনের অভাব মিটিয়ে রক্তহীনতা সারিয়ে তুলবে এই আশায় হেমোগ্লোবিন নামের ওষুধ যথেচ্ছভাবে দেয়া হয়। এটা সত্যি দুঃখজনক। এ ধরনের এক বোতল টনিকের দাম অবস্থাভেদে আশি থেকে একশ টাকা। কিন্তু নামটার মোহে পড়ে রোগীরা বোকা বনে যান এবং শুধু অর্থের অপচয় করেন না বরং চিকিৎসাজনিত মারাত্মক অবস্থারও সম্মুখীন হন। অবস্থার উন্নতি বা অবনতি যাই হোক না কেন, রোগী কিন্তু এই ওষুধকে মহৌষধ মনে করে খুব তৃপ্তির সাথে সেবন করেন। যাঁরা কিছুদিন পর বুঝতে পারেন যে তাঁদের অবস্থা উন্নতির চেয়ে অবনতির দিকে তাঁরা এই মহৌষধকে বিন্দুমাত্র দায়ী না করে নিজেদের কপাল মন্দ বলে দুঃখ করেন। যে ডাক্তার তাঁদের চিকিৎসা করেন, তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে প্রেসক্রিপশনের গলদ তাঁদের চোখে ধরা পড়ে না।

এই বিশেষ ওষুধের এবং এ ধরনের অন্য ওষুধের জনপ্রিয়তার রহস্য কি তা জানা নেই। তবে এটা জানা আছে যে এর পিছনে আমাদের প্রচুর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। সময় এসেছে এসব ওষুধ চিরতরে নির্বাসিত করার। সময় এসেছে রক্ত সৃষ্টিকারী নয়, রক্ত শোষণকারী এসব নিষ্ঠুর প্রেসক্রিপশনের যাঁতাকল থেকে রোগীদের বাঁচাবার।

রক্তহীনতার কারণ ও ধরন জানার জন্য সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। একটি শিশুর রক্তহীনতার জন্য মল সাধারণভাবে পরীক্ষা করালে হয়ত এতে বিভিন্ন কৃমির উপস্থিতি জানা যাবে।

বিভিন্ন ধরনের ডায়রিয়া, বদহজম, ঘন-ঘন সন্তান প্রসব, পেটে অপারেশন প্রভৃতি কারণে যে রক্তহীনতা দেখা দেয় তাতে সাধারণতঃ আয়রন এবং ফলিক

এসিড দু'টোরই অভাব দেখা যায়। রোগের বিস্তারিত ইতিহাস থেকে এগুলো. অনুমান করা সহজ এবং সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করাও সম্ভব। এ-সব ক্ষেত্রে শুধু আয়রন খাওয়ালেই রক্তহীনতা দূর হবে না বরং একইসাথে ফলিক এসিড সেবনও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রোগীদের অনেক সময় ভিটামিন বি^{১২} দেয়া হয়। এই ভিটামিনের অভাব আমাদের দেশে হয় না বললেই চলে। এই ধরনের ভিটামিনের অভাবে এক সাংঘাতিক ধরনের রক্তহীনতা (পারনিশাস এ্যানিমিয়া) দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন কারণে এ ধরনের রক্তশূন্যতা বাংলাদেশে দেখা যায় না। তাছাড়া ভিটামিন বি^{১২} যে-পরিমাণ দেয়া হয়ে থাকে কিংবা বিভিন্ন টনিকে যে-পরিমাণ থাকে, তাও কোন কাজে আসতে পারে না। রোগীর টাকা-পয়সা নষ্ট হয়, সময়ের অপচয় হয়, কিন্তু রক্তহীনতা দূর হয় না। এক্ষেত্রে আয়রন ও ফলিক এসিড আলাদাভাবে বা একসাথে দিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগী ভাল হয়ে যেতে পারেন। গরিব রোগী, যাঁদের ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই, তাঁদের উপর ওষুধ কেনার দণ্ড না ঘটিয়ে রোগের আসল কারণ দূর করে বিভিন্ন শাকসবজি খাওয়ার উপদেশ দিলে ভাল হয় এবং অতি অল্প সময়ে সুফল পাওয়া যায়।

জ্বর

সারা বাংলাদেশ খুঁজলে এমন কাউকে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যাঁর জীবনে একবারও জ্বর হয়নি। ঘুসঘুসে জ্বর থেকে শুরু করে উচ্চ তাপমাত্রার জ্বরও সবার হতে পারে। এই সমস্ত জ্বরের বেলায় রোগ নির্ণয়ে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক — বিশেষ করে প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে। জ্বরের সাথে সামান্য সর্দি-কাশি অথবা ঠাণ্ডা লাগাকে সর্দিজ্বর বলা হয়। বিনা চিকিৎসায় কয়েকদিনের মধ্যে আপনাআপনি তা সেরে যায়। অন্যদিকে একই ধরনের লক্ষণে এমন রোগও হতে পারে যা ঠিকমতো চিকিৎসা না করলে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

শুরুতে অতি উৎসাহী হয়ে বিনা দ্বিধায় এক বা একাধিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ শুধু অযৌক্তিক নয় — সর্দিজ্বরের বেলায় (যেটি খুবই সাধারণ) একটা ভুল বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এ জ্বরের উপশম স্বাভাবিকভাবেই হয় — এন্টিবায়োটিকের জন্য নয়। অথচ এ ধরনের এন্টিবায়োটিক দিয়ে আমরা সকলে

ভুল চিকিৎসা করেও বাহবা কুড়াই এবং অসহায় রোগীদের আর্থিক অনটন বাড়াই। ভালভাবে পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করার আগে এন্টিবায়োটিক দেবার অতি উৎসাহ অনেক সময় রোগ নির্ণয়ে সংকটের সৃষ্টি করে।

টাইফয়েড জ্বর হলে টেট্রাসাইক্লিন, পেনিসিলিন কিংবা স্ট্রেপটোমাইসিন দিলে কোন কাজ হবে না। এসব ওষুধ দেয়ার তিন চার দিনের মধ্যে জ্বর যদি না কমে তখন কোট্রাইমোক্সাজোল, কোট্রিম, থেরাট্রিম, সেপটাজল দেয়ার উপদেশ দেয়া হয়। সাথে ক্লোরোকুইনের মতো এন্টিম্যালেরিয়া ওষুধও। টাইফয়েড হলে কোট্রাইমোক্সাজোল খুবই কার্যকর হয় কিন্তু কাজ ধীরে-ধীরে করে এবং জ্বর কমাতে সময় নেয়। যদি ডাক্তার সাহেবের একথা মনে না থাকে তবে আত্মীয়-স্বজনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সাথে তিনি একটার পর একটা ওষুধ যোগ করতে থাকেন। প্রায় রোগীই গরিব। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ঘরের জিনিসপত্র বেচে ওষুধের দাম জোগাড় করেন। রোগী ওষুধ কিনে সেবন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন উপকার পান না। অনেক সময় আর্থিক চাপ এত বেড়ে যায় যে রোগীর আর ওষুধ কেনা হয়ে উঠে না। যখন তাঁরা বড় ডাক্তার বা হাসপাতালে যেতে মনঃস্থ করেন, তখন অনেক সময় দেখা যায় যে ওষুধ কেনা দূরের কথা, বড় ডাক্তারের ফিসও জোগাড় করতে পারেন না। এদিকে হাসপাতালে ভর্তি হবেন এ চিন্তাও তাঁরা করতে পারেন না। তাঁদের মতে হাসপাতালের চিকিৎসা-ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং অধিকাংশ রোগী সেখানে মারা যান।

যদি সতর্কতার সাথে রোগের ইতিহাস নেয়া হত, বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হত, তাহলে চিকিৎসকের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ ঠিকই ধরা পড়ত। অপেক্ষাকৃত ধীর নাড়ীর গতি, জিভের উপর আস্তরণ, তলপেটের ডানদিকের নিচের অংশে চাপ দিলে ব্যথা, মুখের চেহারায় বিকৃতি বা পরিবর্তন — এসব দেখে অতি সহজে টাইফয়েড নির্ণয় করা যায়। কোট্রাইমোক্সাজোল এবং ক্লোরোমাইসেটিন টাইফয়েড রোগের জন্য বিশেষ উপকারী ওষুধ হলেও এগুলো বিশেষ করে ক্লোরোমাইসেটিন দেয়া রক্ত তৈরির উপাদানগুলোর জন্য বিপদজনক। এর ফলে এগ্রেন্যুলোসাইটোসিসের মতো মারাত্মক অবস্থা হতে পারে। এই ওষুধগুলোর যে-কোন একটি টাইফয়েডের জন্য যথেষ্ট হলেও প্রায় প্রেসক্রিপশনে এ দু'টো ওষুধ একসঙ্গে দিতে দেখা যায়। যদিও এ দু'টো ওষুধ কয়েকটি মৃত্যুর জন্য দায়ী, তবুও রোগের উপর দোষ চাপান হয়, এগুলোর উপর নয়। বলা হয় 'কপাল খারাপ'।

ওষুধের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। এই রাজধানী ঢাকা শহরে আমরা একজন প্রফেসরকে হারিয়েছি যাঁকে সেরিব্রোভাসকুলার দুর্ঘটনা বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের পর মরফিন ইন্জেক্শন দেয়া হয়, যার ফলে তাঁর জ্ঞান আর কোনদিন ফিরে আসেনি। এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রতিবাদও করতে পারেননি। এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে হৃৎপিণ্ডজনিত এবং শ্বাসনালীজনিত হাঁপানির পার্থক্য না করেই একটি এ্যাড্রেনালীন ইন্জেক্শন হৃৎপিণ্ডের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় এটা শ্বাসনালীজনিত হাঁপানিতে যেমন উপকারী, হৃৎপিণ্ডজনিত হাঁপানিতে তেমনি মারাত্মক।

এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে যা গ্রন্থাকারে লিখেও শেষ করা যাবে না। কিন্তু এসব ঘটনা থেকে একটি সত্যই ফুটে উঠে যে অসহায় রোগীরা ওষুধের অপপ্রয়োগের ফলে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সবক্ষেত্রে এই অপপ্রয়োগ ইচ্ছাকৃত নয়। অজ্ঞতা কোনদিনও আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে না। উদাসীনতা কখনও সহ্য করা যায় না। আমরা যখন রোগীর স্বাস্থ্য, আরোগ্য এবং সুখের জন্য দায়ী, তাঁদের উপর অবাঞ্ছিত পরীক্ষা–নিরীক্ষার বোঝা, সেকেলে ও অপ্রচলিত উপদেশের শাস্তি, অজ্ঞতাপ্রসূত প্রেসক্রিপ্শনের মারণাস্ত্র এবং উদাসীনতার নিষ্ঠুরতা চাপাবার অধিকার আমাদের নেই। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ গরিব রোগীদের উপর চাপিয়ে তাঁদের আর্থিক চরম অবস্থা সৃষ্টি করা কোনক্রমেই আমাদের উচিত নয়। কম দামী ওষুধে যেখানে আরোগ্য সম্ভব, সেখানে বিদেশী দামী ওষুধ দেয়া শত্রুতার শামিল। তাঁরা আমাদের কাছে আসেন অগাধ বিশ্বাস নিয়ে আরোগ্যলাভের আশায়। এ বিশ্বাসের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

কেন এত ওষুধ

আমার স্কুলজীবন গ্রামেই কাটে। এখনও আমি ছোটবেলার আমার সে গ্রাম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারিনি। বছরে অন্ততঃ দু'বার সেখানে যাবার সুযোগ নিই — পবিত্র ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিনে। বিগত চার-পাঁচ দশকে আমার গ্রামের নামের পরিবর্তন হয়নি — আয়তনও বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ। মনে পড়ে, ছোটবেলায় অসুখ হলে মা কত ধরনের গাছ-পাতার রস, এটা-সেটা খেতে দিতেন। দু'এক দিনের মধ্যে উপশম না হলে গ্রামের সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ঈশ্বরচন্দ'কে নিয়ে আসতেন। আমারও ভাল লাগত। কারণ তিনি আমার পছন্দসই ডাক্তার ছিলেন। ওষুধের পরিমাণ ছিল কম আর খেতেও মিষ্টি লাগত। মাত্র কয়েক ফোঁটা ওষুধ কিংবা কয়েকটা পুরিয়া দিনে দু'একবার। আমার অতি প্রিয় সেই ঈশ্বর ডাক্তার আর নেই। পরিবারের আমরা সবাই এখন শহুরে। আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন, তাঁদের দেখি অসুখ হলে নানা ধরনের ডাক্তারের সাহায্য নিতে। এঁদের কেউ হোমিওপ্যাথ, কেউ কবিরাজ, কেউ এলোপ্যাথিক, আবার কেউবা সবকিছু। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যে যাই হোন না কেন, প্রত্যেকে যেন প্রত্যেক ওষুধে পারদর্শী। একজন হোমিওপ্যাথের প্রেসক্রিপ্শনে এলোপ্যাথিক ওষুধ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এন্টিবায়োটিক, হজমী ওষুধ, টনিক, ভিটামিন সবকিছু কোন-না-কোন প্রেসক্রিপ্শনে স্থান পায়। আবার সবসময় যে ডাক্তারের নির্দেশে ওষুধ কেনা হয়, এমন কথা নয়। গ্রামে-গঞ্জে এখন আর সে পরিবেশ নেই। ওষুধ আর চায়ের দোকান যেন পরস্পর-প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি। যাঁরা ওষুধের ব্যবসা করেন, কিছুসংখ্যক ইংরেজী পড়তে এবং বুঝতেও পারেন। কেউ-কেউ কষ্টের সাথে পড়তে পারেন, আর কেউ তাও পারেন না — শুধু বাংলা জানেন। ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে জানা এঁদের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। কোম্পানীর বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন আর ওষুধের সাথে দেয়া ছাড়পত্র বিভিন্ন ভাষায় লেখা থাকে। বাংলায়

থাকবেই। এগুলোতে যা গুণাগুণ বর্ণনা, সেটাই তাঁদের সম্বল। শুধু সম্বল বললেই হয়তবা ভুল হবে। এত বড় কোম্পানী, এত সুন্দর কাগজে লেখা, আর এমন একটা ওষুধ — এগুলো সবই সত্য। এতে কোন ভুলভ্রান্তির অবকাশ নেই — এটাই তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা। এছাড়া প্রেসক্রিপ্‌শন তথা ব্যবস্থাপত্র যেখান থেকেই হোক না কেন, যাঁর হাতে লেখা হোক না কেন, শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, তা আনাগোনা করবেই। শহরে কাজ করেন এমন লোকের মারফত এগুলো গ্রামে আসে। আবার এদের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে যায়। গ্রামমুখী প্রেসক্রিপ্‌শনের গুরুত্ব এখানেই বেশি। শহরের পাস করা ছোটবড় ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌শন গ্রামের সেই ডাক্তারসমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে অনেক। উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারের বেলায় তার পরিমাণ কতটুকু তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমরা যাঁরা ভাগ্যবান, উচ্চশিক্ষিত, আমাদের দায়িত্ব অপরিসীম। আমরা যা জানি, আমরা যা করি, আমরা যা লিখি, তা শুধু আমাদের এবং আমাদের রোগীদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, শত-শত গ্রামীণ ডাক্তার, হাজার-হাজার শিক্ষিত লোক এগুলো থেকেই চিকিৎসা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন, ওষুধ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হন। আমাদের দায়িত্ব যেখানে এত বেশি, সেখানে নিঃসন্দেহে আমাদের সজাগ হতে হবে। আজকের আলোচ্য বিষয় : ব্যবস্থাপত্রে বা প্রেসক্রিপ্‌শনে কত ওষুধ লিখতে হবে এবং কেনই-বা এত বেশি ওষুধ আমরা লিখে থাকি।

অসুখ যেখানে একটা, ওষুধও সেখানে একটা হবে এটাই স্বাভাবিক। কোন না কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে একটা অসুখের জন্য একাধিক ওষুধ দেয়া অপরিহার্য। এই ধরনের অসুখের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ — এই তিনটি ব্যাপক বিস্তৃত রোগে একসাথে একাধিক ওষুধ দিতে হয়। তা-ও দু' বা তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এছাড়া লিউকিমিয়া বা ক্যান্সারজাতীয় রোগে যেখানে একসাথে একাধিক ওষুধ দিতে হয়, সেগুলোর চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসকের আওতার বাইরে। মোটকথা — উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ওষুধ পাওয়া গেলে একটা অসুখে একটা ওষুধই যথেষ্ট। প্রশ্ন উঠতে পারে, দরিদ্র দেশগুলোতে অনেক রোগ মোটামুটিভাবে অনেকেরই জীবনসঙ্গী। যেমন ডিসেন্ট্রি বা আমাশয়, বিভিন্ন ধরনের কৃমি, অপুষ্টি, নানা ধরনের চর্মরোগ ইত্যাদি। এখন যদি একজন লোকের নিউমোনিয়া হয়, এমনকি সেই একই লোকের পেটে কৃমি থাকে, আমাশয় এবং চামড়ায় ঘা থাকে, তাহলে কি হবে? এর প্রত্যেকটির চিকিৎসা করা উচিত এ-বিষয়ে কোন দ্বিমত

থাকতে পারে না। প্রত্যেকটির জন্য যদি একটা করে ওষুধ লেখা হয়, তাহলে মোট ওষুধের সংখ্যা দাঁড়ায় কমপক্ষে চারটি। রোগী যদি এখানে চারটির মধ্যে যে-কোন দু'টি বা তিনটি ওষুধ ব্যবহার করেন এবং এতে নিউমোনিয়ার ওষুধ বাদ পড়ে, তাহলে যেটা আসল এবং মুখ্য অসুখ, যেটার চিকিৎসা বিলম্বিত হলে পরিস্থিতি সংকটময় হতে পারে, সেটার চিকিৎসাই এখানে বাদ পড়ল। এই ধরনের ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছে এর নজির মেলে। এটা কিন্তু রোগীর কারণে নয় — রোগীর অজ্ঞতার জন্য। যে চারটি ওষুধ দেয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনটি মুখ্য এবং কোনটি গৌণ, সেটা তাঁর জানা নেই। তিনি তাঁর রোগগুলোকে আলাদা করে ভাবতে পারেন না এবং কোন্ রোগের জন্য কি ওষুধ দেয়া হয়েছে, তাও জানেন না। সব অসুখ সামগ্রিকভাবে বিচার না করলেও তিনি জানেন ডাক্তার তাঁকে ওষুধ দিয়েছেন অসুখ সারাবার জন্য। তিনি ওষুধগুলোর কিছু-না-কিছু খেলে কিছু-না-কিছু উপকার হবে, এটাই তাঁর ধারণা। তাঁর বর্তমান লক্ষণগুলো নতুন — সেটা তিনি জানেন। কিন্তু এই নতুন রোগের জন্য কি ওষুধ দেয়া হয়েছে, সেটা তাঁর জানা নেই। অথচ দু'তিনটা ওষুধ ব্যবহার করেও যে ওষুধটা বাদ পড়ল, সেটাই ছিল তাঁর অতি প্রয়োজনীয় এবং বর্তমানের জটিল রোগ নিউমোনিয়ার জন্য। এহেন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গেলে একজন রোগীকে নয়, গোটা সমস্যাকে উপলব্ধি করতে হবে। রোগের প্রাধান্য, তৎসংলগ্ন জটিলতা, রোগীর আর্থিক সঙ্গতি এবং তাঁর বুঝবার ক্ষমতা — সবকিছু বিচার করে দেখতে হবে। নিউমোনিয়াই যেখানে মুখ্য রোগ, সেটার চিকিৎসা করা সহজ অথচ বিলম্বিত চিকিৎসা বিঘ্ন ঘটাতে পারে এবং ভয়বাহ পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে। উপযুক্ত ওষুধ দিয়ে সেটারই প্রথমে চিকিৎসা করতে হবে। অন্যদিকে আমাশয়, কৃমি এবং চর্মরোগের চিকিৎসা নিউমোনিয়ার সাথে জড়িত করলে জটিলতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

একসাথে অনেক ওষুধ ব্যবহারের অন্য একটি দিকও আছে। ওষুধটা রাসায়নিক পদার্থ বিধায় কয়েকটির সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন ধরনের আন্তঃ এবং পার্শ্ববিক্রিয়া ঘটতে পারে। ফলে ওষুধের কার্যকারিতা কমতে পারে এবং জটিলতাও বাড়তে পারে।

মোটকথা — প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্রে ন্যূনতম ওষুধ লেখা বাঞ্ছনীয়। তবুও প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাই প্রেসক্রিপশনে ওষুধের ছড়াছড়ি। কেন এমন হয়?

ডা: ডি. লরেন্স এবং জে. ডি. ব্ল্যাক প্রণীত 'দি মেডিসিন ইউ টেইক' অথবা 'যে ওষুধ আপনি খান' গ্রন্থের উদ্ধৃতি এখানে যুক্তিসঙ্গত। 'ব্যবস্থাপত্র স্থানভেদে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমেরিকার নর্থ কেরোলিনায় একশ'জন ডাক্তারের তিনদিনের প্রেসক্রিপ্‌শনের উপর একটা সমীক্ষা চালান হয়েছিল। এতে দেখা যায়, একজন ডাক্তার একজন রোগীকে পরীক্ষা করে যত কম জানতে পারেন, তিনি তাঁকে তত বেশি ওষুধ দিয়ে থাকেন।'

১৯৭৬ সালের লন্ডনের 'জার্নাল অব রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস'-এর সম্পাদকীয়ের কিছু অংশের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল। 'প্রত্যেকটি ব্যবস্থাপত্র চিকিৎসকরা সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে দেন না। বস্তুতঃ সমস্ত চিকিৎসক-সমাজকে প্রচলিত ওষুধের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার না করার জন্য সমালোচনা করা যেতে পারে।'

গ্রন্থকারদ্বয় উপযুক্ত উদ্ধৃতির পর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'প্রেসক্রিপ্‌শন লেখা অতি সহজ ব্যাপার। এতে দরকার হয় শুধুমাত্র একটা কলম এবং এক টুকরো কাগজ। মানসিক অশান্তি এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন এমন রোগী থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক সময় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়। ডাক্তার জানেন, সেগুলোর জন্য তাঁর তেমন কিছু করার নেই। আসলে ডাক্তাররা তো মানুষ। অন্যান্য মানুষের মতো তাঁদেরও ক্লান্তি আসে, ক্ষুধা পায়। সমাধানযোগ্য নয় এমন সমস্যা থেকে তাঁরাও রেহাই পেতে চান। এইসব সমস্যা নিয়ে যেসব রোগী আসেন তাঁদের থেকে রেহাই পাবার জন্য তাড়াহুড়ো করে তাঁরা প্রেসক্রিপ্‌শন লেখেন।'

বিভিন্ন কারণে রোগ নির্ণয় যেখানে সম্ভব নয় কিংবা আর্থিক অভাবহেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেখানে করা যায় না, সেখানে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো অনেক ওষুধের সংমিশ্রণ করা হয়। তাড়াতাড়ি রোগ সারিয়ে তোলার প্রয়াসে চিকিৎসক যখন উৎকণ্ঠিত হন, জগাখিচুড়ি প্রেসক্রিপ্‌শন বা ব্যবস্থাপত্র সেখানে অনিবার্য। যেমন ধরুন প্রথম বা দ্বিতীয় দিনের জ্বর নিয়ে কেউ যদি পরামর্শের জন্য আসেন, সেখানে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় অনেক সময় সহজ নয়। সামান্য সর্দিজ্বর কিংবা ভাইরাসজনিত জ্বর থেকে আরম্ভ করে নিউমোনিয়া, টাইফয়েড এমনি আরও বিভিন্ন ধরনের রোগের সম্ভাবনা সেখানে উড়িয়ে দেয়া যায় না। জ্বরের মাত্রা বেশি হলে সাময়িকভাবে তা কমানর জন্য প্যারাসিটামল বা এস্‌পিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়ার পর সর্দি কিংবা ভাইরাসজনিত জ্বর দু'একদিনের মধ্যে সেরে যাবার কথা।

তা যদি না হয় তাহলে ইতিমধ্যে অন্য সব লক্ষণ প্রকাশ পাবে এবং দরকার হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়ে উঠবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ধৈর্যের চেয়ে অধৈর্যের প্রমাণ বেশি মেলে। দু'একদিন অপেক্ষা করার চেয়ে অযৌক্তিকভাবে দু'তিনটা ওষুধের সংমিশ্রণ দেয়া হয় যাতে থাকে ম্যালেরিয়ার জন্য টেবলেট, টাইফয়েডের জন্য ক্যাপসুল, হজমের জন্য টনিক, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি। সব মিলে এমনিকরে একই প্রেসক্রিপশনে ছ'সাতটি ওষুধ লেখা হয়। রোগ নির্ণয় না করে রোগীর উৎকণ্ঠার কারণে উপশমের প্রয়াসে প্রেসক্রিপশনে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

অনেক সময় বিত্তশালী রোগীর প্রভাব চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশনেও প্রতিফলিত হয়। প্রভাবশালী ব্যক্তিবিশেষের কোন ওষুধের প্রতি বিশ্বাস কিংবা আকর্ষণ অহেতুক হলেও তাঁদের অনুরোধে কোন-কোন ওষুধ প্রেসক্রিপশনের অন্তর্ভুক্ত হয়, রোগের চাহিদা অনুসারে নয়। নিঃসন্দেহে ডাক্তারদের এ ধরনের চাপ প্রতিরোধ করতে হবে। তবে অনেকক্ষেত্রে তা হয়ে উঠে না। বার বার পীড়াপীড়ি করে সময় নষ্ট করার চেয়ে একজন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত চিকিৎসকের পক্ষে তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপশন লিখে বিদায় দিয়ে পরবর্তী রোগী পরীক্ষা করা এহেন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার একটা সহজ উপায়। অনেক দেশে প্রতি রোগীর পেছনে একজন ডাক্তার যে সময় দেন, তা পাঁচ মিনিটেরও কম।

উপসংহারে ডা: লরেন্স ও ডা: ব্ল্যাক কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের কথায়, '(১) যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে ওষুধ অনেক উপকারে আসতে পারে এবং অপকারিতা হ্রাস পায়। (২) অযৌক্তিক এবং ওষুধের খামখেয়ালী ব্যবহারের জন্য চিকিৎসকদের সমালোচনা প্রত্যাশিত এবং ন্যায়সঙ্গত। (৩) ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য জনসাধারণকে অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন ; এতে ওষুধের কিছুটা গুণাগুণ বিচার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়।' এই দায়িত্ব কাদের উপর, সেটাই বিচার্য।

মিলটন সিলভারম্যান, ফিলিপলি এবং মিয়া লিডেকার তাঁদের 'প্রেসক্রিপশন ফর ডেথ' বা 'মৃত্যুর ব্যবস্থাপত্র' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, একজন আমেরিকান চিকিৎসক তান্জানিয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 'সেখানে একজন চিকিৎসক প্রতি ঘণ্টায় ১২-১৪ জন রোগী দেখেন। এমনকি প্রতি মিনিটে একজন করে রোগী দেখতেও দেখা যায়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এটা দেখা গেছে। রোগী তাঁর লক্ষণ বর্ণনা শেষ করার আগেই দেখা যায় তাঁর জন্য প্রেসক্রিপশন লেখা

শেষ হয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র প্রত্যেক চিকিৎসকের পিছনে দেখা যায় সারি সারি রোগী। পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় তাঁদের রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। সে কারণে কোন্ ওষুধ বাজারে কিংবা দেশে বেশি চলবে, তা অনেকটা তাঁদের উপর নির্ভর করে। ওষুধ কোম্পানীগুলোও এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ওয়াকেবহাল এবং এ-জন্যই তাদের নিজেদের স্বার্থে যেন-তেন প্রকারে তাঁদের সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী। এমনকি এই উদ্দেশ্যে মাঝে-মাঝে উৎকোচ প্রদানও করে থাকে।'

সুন্দর কাগজে ছাপান তথাকথিত বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে এরা চিকিৎসকসমাজকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস পায়। এমনকি এসব প্রচারপত্র উন্নত এবং দরিদ্র দেশে তথ্যের দিক দিয়ে একইভাবে প্রকাশ পায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গ্লাক্সো কোম্পানী তৃতীয় বিশ্বের কোন-কোন দেশে নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছে :

'সম্প্রতি ভিটামিন বি১২-র টনিক হিসেবে উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে . . . । ভিটামিন বি১২ দেহবৃদ্ধিতে সহায়তা করে, শারীরিক কর্মক্ষমতা বাড়ায় . . . ।' কিন্তু এ নিয়ে উন্নত দেশে আজ পর্যন্ত এ ধরনের কোন বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি। এখন বুঝে দেখুন, এমন একটা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর মাধ্যমে যেটা প্রকাশ পায়, তার প্রভাব কতটুকু হতে পারে। সাইটামিন তথা ভিটামিন বি১২ অনেকের কাছে একটা মহৌষধ। অন্ততঃ কোম্পানীর কথায় তাই প্রমাণ করে। ফলে সাইটামিন-এর প্রেসক্রিপ্শন যখন-তখন যেখানে-সেখানে দেয়া হয়। শারীরিক দুর্বলতা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ রক্তহীনতা, এমনকি ক্ষুধামন্দা প্রত্যেকটি অসুখের জন্য এটা যেন একটা প্রমাণিত উপযোগী ওষুধ। অথচ এসবের কোনটার জন্যই সাইটামিন বা বি১২ প্রয়োগের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।

এমনি ধরনের অনেক তথাকথিত ওষুধ বাজারে ওষুধ কিংবা মহৌষধ নামে পরিচিত হলেও সেগুলোর পিছনে রয়েছে কোম্পানীর বলিষ্ঠ প্রচারমাধ্যম আর আমাদের অর্থাৎ আমরা যাঁরা প্রেসক্রিপ্শন লিখি বা আমরা যাঁরা লেখাপড়া জানি—প্রত্যেকের এগুলোর উপর প্রবল বিশ্বাস।

অতএব একটি প্রেসক্রিপ্শনে বেশি ওষুধ লেখার পিছনে একটি নয়, একাধিক কারণ রয়েছে। বিভিন্ন রকম প্রচারের মাধ্যমে, বাজারে প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানীর নানা চেষ্টার নামে অপচেষ্টার ফলে জনসাধারণ থেকে শুরু করে চিকিৎসকসমাজ পর্যন্ত সকলেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েন। বিভিন্ন

ধরনের প্রলোভনের মাধ্যমে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপ্শন লেখায় উৎসাহিত করা, শিক্ষিত জনসাধারণ এবং প্রশাসনকেও প্রভাবিত করা এগুলোর অন্যতম।

আমাদের মতো দরিদ্রতম দেশে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক প্রয়োজনের সময় ওষুধ পান না, স্বাস্থ্য খাতে যেখানে অর্থ বরাদ্দও অতি সীমিত, সেখানে দেখা যায়, অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর ওষুধের ছড়াছড়ি। প্রেসক্রিপ্শনের মাধ্যমে এগুলো প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে। দরিদ্র জনগণ অনেক সময় তাঁদের শেষ সম্বল বিক্রি করে উপশমের আশায় উক্ত অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর ওষুধ ক্রয় করে নিজেদের স্বাস্থ্যহানি করে সংকটের সম্মুখীন হন।

সীমিত চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রেসক্রিপ্শন সীমিতকরণ কিংবা ওষুধ বিক্রির উপর বিভিন্ন বাধা-নিষেধ আরোপ উন্নত দেশে যেভাবে করা হয়, তা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। এখানে অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত চিকিৎসকের উপর আমরা অত্যন্ত নির্ভরশীল। ন্যায় বা অন্যায়ভাবে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত কিংবা যুক্তিহীনভাবে যে ওষুধ বাজারে প্রচলিত থাকে, তা তারা লিখবেই। লোকমুখে শুনে-শুনে অনেকে দোকান থেকে নিজেরাই কিনে এগুলো ব্যবহার করে। এসব অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর তথাকথিত ওষুধ থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় এমন একটা ব্যবস্থা যার ফলে এগুলোর অস্তিত্ব লোপ পাবে। মনে রাখতে হবে বাজার থেকে অদৃশ্য হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। অস্তিত্ব লোপই একমাত্র উপায়। কারণ কালোবাজার আর কালোবাজারী পৃথিবীর প্রায় সব দেশে আছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

আইনের মাধ্যমে বিধিনিষেধ প্রয়োগের ব্যাপারে চিকিৎসকসমাজের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। এককালের অতি প্রিয় এবং পরিচিত কোরামিন এখন অদৃশ্য — প্রায়ই বিলুপ্ত। তরল কোরামিন ফোঁটা-ফোঁটা করে মুখে দিয়ে একটা মরণমুখী রোগীকে বাঁচাবার প্রয়াস এখন আর নেই। সকলে জানেন এভাবে কোরামিনের কোন কার্যকারিতা নেই। যুক্তিসঙ্গতভাবে কোরামিন ব্যবহারের মোটামুটিভাবে একটি কারণ আছে। তা-ও ইন্‌জেক্‌শনের মাধ্যমে। সচেতন চিকিৎসকসমাজ কোরামিনের ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হয়ে কোরামিনের প্রতি অহেতুক দয়ামায়া পরিত্যাগ করেছেন বলে এত আদরের ওষুধটা এখন অনাদরের। অনাদরের বললে হয়তবা ভুল হবে। তবে নিঃসন্দেহে এর সীমাহীন বাজারের বহুল-প্রচলন থেকে এখন সেটা তার আপন সীমায় বা গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ — সর্বরোগের স্থলে এখন একটি রোগেই শুধু এর ব্যবহার। তা-ও মুখে সেবন করে নয়।

অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক ওষুধের বাজার থেকে বিলুপ্তি কেমন করে সম্ভব, কোরামিনের আপন গণ্ডিতে প্রত্যাবর্তন একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মোটকথা আমরা যা লিখি, অন্যেরাও তাই লিখেন। কেউ লেখা থেকে আর কেউ-বা শোনা কথায় আমাদের সমর্থিত ওষুধকে সাদরে উপযোগী বলে গ্রহণ করে নেন। ক্ষতিকর ওষুধও এভাবে বাজারে বিস্তৃতি লাভ করে। এখানেই আমাদের দায়িত্ব।

একটা প্রেসক্রিপশনে একাধিক ওষুধ লেখার আগে একাধিকবার ভেবে দেখতে হবে কেন এত ওষুধ !

সব অসুখে ওষুধ লাগে না

ব্যাধিগ্রস্ত অগণিত মানুষের রোগমুক্তির জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার ব্যবস্থাপত্র লেখা হয়। উদ্দেশ্য রোগমুক্তি অথবা উপশম। যতদূর সম্ভব রোগমুক্তি সকলের কাম্য। যে-রোগ দুরারোগ্য এবং যে-ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি, যতটুকু সম্ভব তাঁদের কিছুটা কষ্টের লাঘব করা একটা নীতিগত ব্যাপার। এক কথায় ব্যবস্থাপত্রের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করা এবং সম্ভব না হলে কষ্ট লাঘব করা। এই উদ্দেশ্যকে সব সময় নীতি এবং মানগত দিক দিয়ে আমরা পালন করে আসছি।

একটা ব্যবস্থাপত্র লেখার ব্যাপারে চিকিৎসক, ওষুধ ব্যবসায়ী এবং রোগী — এই তিন পক্ষ সরাসরি অথবা কোন-না-কোনভাবে জড়িত। ব্যবসায় প্রসার লাভ করুক এটা প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই কাম্য। আসলে কোন্ ওষুধ কি পরিমাণ তৈরি হবে তা নির্ধারণ করা হয় বাজারের চাহিদা অনুসারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এগুলোকে সবসময় তাঁরা বিচার করে দেখেন না। ফলে যেখানে হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে বাজার ভর্তি সেখানে জীবনরক্ষাকারী অনেক ওষুধই পাওয়া যায় না।

রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রায়ই প্রচার করা হয় জীবনরক্ষাকারী . . . ওষুধ কোন সহৃদয় ব্যক্তি দিতে পারলে . . . রোগীর জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। এ-সমস্ত রহস্যের মূলে কে বা কারা দায়ী সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীমহল নিজেদের তৈরী বিভিন্ন ওষুধের চাহিদা বাড়াবার জন্য যাঁরা ব্যবস্থাপত্র লেখেন তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন পথও তৈরি করে থাকেন। কাগজে আকর্ষণীয়ভাবে এমন সব তথাকথিত তথ্য তুলে ধরেন যা প্রাথমিক দৃষ্টিতে সত্য মনে হবে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাঁরা পুরনো, অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত তাঁরাই বেশি প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন। সুন্দর কাগজে বিভিন্ন রঙের লেবেল-এর উপর বিভিন্ন উপাদানের সুদীর্ঘ তালিকা সহজ-সরল জনগণের মনে

নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই এটা অস্বাভাবিক হলেও সত্য যে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র লেখবার আগে ডাক্তারের সাথে পরামর্শশেষে এক বা একাধিক ওষুধ লেখবার জন্য রোগীরাই অনুরোধ জানান। যেমন ধরুন, রক্তের ওষুধ, হজমী ওষুধ, ঘুমের ওষুধ, মাথা-ব্যথার ওষুধ, স্মৃতিশক্তি বাড়ানর ওষুধ — ইত্যাদি।

পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ — বাংলাদেশ। এই দেশেই ১৯৮১ সালে বিভিন্ন ধরনের এলোপ্যাথিক ওষুধের জন্য খরচ হয় ১৫৩ কোটি টাকা। আর বাজারজাত হয় প্রায় চার হাজারের মতো বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। এগুলোর অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়, এমনকি কোন-কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। এমন এক দুঃখজনক পরিস্থিতিতে একটা জাতি বেশিদিন নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারে না। শুধু সরকারের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিজেরা গা-বাঁচিয়ে চলবেন, এটাকে নৈতিক দিক দিয়ে সমর্থন দেয়া যায় না। আমরা যাঁরা ব্যবস্থাপত্র লিখি তাঁদের উদ্দেশ্য যদি রোগের উপশম হয়, তাহলে সে-দিক দিয়ে আমরা কতটুকু ভুলের মধ্যে এখনও ডুবে আছি কয়েকটি দৃষ্টান্ত তা-ই প্রমাণ করবে।

কিছুদিন আগে কোন একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের একজন পদস্থ কর্মচারী চিকিৎসার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করেন। অনিদ্রা, বুক ধড়ফড় করা, বদহজম, মাথা-ব্যথা, হাত-পায়ে ঝিন্‌ঝিন্ করা, এগুলোই ছিল তাঁর প্রধান উপসর্গ। বিগত সাত-আট মাস ধরে একে-একে চার-পাঁচ জন চিকিৎসকের পরামর্শ তিনি নেন। বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক ব্যবস্থাপত্র তাঁকে দেয়া হয়। ঘুমের বড়ি, হজমী টনিক, ভিটামিন ইন্‌জেক্‌শন ইত্যাদি বিভিন্ন ওষুধ বিভিন্ন সময়ে দেয়া হয়েছে। সব ওষুধের তালিকা একসাথে যোগ করলে প্রায় অর্ধশতকের কাছাকাছি হবে। অথচ রোগের উপশম হয়নি। রোগীর ভিড়ের মধ্যে আগাগোড়া রোগের ইতিহাস শোনা এবং পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখা কোনভাবেই সম্ভব নয় — এই ভেবে ভদ্রলোককে অনুরোধ জানালাম সমস্ত কিছু নিজ হাতে লিখে, সে যত লম্বাই হোক, আমার সহকর্মীর কাছে একসময় রেখে যেতে। সপ্তাহখানেক পর আমার সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় ধার্য করা হল। তিনি নির্দেশানুযায়ী দু'এক দিনের মধ্যেই সমস্ত ইতিহাস এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনা লিখে অঙ্গীকার অনুসারে কাজ করলেন। এর মধ্যে তাঁর ইতিহাস সম্পূর্ণ পড়ে নিয়ে যেখানে-যেখানে দরকার লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করলাম। নির্ধারিত দিন তিনি এলেন। রোগীর ইতিহাস পাশের ড্রয়ার থেকে তুলে নিয়ে তাঁকে দেখালাম। বললাম, তাঁর কোন ওষুধের দরকার নেই। অফিসের উর্ধ্বতন কর্তার সাথে আপ্রাণ

চেষ্টা করেও মতের মিল ঘটাতে না পারায় তাঁর এইসব উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ওষুধ ব্যবহারে এগুলোর উপশম হবে না। অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে, এমনকি কিছুটা দুঃখজনক পরিস্থিতিকে সহ্য করে নিতে হবে ; নিষ্ঠার সাথে কাজ করছি, এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মানসিক শান্তি থেকে দৈহিক শান্তি আসবে। টেবলেট কিংবা টনিক দিয়ে কোনদিনও উপশম হবে না। বরং অহেতুক অর্থব্যয়ে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আমার এ–সমস্ত বলার সাথে সাথে তাঁর চেহারায় পরিবর্তন দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ আগেকার বিমর্ষ আশঙ্কাজড়িত ভদ্রলোকের চোখে–মুখে হাসি ফুটে উঠল। অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আর ওষুধ ব্যবহার করবেন না এই অঙ্গীকার করে তিনি বিদায় নিলেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য এমন একটি অবস্থা যা প্রায় সকলের কোন–না–কোন সময় চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য কাকে বলে, বৈজ্ঞানিক দিক থেকে তার সংজ্ঞা দেয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। সপ্তাহে একদিন করে পায়খানা হয় এমন লোক যেমন আছেন, তেমনি দিনে দু'তিন বার করে পায়খানা হয় এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যেমন নিঃসন্দেহে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগী বলা যাবে না, দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও তেমনি কোষ্ঠকাঠিন্য নয় বলে চিহ্নিত করা যায় না। সোজা কথায় কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে।

অনেক সময় অনেক আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। লেখা থাকে 'সপ্তাহে একবার বিশেষ কোন একটা জোলাপ খেলে শরীরের সব বিষাক্ত জিনিস বের হয়ে যাবে। প্রত্যেক শনিবার রাত্রে একটি করে জোলাপ নিলে গোটা সপ্তাহ সতেজ থাকবেন।' এতে অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সত্য বলে মেনে নিয়ে, সুন্দর বোতলে রাখা তেমন সস্তা নয় এমন একটা জোলাপের বোতল কিনে বাড়িতে আনেন। প্রতি শনিবার নির্দেশমতো খেতে থাকেন। এভাবে কয়েক সপ্তাহ যাওয়ার পর তিনি বলতে পারেন জোলাপের মাত্রা না বাড়ালে আগের মতো আর সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া রবিবারে কয়েকবার পায়খানা হবার পর পরবর্তী কয়েকদিন আগে যে পরিমাণ পায়খানা হত তা হয়নি। এমনি করে জোলাপের পর পায়খানা, পায়খানার পর কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠকাঠিন্যের পর জোলাপ, এমনি একটা বিষচক্রের **(Vicious Cycle)** সৃষ্টি হয়। ফলে অহেতুক পয়সা খরচ হয়। স্বাভাবিক অভ্যাসগুলো নষ্ট হয়। শারীরিক দিক থেকে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়। মনে রাখতে হবে, জোলাপ কৃত্রিম উপায়ে সাময়িকভাবে পায়খানার

পরিমাণ বৃদ্ধি করে, সাথে সাথে শরীরের কিছু-কিছু উপকারী উপাদানও অহেতুক বের হতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন জোলাপের ব্যবহার মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। যেসব কারণে কোষ্ঠকাঠিন্যের সৃষ্টি হতে পারে তার মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের অভাব, সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানার গতিবেগ প্রতিরোধ, স্বল্প পরিমাণ পানি পান করা, খাবারের মধ্যে শাকসবজি বা আঁশজাতীয় জিনিসের অভাব ইত্যাদি প্রধান। এই সমস্ত বিবেচনা না করে তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে আমরা প্রেসক্রিপ্শন লিখি জোলাপের জন্য।

একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাঁর সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে কয়েকদিন আগে আমার পরামর্শের জন্য আসেন। তাঁর কথায় দু'বৎসর যাবৎ তাঁর পিতা অনিদ্রায় ভুগছেন। ডজনখানেক ব্যবস্থাপত্র বিভিন্ন চিকিৎসকের নিকট থেকে নেয়া হয়েছে। এগুলোতে আছে ঘুমের বড়ি, সপ্তাহে দু'একটা কোন-কোন ক্ষেত্রে একদিন পর পর ইনজেক্শন। তাছাড়া আছে বহুলপ্রচলিত টনিক। পিতা-পুত্র দু'জনেই একমত যে, নতুন ব্যবস্থাপত্রমতে ওষুধ ব্যবহারের প্রথম কিছুদিন কিংবা দু'এক সপ্তাহ বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, তারপরই অবস্থা আবার আগের মতো হয়ে যায়। সমস্ত ঘটনা শুনে এবং ব্যবস্থাপত্র দেখে রোগীকে পরীক্ষা করে কোন রকম রোগ নির্ণয় করতে পারলাম না। তবে একটা সত্য বের হল : বৃদ্ধ পিতা দুপুরে আহারের পর প্রায় এক ঘণ্টা আর রাতে এগারটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ঘুমান। হিসেব করে দেখলাম প্রতিদিন তিনি পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাচ্ছেন। এই বয়সে এটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। তবে কেন এ অভিযোগ? এটা বোঝা সহজ যে, শেষ রাতে সাড়ে তিনটার দিকে যখন তাঁর ঘুম ভেঙে যায় চারদিকে তখন নিঃঝুম অন্ধকার। বাড়িতে সকলেই তখন ঘুমে আচ্ছন্ন আর তিনি একা জেগে। এমন একটা পরিস্থিতিতে নিজেকে একটু ব্যতিক্রম মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আসলে এটা সত্যি নয়। তাঁর বয়সে যা পাওনা সে পরিমাণ ঘুম তিনি ঠিকই পাচ্ছেন। বাড়িতে সমবয়সী আর একজন থাকলে নিজেকে তিনি এমন অবস্থায় অসহায় মনে করতেন না। এছাড়াও এতদিন কেউ তাঁকে হিসেব করে দেখাননি যে, তাঁর যা পাওনা, তা তিনি এখনও পাচ্ছেন। এটা তাঁকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবার পর তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এ সত্যকে মেনে নিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে জানতে পারলাম ওষুধ বন্ধ করার পর থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভাল আছেন।

বাজারে বিভিন্ন নামে কত ধরনের ভিটামিন আছে তার হিসেব করা কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো অপ্রয়োজনীয় ; এমনকি কোন-কোন ক্ষেত্রে

ক্ষতিকারক। ইতিপূর্বে পত্রিকান্তরে টনিক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত বিষয় পুনরাবৃত্তি না করে দু'একটা ভিটামিন সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ভিটামিন বি^{১}-এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে নেই বললে চলে। পার্নিশাস এনিমিয়া (pernicious anaemia) বলে যে রোগে এর ব্যবহার, তার অস্তিত্ব বাংলাদেশে এ পর্যন্ত একাধিক প্রমাণিত হয়নি।

পাকস্থলীতে (Stomach) ক্যান্সার হলে অপারেশন করে যদি সেটা সম্পূর্ণ ফেলে দেয়া হয় তবে ইন্ট্রিনসিক ফেক্টর (Intrinsic factor) বলে একটা জিনিস যা পাকস্থলীতে তৈরি হয়, তা আর হতে পারে না। এর অভাবে ভিটামিন বি^{১২} শরীরে গৃহীত হতে পারে না। এমন একটা পরিস্থিতিতে ভিটামিন বি^{১২} ইনজেকশন হিসেবে দেয়া দরকার হতে পারে। তবে সেটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ লিভারে যে পরিমাণ ভিটামিন বি^{১২} জমা থাকে, পাঁচ–ছ' বছর শরীরের চাহিদা মেটাবার জন্য তা যথেষ্ট। এদিকে পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগী অপারেশনের পর শতকরা দশজনের বেশি সেই সময়–সীমার উর্ধ্বে বাঁচেন না।

ভিটামিন 'সি' একটা বহুলপ্রচলিত ভিটামিন। ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে বিভিন্ন রকমের ভিটামিন 'সি' তৈরি করে থাকে। একটা টেবলেটে একশ থেকে পাঁচশ মিলিগ্রাম সংযুক্ত ভিটামিন 'সি' এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যা চুষে–চুষে লজেন্সের মতো খাওয়া যায়। অথবা এক গ্লাস পানিতে ঢেলে সুস্বাদু সরবত হিসেবে পান করা যায়। এমনকি অনেককে অতিথি আপ্যায়ন করতেও দেখেছি। ভিটামিন 'সি'–এর অভাব ঘটলে বিশেষ করে দাঁতের গোড়া থেকে রক্তপাত হতে পারে। পুষ্টিহীন শিশুদের বেলায় এটা দেখা যায়। ভিটামিন 'সি' এ–সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু লেবু, টমেটো, পেয়ারা, কমলা ইত্যাদিতে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট। এককালে ধারণা ছিল, ভিটামিন 'সি' সেবন করলে সর্দি ভাল হয়। এ ধারণা শিক্ষিত সমাজেও দুর্ভাগ্যক্রমে বহুলপ্রচলিত। বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করবার জন্য ব্যবসায়ীরা একশ থেকে পাঁচশ মিলিগ্রামের বিভিন্ন পরিমাণ ভিটামিন 'সি' বাজারজাত করে। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ভিটামিন 'সি' সর্দি–কাশিতে কোন কাজে লাগে না। বরং দীর্ঘদিন ধরে বেশি পরিমাণে ভিটামিন 'সি' সেবন করলে বৃক্কে (কিডনীতে) পাথর হতে পারে। এমনি আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেগুলো স্থানাভাবে বিশদভাবে আলোচনা সম্ভব নয়।

এ-পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে, যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ব্যবস্থাপত্রে ভরপুর দরিদ্র বাংলাদেশে অসংখ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ অসহায়ভাবে অযৌক্তিক ব্যবস্থাপত্রের শিকার হয়ে পড়েন। এতে তাঁদের মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষতি হয়, এজন্য দায়ী শুধু ব্যবসায়ীমহল নয়, যাঁরা ব্যবস্থাপত্র লেখেন তাঁরাও। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসা যাতে জনসাধারণের কল্যাণে আসে সেটা চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব। সীমিত আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপত্র একটি সামাজিক সংঘাত। এর প্রতিবিধান করা একটা জাতীয় কর্তব্য। তবু কেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দরিদ্র দেশবাসীকে তাড়াহুড়ো করে একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে আশ্বস্ত থাকি? অন্ততঃপক্ষে একটা ওষুধ লিখে না দিলে রোগী হয়ত মনে করবেন যে ডাক্তার কিছু জানেন না। নতুন নামের ওষুধ না দিলে, এ ডাক্তারের নতুন চিন্তা-ভাবনা নেই। বেশি দামের ওষুধ না দিলে সে ওষুধ উপকারী নয়। অনেকগুলো ওষুধ একসাথে দিলে অনেক উপকার হবে, এসব অযৌক্তিক মিথ্যা ধারণার বশে আমরা আর কতদিন নিজেদের আবদ্ধ রাখব? নিতান্ত অসহায়, অনেকাংশে নিরুপায় রোগীদের সমস্যাজর্জরিত না করে সংকটমুক্ত করাকে নীতিগতভাবে এবং জাতীয় অনুভূতির মাধ্যমে বিচার করতে হবে। রোগ থাকলে রোগের মূল উদ্ঘাটন না করে ব্যবস্থাপত্রের পর ব্যবস্থাপত্র লিখে সংকটের সৃষ্টি করা একটি অমার্জনীয় অপরাধ। স্বীকার করতে হবে, রোগী এলেই ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। অসুখ হলেই ওষুধ লাগবে এমন কোন কথা নেই।

যদি ঘুম না হয়

আমরা সবাই ঘুমাই। এ-ঘুম সব সময় সবার জন্য সমান হয় না। কোন-কোন সময়ে কিছু-না-কিছু ব্যাঘাত ঘটেই। নানা কারণে যাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে আসেন, তাঁদের অনেকেরই অভিযোগ কম মাত্রায় ঘুম বা অনিদ্রা। প্রাথমিক অন্যান্য অসুবিধা থাকলেও অনেকে এটাকেই প্রধান বলে ধরে নেন।

ক্ষুধামন্দা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অনিদ্রা — এই তিনটি লক্ষণ অধিকাংশ বয়স্ক লোকের মুখে শোনা যায়। তাঁরা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে আসেন এগুলো প্রতিকারের উদ্দেশ্যে। আবার কিছু সংখ্যক মায়ের মুখে শোনা যায় যে তাঁদের নবজাত শিশুরা দিনভর ঘুমায়।

আসলে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অনিদ্রা আর নবজাতকদের অতিনিদ্রা কোনটাই অস্বাভাবিক নয়। বয়সের সাথে ঘুমের মাত্রা এখানে ঠিকই আছে অন্ততঃ চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে একজন নবজাত শিশুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সব সময় ঘুমান উচিত। আর ৭০/৮০ বয়সের একজন বৃদ্ধের প্রয়োজন মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘুম। আসলে অনিদ্রা কিংবা অতিনিদ্রা কারও কাম্য নয়।

নিদ্রা-অনিদ্রা আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের সাথে যেহেতু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এর বিভিন্ন কারণ এবং প্রতিকার সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা হবে।

জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি হয়তবা ইতিমধ্যেই এই নিদ্রা-অনিদ্রার অনেক কারণ জানতে পেরেছেন। এই যেমন ধরুন অতি সুখের কিংবা দুঃখের ঘটনা, ব্যবসায়ের হিসেবের গরমিল, চাকরিতে উর্ধ্বতন কিংবা সহকর্মীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি, মাত্রাতিরিক্ত চা-কফি পান কিংবা অতিভোজন প্রভৃতি যে কোন কারণই আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, আয়কর রিটার্ন দেয়ার আগের কয়েকদিনের এমন-কি সপ্তাহের কথা ভাবুন, ঘুমাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

ধরুন, আপনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব কিংবা কর্মকর্তা। আপনি বাজেট তৈরি কিংবা এর সাথে জড়িত রয়েছেন। দলিল তৈরির আগের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছেন কি?

আবার ভাল কাজ করেও যদি কাউকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অহেতুক বকুনি খেতে হয়, তখন তাঁর ঘুম তো দূরের কথা, খাবার রুচিও কমে যায়।

এবার নিজের কথা বলি। নিতান্ত প্রাণের টানে বছরে দু'এক বার হলেও গ্রামের বাড়িতে যাই। সেখানে একরাত, কখনও পর পর দু'রাত কাটাই। শহর থেকে ভিন্ন পরিবেশ, বৈদ্যুতিক পাখা নেই, আরামদায়ক গদিও নেই। খাটের উপর পাটি কিংবা দু'এক ইঞ্চির গদি। আশেপাশে লোকজনের ভিড়। এই স্বল্প সময়ে প্রত্যেকে চায় আমার কাছে তাদের নানা সমস্যার সমাধান। এই অবস্থায় রাত প্রায় বারটা কিংবা একটা পর্যন্ত বেজে যায়। তারপর লোকজনদের বিদায় দিয়ে বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে যাই।

যখনি বাড়ি যাই ছোটবেলার সাথী মামাকে, যিনি গ্রামেই থাকেন সবসময় সাথে রাখি। কারণ একা থাকতে আমার অস্বস্তিবোধ হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অথচ আমার মোটেই ঘুম আসে না। এত রাতে এই বিছানায়, এরূপ পরিবেশে ঘুমান আমার অভ্যাস নয়। তাছাড়া গভীর রাতে গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন, নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশ আমার কাছে রীতিমতো অস্বস্তিকর।

আমার পাশের কামরায় থাকেন ভাবী তাঁর নাতি-নাতনীদের সাথে নিয়ে। এরা মাঝে-মাঝে কেঁদে উঠে। ভাবী দরজা খুলে তাদের একের পর এক বাইরে নিয়ে যান প্রকৃতির প্রয়োজনে। কামরার মাঝখানে অসম্পূর্ণ দেয়ালটা ছাদ পর্যন্ত উঠান হয়নি। পাশের কামরার টুঁশব্দটি পর্যন্ত কানে ভেসে আসে। এত সব কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা গ্রামের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা বা অবহেলার নিদর্শন নয়। এই বর্ণনা দিয়েছি শুধু ঘুমের সাথে পরিবেশের যে নিগূঢ় সম্পর্ক তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। আমি আর আমার সেই মামা একইসাথে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি। বেশ কয়েক বৎসর কলকাতা শহরে একই কামরায় একই সাথে থেকেছি, এক-দু' মাস নয়, কয়েক বৎসর। জীবনের গতিধারার পরিবর্তনে বহুদিন পূর্বেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। উচ্চশিক্ষিত হয়েও মামা এখনও গ্রামের বাসিন্দা। অধিকাংশ সময় তিনি গ্রামেই কাটান এবং মাঝে-মাঝে শহরে গিয়ে ওকালতি করেন। শহরে থাকলে নাকি তাঁর ঘুম হয় না অথচ গ্রামে আমার পাশে অধিক রাতে বাতি নিভানর সাথে সাথে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

এই কাহিনী একটা বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণ করে। আপনার শরীর-মন যে পরিবেশে অভ্যস্ত নয় কিংবা স্বস্তিবোধ করে না, সেখানে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এই তো সেদিনের কথা। হঠাৎ আমার এক পুরনো বন্ধু রোগী হিসেবে আমার চেম্বারে এসে হাজির। তাঁর একমাত্র অভিযোগ ঘুমের ব্যাঘাত। কিছুদিন আগে কোন একটা বিশেষ কারণে সে উত্তেজিত হয়ে উঠে। তারপর থেকে তার ঘুম হয় না। এইভাবে ক্রমান্বয়ে দু'তিন রাত নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাবার পর ঘুমতে গেলেই সে অস্বস্তি বোধ করে। চেষ্টা করলেও তার ঘুম আসে না এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা তার মনে দানা বেঁধে উঠেছে। বিছানায় শুতে গেলেই তার নানা ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। সে অস্বস্তি বোধ করে। তার মাথা ভার-ভার লাগে, বুক ধড়ফড় করে ইত্যাদি।

নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখতে পেলাম তার শারীরিক রোগ কিংবা অন্য কোন রকম অসুবিধা নেই। অতীতেও তার বড় একটা ঘুমের ব্যাঘাত ছিল না। পারিবারিক জীবনেও সে মোটামুটি সুখী। তাই বন্ধু ও ডাক্তার হিসেবে একটু সময় নিয়ে তাকে সব বুঝিয়ে দিলাম। এই অনিদ্রা শারীরিক কোন অসুস্থতার কারণে হয়নি বরং উত্তেজনা থেকে অনিদ্রা, অনিদ্রা থেকে দুশ্চিন্তা, দুশ্চিন্তা থেকে অনিদ্রা। এই বিষচক্রই তার বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। কয়েকটি উপদেশ দিলাম। সে আশ্বস্ত হল। বেশ কিছু দিন পরে দেখা। আগের সেই সুন্দর চেহারা ফিরে এসেছে। কুশল জিজ্ঞাসা করলে সে হাসিমুখে বলল, এখন সে সুস্থ, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে।

ঘুমের ব্যাপারে অনেকে প্রায়ই হিসেবের ভুল করে থাকেন। অনিদ্রা বলে যাকে ব্যাখ্যা দেন, সেটা আসলে মোটেই অনিদ্রা নয়। কারণ আগেই বলেছি বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঘুমের চাহিদাও কমে যায়। একজন বয়স্ক লোকের ঘুমের চাহিদা একজন যুবকের চেয়ে অনেক কম। ৬০-এর ঊর্ধ্বে যাঁদের বয়স, চার পাঁচ ঘণ্টার কাছাকাছি ঘুম তাঁদের জন্য যথেষ্ট। যেমন ধরুন, যদি কেউ রাত ১১টায় ঘুমিয়ে পড়েন আর রাত তিনটা-চারটায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, এই পরিমাণ ঘুম তাঁর জন্য যথেষ্ট। তবুও এঁরা দুঃখ করে বলেন, 'অনেক ভোরে ঘুম ভেঙে যায়।' হিসেবমতে তিনি কিন্তু চার পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। অথচ তিনি ঘুমের অভাব বোধ করেন। কারণ হয়ত তিনি হিসেব করে দেখেননি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠেন, তিনি তাঁর সমবয়সী কাউকেও তাঁর মতো নিদ্রাহীন অবস্থায় দেখেন না। বরং দেখেন অন্যরা ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। তিনি দেখেন তিনিই একমাত্র জেগে আছেন।

তাঁর মতো সমবয়সী সব লোক যদি একত্র করা যেত হিসেবের ব্যবধান তখন থাকত না এবং তিনি নিজেকেও একা ভাবতেন না। অনিদ্রায় ভোগেন এই অভিযোগও তখন তাঁর আর থাকত না।

প্রতিটি সৃষ্ট জীব একটা নিয়মের অধীন। এর ব্যতিক্রম হলেই কিছু-না-কিছু কুফল দেখা দেয়। জেগে থাকা এবং ঘুমান মানুষের জীবনে নিয়ম থেকে অভ্যাসে পরিণত হয়। রাতের বেলায় ঘুমান একটা সাধারণ নিয়ম। আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁদের দীর্ঘদিন ধরে সারারাত কাজ করতে হয়। বিশেষ করে যাঁরা পালাক্রমে কাজ করেন। শুরুর দিকে কিছুটা অসুবিধা হলেও ক্রমান্বয়ে তাঁদের শরীর-মন ঘুমের নতুন সময়-নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পালাক্রমে সময়সূচী অনুযায়ী রাতে তাঁদের কাজ থাকলেও দিনে ঘুমান এবং পরবর্তী পর্যায়ে দিনে কাজ থাকলেও রাতে ঘুমাতে কষ্ট হয় না। বরং তা একটা সাধারণ নিয়ম বা অভ্যাসে পরিণত হয়।

দিনের বেলা ঘণ্টাখানেক ঘুমান অনেকের অভ্যাস। কেউ যদি অলসতাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে দিনের বেলা অনেকক্ষণ ঘুমান, রাতের বেলায় তাঁর ঘুম কম হবেই। এই সময়ের হিসেব অনেকে মিলিয়ে দেখেন না। ফলে ঘুমের অভাব হয়েছে বলে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান, এমনকি মানসিক কষ্টে ভোগেন। আগেই বলা হয়েছে মানসিক অশান্তি নিদ্রাহীনতার অন্যতম কারণ।

যদি কেউ নিদ্রাহীনতায় ভুগছেন বলে মনে করেন এবং পরামর্শ নিতে আসেন, তাহলে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আসল ঘটনা জেনে নেয়া অপরিহার্য। যেসব কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে আলোচনা করা হয়েছে তার একক্ বা একাধিক কারণ আছে কিনা জেনে নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে হিসেবের কোন গরমিল আছে কিনা দেখে নিতে হবে। ৬০/৭০ বৎসর বয়সে কেউ যদি চার পাঁচ ঘণ্টা ঘুমানর পরেও বলেন যে তাঁর ঘুম হয় না, সেটাকে ঘুমের ব্যাঘাত বলে ধরে না নিয়ে বরং তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে এই বয়সে এই পরিমাণ ঘুমই তাঁর জন্য যথেষ্ট। দিনে এবং রাতে সবটুকু মিলিয়ে যে পরিমাণ ঘুম হয় এই সবটুকুর হিসেব একত্র করতে হবে। রাতের বেলার ঘুমই শুধু ঘুম নয়, বরং দিনের বেলার ঘুমও যে একই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

এ-পর্যন্ত ঘুমের ওষুধ সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয়নি। না বলাই হয়ত ভাল। তাহলে কথাটা অজানা থাকবে বলে বলতে হচ্ছে। ওষুধ খেয়ে ঘুম আসলে ঘুম নয়, একটা কৃত্রিমতা ; জোলাপ খেয়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার করার মতো। অভ্যাসে পরিণত

হলে দিনে-দিনে জোলাপের মাত্রা যেমন বাড়াতে হয় ঘুমের ওষুধের মাত্রাও তেমনি বাড়াতে হয়। তাছাড়া মনে রাখতে হবে ঘুমের কোন ওষুধ নিরাপদ নয়। এগুলো কাছে না রাখাই ভাল। নির্ভরশীলতার পরিণামও ভাল নয়।

অনিদ্রা বা স্বল্প নিদ্রার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো দূরীভূত করা সম্ভব। যদি বিভিন্ন রোগের একটা লক্ষণ হিসেবে এই উপসর্গ দেখা দেয় তবে তার প্রতিকার করতে হবে রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে। যেমন ধরুন পেটে ব্যথা, কাশি ইত্যাদির কারণে যদি ঘুম না হয় তবে এই সমস্ত রোগের প্রতিবিধান করতে হবে। নচেৎ শুধু অনিদ্রার দিকে নজর দিয়ে আসল কারণ নিরূপণ করে তা দূরীভূত না করলে ঘুমের ব্যাঘাত থেকেই যাবে। শারীরিক সুস্থতা সত্ত্বেও ঘুম না হলে কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এখানে কারণ দূরীভূত করা কঠিন কাজ নয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে অবশ্য একথা খাটে না। যেমন ধরুন, আপনি এমন একটা পরিবেশে পড়লেন যা থেকে আপনার রেহাই নেই, সেক্ষেত্রে আপনাকে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা → অনিদ্রা → দুশ্চিন্তা এই বিষচক্র থেকে রেহাই পেতে হলে প্রথম কয়েকদিন কিছু ওষুধ খেতে হয়। এতে দুশ্চিন্তা কমে, চক্র ভাঙে। আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, ঘুম আসে। মনে রাখতে হবে এ ওষুধ ব্যবহার শুধু স্বল্প সময়ের জন্য।

ওষুধ না খেয়ে কয়েকটা সহজ উপায়ে নিদ্রাহীনতার উপশম সম্ভব। যেমন বিকেল বেলায় খোলা জায়গায় হাঁটাহাঁটি, ব্যায়াম, শোবার সময় এক গ্লাস গরম পানি কিংবা ভালভাবে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় যাওয়া, হাতে কিছু-একটা নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়া, তছবী কিংবা মালা জপা, মৃদুস্বরে গান শোনা ইত্যাদি।

'যদি ঘুম না আসে' — এ ভাবনা ক্ষতিকর। অন্ততঃ কিছুটা আরামদায়ক বা অভ্যস্ত পরিবেশে খোলা মন নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেলে প্রকৃতির আসল নিয়মে ঘুম আসবেই। মনে রাখতে হবে অনিদ্রার মূল উৎস চিন্তাভাবনা, আর চিন্তাভাবনা অনিদ্রার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর।

হৃদ্‌রোগ : চিকিৎসকের দোষে

গ্রীক ভাষায় ইয়াট্রোস অর্থ চিকিৎসক। অতএব ইয়াট্রোজেনিক হার্ট ডিজিস মানে দাঁড়ায় চিকিৎসকসৃষ্ট হৃদ্‌রোগ বা চিকিৎসাঘটিত হৃদ্‌রোগ।

হৃদ্‌রোগের জানা কারণসমূহের মধ্যে চিকিৎসাঘটিত কারণ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত।

একজন চিকিৎসক কিভাবে একজন অহৃদ্‌রোগীকে হৃদ্‌রোগীতে পরিণত করার জন্য দায়ী হতে পারেন সেটাই এখানে আলোচনা করা হবে। আচরণ, কথাবার্তা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে একজন চিকিৎসক কোন সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে প্রাথমিক লক্ষণগুলো ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

শিক্ষিত রোগী এবং চিকিৎসকের ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসাঘটিত হৃদ্‌রোগের বেশ ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের সমস্যা আরও অনেক প্রকট। আমাদের দেশে শতকরা মাত্র ২২ জন লোক সাক্ষর এবং সোয়া এগার কোটি দেশবাসীর মধ্যে ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ষোল হাজার। পল্লী এলাকায় শতকরা ৮৫ জন লোকের বাস, অথচ মোট ডাক্তারের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি বাস করেন শহর ও নগরে। চিকিৎসক এবং জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক সংখ্যানুপাত এবং শিক্ষার মানের অসামঞ্জস্য থেকে আমরা নিচের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারি।

১. আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত।
২. চিকিৎসক এবং জনসংখ্যার অনুপাত মোটেও উৎসাহজনক নয়।
৩. কম সুযোগ পাওয়া লোকেরা যথেষ্ট পরিমাণে চিকিৎসা-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

এই পরিস্থিতিতে দেশের অধিকাংশ মানুষই অসুখ-বিসুখে উপদেশ নেয়ার জন্য অশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এই হাতুড়েদের সংখ্যা শহর বা নগরেও খুব একটা কম নয়।

গ্রামের সহজ-সরল মানুষের কাছে এরা ডাক্তার হিসেবেই পরিচিত। তাঁরা সরল বিশ্বাসে এদের সাহায্য কামনা করেন এবং তারা যা বলে তাই বিশ্বাস করেন। অথচ এরা মনে করে পেটে কিছু হলেই তা 'গ্যাস্ট্রিক'। বুকে কিছু হলেই তা হৃদ্‌রোগ এবং অস্থিসংযোগে (Joint) ব্যথা বাত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

চিকিৎসা শিক্ষার কোন রকম সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া সত্ত্বেও যারা এভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছে, তাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে (যেখানে শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত এবং কখনও বা একেবারেই শূন্য) নামমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করে এদের কেউ-কেউ আবার আত্মসন্তুষ্টির জন্য নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটি বসিয়ে দিয়ে দিব্যি চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরল বিশ্বাসে এবং নিরাময়ের আশা নিয়ে বুকের ব্যথায় অস্বস্তি বোধ করছে এমন কোন রোগীকে যদি আপনি এদের কাছে নিয়ে যান, তবে দেখবেন কিছু শোনার পর এবং দ্রুত পরীক্ষা করে রোগীর 'হার্ট খুব উইক' বা 'হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ' ইত্যাদি বলে হৃদ্‌রোগীদের জন্য ব্যবহৃত ও প্রচলিত ওষুধগুলো ব্যবস্থাপত্রে লিখে দিয়েছে। তাতে অসহায় রোগীর ভোগান্তি বাড়তে থাকে। হৃদ্‌রোগী হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করে এবং ভুল নির্দেশমতো ওষুধ সেবন করে চরম বিপদের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর থাকে না।

এমন রোগ হলে রোগী বেশিদিন বাঁচেন না — চিকিৎসকের কথা থেকে এ ধরনের একটা ধারণা রোগীর মনে গেঁথে যায়।

পরবর্তী সময়ে শিক্ষিত কোন ডাক্তারের সাথে যদি পরামর্শ করার সুযোগ ঘটে (যা সচরাচর ঘটে না) তবে তিনি অনুসন্ধান করে রোগের আসল কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হলেও হতে পারেন। রোগের কারণ যদি দেখিয়ে দেয়ার মতো বা চিকিৎসাযোগ্য হয়, তবে রোগীকে তাঁর ধারণা সংশোধন এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য একমত করা যেতে পারে। কিন্তু রোগের কারণ যদি সহজে নির্ণয় করার মতো না হয় তাহলে সমস্যাটি আর সহজ থাকে না। এক্ষেত্রে চিকিৎসক পরামর্শদাতার জ্ঞান, বিবেচনা এবং কার্যকলাপ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। 'হার্টের রোগও হতে পারে' বা 'হার্টটা তো দুর্বলই মনে হয়' — চিকিৎসকের এ ধরনের অসাবধান মন্তব্য রোগীর ভুল ধারণাকে আরও বেশি পোক্ত করে। হৃদ্‌রোগকেই রোগী তাঁর একমাত্র রোগ হিসেবে মনে করে বসে থাকেন।

অশিক্ষিত এবং অদক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা দেশের মানুষের যে ক্ষতি হচ্ছে সে সম্পর্কে এত কথা বলার পরেও শিক্ষিত চিকিৎসকদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে কিছু না বলে পারছি না।

চিকিৎসাঘটিত হৃদ্‌রোগের একটা পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এখানে চিকিৎসকরা তাঁদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে যেসব সাধারণ রোগের সম্মুখীন হন তার দু'একটি সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিম্ন রক্তচাপ (Low blood pressure)

সহজে অবসাদগ্রস্ততা অনেক রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ হলেও মানসিক দুর্বলতা এ ধরনের অবসাদগ্রস্ততার অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ কারণ হিসেবে সাধারণভাবে নিম্ন রক্তচাপকেই দায়ী বলে মনে করা হয়। এই অবস্থায় একজন চিকিৎসক যদি রোগীর রক্তচাপ মেপে দেখেন যে স্বাভাবিক স্তরের নিচের দিকে তাঁর রক্তচাপ রয়েছে এবং তাঁকে যদি বলে বসেন, 'আপনি নিম্ন রক্তচাপে ভুগছেন' তাহলে তাঁর মনে সেটিই স্থায়ীভাবে থেকে যাবে এবং এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওষুধ ও উপদেশ চাইবেন। পরিণতিতে তিনি লাভ করবেন ভিটামিন বা টনিক গ্রহণের উপদেশসম্বলিত এক ব্যবস্থাপত্র, ভাল খাবার খেতেও তাঁকে বলা হবে। এই আক্রার দিনে তিনি খামোখা ভিটামিন এবং ভাল দামী খাবারের পিছনে পয়সা খরচ করবেন অথচ অবসাদ ও অবসন্নতা দূর হবে না। অপরদিকে রোগীর ওজন বাড়বে, স্ফীত হবে তাঁর শরীর, মেদবহুল হয়ে ক্রমশঃ তিনি একটা অথর্ব মানুষে পরিণত হবেন।

এমন কিছু দৈহিক রোগ আছে যার কারণে নিম্ন রক্তচাপ হয়। সেইজন্য রোগীর শরীরে নিম্ন রক্তচাপ দেখা দিলে তার কারণগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। চিকিৎসক যদি কারণ বাদ দিয়ে নিম্ন রক্তচাপের প্রতি মনোযোগী হন তাহলে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়াই হবে, ফল পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ এডিসন'স ডিজিজের কথা বলা যায়। বৃক্কের (কিডনীর) উপরে অবস্থিত সুপ্রারেনাল গ্রন্থি এড্রিনোকরটিকেল হরমোন উৎপাদনে ব্যর্থ হলে যে শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয় তাকে এডিসন'স ডিজিস বলে। এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তার মধ্যে নিম্ন রক্তচাপ অন্যতম। এখন যদি

কেউ ভাল–ভাল খাবার, নানা ধরনের টনিক ইত্যাদি দিয়ে রোগীর রক্তচাপের চিকিৎসা শুরু করেন, তাহলে রোগের আসল কারণটি অনুদ্ঘাটিত থেকে যাবে এবং কোন উন্নতির লক্ষণই দেখা যাবে না।

এটা নিশ্চিত করে বলা চলে যে, শারীরিক নিম্ন রক্তচাপ অনেকের জন্ম থেকেই থাকতে পারে। এ ধরনের নিম্ন রক্তচাপ কোন রোগের কারণ নয় এবং এগুলোর কোন চিকিৎসারও প্রয়োজন নেই। বরং যাঁদের রক্তচাপ নিম্ন, বলতে হবে তাঁরা ভাগ্যবান, কারণ তাঁদের রক্তচাপের ঝুঁকি নেই। নিম্ন রক্তচাপ কোন কোন সময় কোন একটি মূল রোগের অংশবিশেষ এবং এক্ষেত্রে এই মূল রোগগুলোর চিকিৎসা করা উচিত। ফলাফল নয় কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখাটাই মূল কথা।

উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure)

ভুল রোগ নির্ণয়ের তালিকায় এটি আরেকটি সাধারণ ভুল। কোন রোগীকে রক্তচাপ পরিমাপক দিয়ে একবার মেপেই চূড়ান্তভাবে বলা উচিত নয় যে রোগী উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। এমন সিদ্ধান্তে আসার আগে রোগীর বয়সের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাঁদের বয়স ৪০ বছরের কম তাঁদের ক্ষেত্রে গড়ে রক্তচাপের পরিমাণ ৯০ মিলিমিটার এবং ৫০ বছরের বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১০০ মিলিমিটার পারদ–চাপ হয়ে থাকে। এটা ডায়াসটোলিক বা নিচের রক্তচাপের মাত্রা। উপরের রক্তচাপ (সিস্টলিক) মোটামুটিভাবে মধ্যবয়স পর্যন্ত ১৫০ মিলিমিটার ধরা হয়। চিকিৎসকরা উচ্চ রক্তচাপের সন্ধান করতে গিয়ে বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায়ই বয়সের কথা ভুলে যান। এর ফলে রোগীর মানসিক চিন্তা বেড়ে যায়। মূত্রবর্ধক রক্তচাপ কমিয়ে আনার বিভিন্ন ওষুধ গ্রহণ করতে করতে-শেষ পর্যন্ত স্ট্রোক বা পক্ষাঘাতের মতো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারেন।

আমি অনেক তরুণকে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে বলে সনাক্ত ও চিকিৎসা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে নানা রোগের লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখেছি। এমন তরুণদের উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে কয়েকদিন পর বা একই দিন দ্বিতীয়বার রক্তচাপ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক স্তরে চলে এসেছে। কারণ এই বয়সে উচ্চ রক্তচাপ এত সাময়িক এবং আবেগপ্রসূত ব্যাপার যে তা দূর করার জন্য রক্তচাপ কমানর ওষুধ খেতে হয় না।

এনজাইনা বা হৃৎপিণ্ডজনিত বুকে ব্যথা

উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপের মতো যে–কোন কারণে বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট হলেও অনেক সময় হৃদ্‌রোগ হয়েছে বলে মনে করা হয়। বুকের বাঁ দিকে কোন ব্যথা হলে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ধারণা করে বসেন হৃৎপিণ্ডে নিশ্চয়ই কোন বিঘ্ন ঘটেছে। চিকিৎসকের উচিত এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে ব্যথার সঠিক স্থান ও বৈশিষ্ট্য এবং হৃদ্‌রোগের সাথে জড়িত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সঠিকভাবে জেনে নেয়া।

দু'টি বিশেষ অবস্থা যেমন : সারভিকেল স্পনডিলোসিস এবং হায়াটাস হার্নিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরের এলাকায় ব্যথা করতে পারে। গ্রীবাদেশীয় মেরুদণ্ড (Cervical Spine) পরীক্ষা করলেই সঠিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এ–ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে হায়াটাস হার্নিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরিস্থ এলাকায় ব্যথার সৃষ্টি করে। বৈশিষ্ট্যগতভাবে এ–ব্যথা সম্পূর্ণ দৈহিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে (Postural) এবং ব্যথায় হাঁফ ধরে যাওয়ার (Exertion) সাথে এর সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই।

এই দুই অবস্থার উপর গুরুত্ব না দেয়ার জন্য এবং সব বুকের ব্যথাকে হৃৎপিণ্ডের ব্যথা বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতার দরুন হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি হয়।

এইসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা রক্তনালী প্রসারক হিসেবে যেসব ওষুধ ব্যবহার করেন তার দ্বারা (Coronary vasodilator) রোগীর কোন লাভ হয় না বরং হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার ধারণাই ধীরে ধীরে মনে গেঁথে যায়। এবং তাঁর মধ্যে দুশ্চিন্তাসহ নানা রোগের উপসর্গ দেখা যায়। ক্রমশঃ তিনি বুকের মধ্যে হাঁফধরা ব্যথা এবং বিশ্রামে কিছুটা শান্তি অনুভব করেন। ডাক্তারের তৎপরতা এবং সহকর্মী বন্ধুবান্ধবের সাথে আলাপ–আলোচনা থেকে রোগী শ্বাসকষ্টের সাথে হাঁফ ধরার (Exertion) সম্পর্ক আবিষ্কার করে বসেন এবং তাঁর মনে তা পাকাপাকিভাবে বসে যায়।

ই.সি.জি.

নানা ধরনের হৃদ্‌রোগ নির্ণয়ে ই.সি.জি. একটি সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি, কিন্তু আমি বলব একটি সর্বাধিক অপব্যবহৃত পদ্ধতি। হৃৎপিণ্ডের নানা অনিয়ম এবং হৃৎপিণ্ডপেশীর পচন (Myocardial infarction) নির্ণয়ের জন্য ই.সি.জি.

নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক পদ্ধতি। ই.সি.জি.তে পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে রোগের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন কিছু নয়। প্রত্যেক দায়িত্বশীল চিকিৎসকেরই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত।

এসব মূল্যবান রোগ নির্ণায়ক যন্ত্রপাতি উপকারী হলেও নানা ধরনের বিপদ ঘটিয়ে থাকে। কোন-কোন হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ সেকেলে এবং ভাঙাচোরা ই.সি.জি. মেশিন দিয়েই কাজ চালিয়ে থাকেন। ভেবে দেখা দরকার এ ধরনের ভাঙাচোরা ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা। ত্রুটিপূর্ণ কার্ডিওগ্রাম থেকে যেসব রিপোর্ট আমাদের কাছে আসে তাতে লেখা থাকে 'সম্ভবতঃ হৃৎপিণ্ডপেশীর রক্তাভাব (Myocardial ischaemia)' অথবা 'সম্ভবতঃ হৃৎপিণ্ডপেশীর পুরনো পচনজনিত অবস্থা (Probably old myocardial infarction)'। এই ভুলের মাশুল কে দেবে? এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, উচ্চপদে আসীন আমাদের অনেকে এসব ভাঙাচোরা ই.সি.জি. মেশিনের ত্রুটিপূর্ণ রেকর্ডিং ও রিডিং-এর শিকার হয়েছেন। এমনকি এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কার্ডিয়াক সাইকোসিস-এ ভুগছেন। এখন এসব ভাঙাচোরা মেশিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করার দিন এসেছে।

বর্তমানে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম মেশিন এবং তার ব্যাখ্যা সর্বজনীন ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অপব্যবহার, ভুল ব্যাখ্যা এবং ভ্রান্ত নির্দেশ সাধারণ চিকিৎসকদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং রোগীদেরই মাশুল দিতে হচ্ছে।

স্বাস্থ্যবান একহারা গড়নের তরুণের এস.টি.সেগমেন্টের (ST segment) উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধিকে হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণের প্রদাহ (Pericarditis) হিসেবে ব্যাখ্যা করার ঘটনা যে সচরাচর ঘটে না এমন নয়। স্বাভাবিক সীমার মধ্যে এস.টি. এবং টি.তরঙ্গের পরিবর্তনকে কখনও কখনও 'রক্তস্বল্পতাগত পরিবর্তন' বা 'সম্ভবতঃ হৃৎপেশীর রক্তাভাব' বলে চালিয়ে দিতে দেখা যায়।

উপসংহারে বলব চিকিৎসকের কথা, প্রেসক্রিপ্‌শন ও কার্যাবলীর প্রভাবে অনেক হৃদ্‌রোগ জন্ম নিতে পারে। একজন সুস্থলোক নিজেকে হৃদ্‌রোগী মনে করে প্রতিনিয়ত চিন্তামগ্ন থাকতে পারেন। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করতে পারেন। ওষুধের খরচায় আর ডাক্তারের ফিতে টাকা উজাড় করতে পারেন। হার্ট বা হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে প্রায় সকলে সজাগ। এ অঙ্গে কিছু হয়েছে শোনামাত্র সবাই আঁতকে উঠেন। চিকিৎসকের কিছু অসাবধানতা কিম্বা ত্রুটিপূর্ণ রোগনির্ণয় যেখানে এমন পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে সেখানে তাঁদের দায়িত্ব অপরিসীম।

এ তিন থেকে সাবধান

নানা কারণে হৃৎপিণ্ডের অসুখ এবং পক্ষাঘাত (Stroke) হয়ে থাকে। আবার কতগুলো কারণে এই ধরনের অসুখের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। যে-কয়টি কারণ এই প্রকোপ বৃদ্ধির মূলে সেগুলোকে এককভাবে 'বিপদজনক কারণ (Risk factor)' বলা যেতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল আধিক্য এবং ধূমপান — তিনটি প্রধান 'রিস্‌ক্‌ ফেক্টর' বা ঝুঁকির কারণ। এই তিনটির যে-কোন একটি থাকলে হৃদ্‌রোগ এবং 'স্ট্রোক'-এর মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে যদি দু'টো কারণ একসাথে থাকে, বিপদের মাত্রা বাড়ে চারগুণ। আর তিনটি থাকলে বিপদের মাত্রা হয় আটগুণ। এবার তিনটি মুখ্য ঝুঁকির কারণ আলাদাভাবে আলোচনা করা যাক।

উচ্চ রক্তচাপ

যে-সমস্ত কারণে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় কিংবা 'স্ট্রোক' হয়, তার মধ্যে 'উচ্চ রক্তচাপ' প্রথম এবং প্রধান। যদি 'স্ট্রোক' রোগীর কারণ নির্ণয় করা হয় তাহলে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা নব্বই জনেরই উচ্চ রক্তচাপ আছে। অনেকে হয়ত মনে করে থাকেন উচ্চ রক্তচাপ হলে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাবে ; আসলে কিন্তু তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কোন লক্ষণই থাকে না। জটিলতা না থাকলে ধরাও পড়ে না। সে-কারণে দেখা গেছে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ার পর উচ্চ রক্তচাপ প্রথমবারের মতো ধরা পড়েছে। এর আগে এ-বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি। ঢাকা সচিবালয়ের সমস্ত লোকের রক্তচাপ জরিপ করে দেখা গেছে শিক্ষিত হলেও এঁদের অনেকেই জানতেন না তাঁদের রক্তচাপ আছে। জানতেন না বলেই অবশ্য চিকিৎসা করা হয়নি। অন্যদিকে অনেকে জেনে-শুনেও যেহেতু লক্ষণাদি ছিল না অথবা সামান্যতম লক্ষণ ছিল, তাই চিকিৎসায় গাফিলতি করেছেন। হয়ত অনিয়মিতভাবে চিকিৎসা করেছেন, অথবা একেবারেই করেননি।

উভয় ক্ষেত্রেই রক্তচাপের যে প্রতিক্রিয়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হতে থাকে, তা হতেই থাকে। মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে, বৃক্কে (Kidney) এবং শরীরের বিভিন্ন ধমনীর কর্মকাণ্ডে জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে সীমিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে।

অনেকে মনে করতে পারেন উচ্চ রক্তচাপের কারণ বের করে তা নির্মূল করাই উত্তম। আসলে কিন্তু তা নয়। যদি একশ জন উচ্চ রক্তচাপের রোগীর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়, তাহলে দেখা যাবে মাত্র পাঁচ জনের প্রাথমিক কারণ জানা যায়। অর্থাৎ শতকরা পঁচানব্বই জনের কোন কারণ জানা যায় না। সেইজন্য এগুলোকে 'এসেন্‌সিয়াল হাইপারটেন্‌শন' (Essential Hypertension) নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, এই পাঁচজন রোগীর প্রাথমিক কারণ নির্ণয়ের জন্য উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশে অযথা ব্যয়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান আদৌ উচিত কিনা। শুধু প্রস্রাব পরীক্ষা করে বৃক্কজনিত কোন দোষ আছে কিনা সাধারণতঃ ধরা যায়, এবং জানা কারণগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম প্রধান। এছাড়া শারীরিক পরীক্ষা (physical examination) করে কিছু কারণ ধরা যেতে পারে। সূক্ষ্ম পরীক্ষা ব্যয়বহুল, অথচ তেমন কাজে লাগে না।

কোন একজন রোগীর রক্তচাপ ধরা পড়লেই ধরে নিতে হবে তাঁর চিকিৎসা নিতান্ত প্রয়োজন। এ চিকিৎসা দু'এক দিনের বা দু'এক মাসের জন্য নয় ; সবসময়ের জন্য। বর্তমানে রক্তচাপ চিকিৎসার যে ওষুধ পাওয়া যায় তাকে সমুচিতভাবে ব্যবহার করলে রক্তচাপও আয়ত্তে আনা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, রক্তচাপ যখন আয়ত্তে আনা হয়, শরীরের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও বন্ধ হয়। অন্যদিকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও চিকিৎসার ফলে সেগুলো আয়ত্তে আনা যায়, প্রশমিত হয়, এমনকি লোপ পেতেও পারে। উচ্চ রক্তচাপের কারণ জানা না থাকলেও কয়েকটি কারণে উচ্চ রক্তচাপের প্রভাব দেখা যায়। যেমন পরিবারে একজনের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে অন্যদের থাকার সম্ভাবনা থাকে। উচ্চ রক্তচাপ অনেক সময় পারিবারিক ব্যাধি হিসেবে দেখা যায়।

খাদ্যদ্রব্যে লবণের পরিমাণের সাথে উচ্চ রক্তচাপের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে খুলনা অঞ্চলের লোকদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ বেশি বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। জাপান এবং কোরিয়ার খাদ্যদ্রব্যে লবণের পরিমাণ বেশি, এছাড়া দক্ষিণ ইরানে যাঁরা বেশি মাত্রায় লবণ ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ বেশি দেখা গেছে। অন্যদিকে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা,

আফ্রিকা এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে লবণ খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয় বলে রক্তচাপের প্রকোপ এইসমস্ত দেশে অনেক কম।

কোলেস্টেরল

রক্তে এই চর্বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি হলে ধমনীর গায়ে এটা জমা হয়। ফলে ধমনীর অভ্যন্তরীণ ব্যাসের পরিমাণ এবং সম্প্রসারণ ক্ষমতা লোপ পায় এবং রক্তসঞ্চালন বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের চর্বিজাতীয় পদার্থ শরীরের রক্তে প্রবাহিত হয়। এদের অনেক নাম থাকলেও শিক্ষিত মহলের কাছে 'কোলেস্টেরল' (যা এদের মধ্যে প্রধান) মোটামুটিভাবে একটা পরিচিত নাম।

নানা প্রকারের হরমোন উৎপাদনে কোলেস্টেরল অপরিহার্য। কোলেস্টেরল শুধু খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে না, যকৃতেও এটা তৈরি হতে পারে। 'ট্রাইগ্লিসারাইড', 'ফসফোলিপিড' প্রভৃতি চর্বিজাতীয় পদার্থ কোলেস্টেরলের মতোই ক্ষতিসাধন করতে পারে। রক্তে এইসব চর্বিজাতীয় জিনিসকে দ্রবীভূত হওয়ার জন্য প্রোটিন বা আমিষের সাথে সংযুক্ত হতে হয়। এই সংযুক্তির ফলে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তার নাম 'লাইপোপ্রোটিন'। নানা প্রকার লাইপোপ্রোটিন রক্তে পাওয়া যায়। এগুলোকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন অল্প ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (LDL — এতে প্রধানতঃ কোলেস্টেরল রয়েছে) এবং উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (HDL)।

কোলেস্টেরলসমৃদ্ধ এই অল্প ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের আধিক্য ধমনীর গায়ে দ্রুত মাত্রায় তৈলাক্ত পদার্থ জমতে সাহায্য করে। কাজেই যাঁদের শরীরে এর পরিমাণ বেশি তাঁদের হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি, এমনকি তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সেও। উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের বেলায় ঘটে এর উল্টোটা। এটা বরং ধমনীর গায়ে চর্বি জমার প্রতিবন্ধক এবং এটা শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

শরীরে কোলেস্টেরলের আধিক্য প্রধানতঃ দু'টো কারণে হয়ে থাকে। একটা বংশগত ; অপরটা জন্মের পর বিভিন্ন বিপাকজনিত রোগের কারণে। এ-সমস্ত রোগের মধ্যে রয়েছে বহুমূত্র, থাইরয়েড হরমোনের স্বল্পতা, নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইত্যাদি। পরিশ্রমবিমুখ, মেদবহুল ব্যক্তি, মদ্যপায়ী, অতিমাত্রায় চর্বিজাতীয়

খাদ্যগ্রহণকারীদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে। পক্ষান্তরে যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করেন, পরিমিত খাবার গ্রহণ করেন এবং উক্ত বিপাকজনিত রোগে আক্রান্ত নন, তাঁদের শরীরে উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। তাই যাঁদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি তাঁদের সাবধান হতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে চিকিৎসা করাতে হবে।

চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে কোন বিপাকজনিত রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করা, মাত্রাতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য বর্জন ও শারীরিক পরিশ্রম করা। কোলেস্টেরল কমানর জন্য বিভিন্ন সময় নানা ওষুধের উপকারিতা দাবি করা হলেও এ-পর্যন্ত এমন কোন ওষুধ নেই বললেই চলে। কোলেস্টেরল কম পরিমাণে আছে এ রকম খাবার গ্রহণ করাই উত্তম এবং এটাই কোলেস্টেরল কমানর মহৌষধ। সম্পৃক্ত চর্বি **(Saturated fat)** শরীরে কোরেস্টেরল বৃদ্ধির সহায়ক। তাই সম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ খাবারের পরিবর্তে অসম্পৃক্ত চর্বি **(Poly unsaturated fat)** গ্রহণ করা কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রাধান্য পেলেও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটা অধিক পরিমাণে ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। অসম্পৃক্ত চর্বি শস্যজাতীয় উপাদান যেমন সয়াবিন, তুলা বীজ, সূর্যমুখী বীজ, ভুট্টা প্রভৃতি থেকে পাওয়া যায়। আর সম্পৃক্ত চর্বি পাওয়া যায় প্রধানতঃ প্রাণিজ খাবার থেকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যে-সব খাবার মাত্রার বেশি গ্রহণ করা উচিত নয় সেগুলো হচ্ছে চর্বিযুক্ত মাংস, ডিমের কুসুম, মাখন, পনির, ঘি, পূর্ণমাত্রার দুধ **(Full cream milk),** ডালডা এবং এই সকল উপাদানে তৈরি খাবার।

ধূমপান

ধূমপানের কয়েক দিক অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের উপর এর বিশেষ প্রভাব এখানে বলা প্রয়োজন। কারণ আগেই বলা হয়েছে তিনটি প্রধান 'রিস্‌ক্ ফেক্টর'-এর মধ্যে এটা অন্যতম।

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অধূমপায়ীদের তুলনায় তিনগুণ। একবার আক্রান্ত হওয়ার পরও কেউ যদি ধূমপান থেকে বিরত না হন, তাঁর দ্বিতীয়বার হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এর আগে কোলেস্টেরল-এর মাধ্যমে ধমনীতে যে পরিবর্তনের কথা বলা

হয়েছে ধূমপানের ফলে তা বহুলাংশে বেড়ে যায়। কেউ-কেউ ফিল্টারযুক্ত দামী বিদেশী সিগারেট পান করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, এবং মনে করেন এতে বিপদ কম। এটা ভুল ধারণা। এর পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।

একটা সিগারেটের ধোঁয়া শত শত বিষাক্ত পদার্থের সংমিশ্রণ। যেমন নিকোটিন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এমোনিয়া, সায়ানাইড, নাইট্রো-বেন্জিন, ফিনল ইত্যাদি ইত্যাদি। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছে যে ধূমপায়ী ৪৫ থেকে ৫৫ বৎসরের মহিলাদের হৃৎপিণ্ডের পীড়া এবং স্ট্রোক তাঁদের সমবয়সী অধূমপায়ীদের তুলনায় দ্বিগুণ। কেউ যদি ধূমপায়ী হন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করেন, তাহলে তাঁদের হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় দশগুণ বেড়ে যায়। ত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্ক মহিলাদের বেলায় আমাদের দেশে এই ধূমপান যে কত বিপদজনক তা সহজেই অনুমান করা যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকা এদেশে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। তার উপর যদি কার ঘাড়ে ধূমপানের বদভ্যাস চাপে, তাহলে বিপদের আর সীমা থাকে না।

অনেকে মনে করে থাকেন আমাদের দেশে ধূমপান মেয়েদের মধ্যে তেমন প্রচলিত নয়। গ্রামের মেয়েদের বেলায় এটা খাটে না। এদিকে শহরে অনেক আধুনিকার হাতে সিগারেট শোভা পায়।

একটুখানি হিসেব করলেই দেখা যাবে ধূমপানের বদভ্যাস বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে ছোটবেলা থেকেই শুরু হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুসরণের মাধ্যমে ধূমপানের হাতেখড়ি হয়। গ্রামীণ কর্মজীবী মহিলা ও পুরুষ অপুষ্ট শরীরে হাড়ভাঙা খাটুনিতে অল্পে পরিশ্রান্ত হয়ে যান। আর এই ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে ধূমপানকে একমাত্র সম্বল হিসেবে বেছে নেন। ফলে ক্ষতি হয় নিজের এবং তাঁদের সান্নিধ্যে আসা আর সকলের — যদিও তাঁরা অধূমপায়ী।

বাংলাদেশে জন্মানর পর একটি শিশুর গড় আয়ু ৫৭ বৎসর। এদেশে এখনও অধিকাংশ শিশু ধূমপানের বয়স হবার আগেই মারা যায়। বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের কারণেই অনেক শিশু প্রাণ হারায় বলে এক স্বাস্থ্য রিপোর্টে জানা গেছে। হৃদ্‌রোগ ছাড়াও ফুসফুস, মুখগহ্বর ও কণ্ঠনালীর ক্যান্সার, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা, বার্জার্স ডিজিজ (যাতে প্রধানতঃ পায়ে রক্তসঞ্চালন কমে গিয়ে পচন ধরতে পারে), নবজাতকের ওজন-স্বল্পতা প্রভৃতি রোগের একটি মৌলিক কারণ ধূমপান।

অপুষ্টি এবং সংক্রামক রোগে এদেশে এখনও প্রচুর মৃত্যু ঘটে বলে হৃদ্‌রোগের হার এদেশে তুলনামূলকভাবে কম। তবে ঐসমস্ত রোগ প্রতিহত করার সঙ্গে–সঙ্গে ধূমপান প্রতিহত করতে না পারলে হৃদ্‌রোগ এদেশে ভয়াবহ রূপ নেবে, যা বর্তমানে সভ্য দেশগুলোতে মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে পরিগণিত। এরই প্রতিধ্বনি করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, 'শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক যে অস্ত্রটি মানুষ আবিষ্কার করেছে — তা হচ্ছে ধূমপান।'

যে দু'টো ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব

ক্রেব বা কাঁকড়া থেকে ক্যান্সার শব্দের উৎপত্তি। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাধি। কাঁকড়ার পা যেমন তার শরীর থেকে চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করে, ক্যান্সার রোগও আবির্ভাব-স্থল থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে একে কাঁকড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। শুধু তা নয়, শরীরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাসরিভাবে এবং রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। অতএব, এ রোগের ভয়াবহতা সহজেই অনুমান করা যায়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এ রোগের চিকিৎসা এখনও আমাদের আওতার বাইরে। বিশেষভাবে যে দু'টো ক্যান্সার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব, সেগুলো একেবারে যদি শুরুতেই ধরা না পড়ে তা হলে নিরাময় সম্ভব হয়ে উঠে না। বিশ্ব জুড়ে যে দু'টো ক্যান্সারের বিস্তৃতি এখন স্বীকৃত তার একটি ফুসফুসের, অন্যটি লিভার বা যকৃতের। তবে ফুসফুস এবং লিভার ক্যান্সারের কারণ এখন আর অজানা নয়। মূলতঃ এদের একটি হয় ধূমপানে, অন্যটি ভাইরাসজনিত কারণে।

ধূমপানের সাথে ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথম তথ্য প্রকাশিত হয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে। এ তথ্য বিভিন্ন সময়ে শুধু সমালোচিত হয়নি, অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে, এ তথ্য কল্পনাপ্রসূত, আবার কখনও বলা হয়েছে এটা হিসেবের হেরফের। বিজ্ঞানীরা এতে নিরুৎসাহিত না হয়ে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে দেশ-বিদেশে গবেষণা চালিয়ে যান। আজকের দুনিয়ায় ধূমপানজনিত ক্যান্সার একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এককালে ধূমপানজনিত ক্যান্সার শুধু ফুসফুসে সীমাবদ্ধ থাকে বলে ধারণা করা হত। এখন আমরা জানি, শুধু ফুসফুস নয়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও এ ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। যেমন মুখগহ্বর থেকে শুরু করে মূত্রাশয়ে পর্যন্ত ধূমপানের ফলে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন ধূমপানের সময় সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে বলে সেখানে ক্যান্সার হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কি করে এ ক্যান্সার শরীরের অন্যান্য

স্থানে হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও আসলে কিন্তু সহজ। ধূমপানের বিষাক্ত পদার্থ রক্তে সঞ্চালিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সে কারণে হৃৎপিণ্ডে এবং শিরা-উপশিরায় নানা ধরনের বিষক্রিয়া দেখা দেয়। যেহেতু ক্যান্সার আমাদের আলোচ্য বিষয়, তাই ধূমপানের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখানে সমীচীন নয়।

বাংলাদেশে ধূমপানজনিত ক্যান্সারে কত লোক প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করেন তার হিসেব দেয়া সম্ভব নয়। চিকিৎসক এবং অনেক সমাজকর্মী তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে স্বীকার করবেন যে ফুসফুসের ক্যান্সার দিন দিন বেড়ে চলেছে। নিকটবর্তী দেশ ভারত থেকে শুরু করে পূর্ব-পশ্চিম যে দিকেই যাই না কেন, ধূমপানজনিত ক্যান্সারের প্রভাব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জরিপ করা হয়েছে। কোন একটা দেশ যেমন আমেরিকার কথাই ধরা যাক। ১৯৫০ সালে আমেরিকায় ফুসফুসের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর হার ছিল ১৮,৩১৩। ১৯৭৭ সালে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় ৯০,৮২৮-এ। আমেরিকান ক্যান্সার সমিতি ১৯৮২ সালের হিসেবে উল্লেখ করেন ১,১১,০০০ লোক ফুসফুসের ক্যান্সারজনিত রোগে মারা যান।

ধূমপান নিঃসন্দেহে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। কোন কোন হিসেবে দেখা যায় শতকরা ৮০ ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য ধূমপানই দায়ী। যাঁরা দৈনিক ২০-৪০টা সিগারেট খান, ফুসফুসের ক্যান্সারে তাঁদের মৃত্যুর সম্ভাবনা অধূমপায়ীদের তুলনায় ২০-২৫ গুণ বেশি।

পশ্চিমা দেশগুলোতে মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রকোপ বেড়ে যাবার ফলে ফুসফুসের ক্যান্সারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এককালে এসব দেশে স্তন ক্যান্সারের প্রকোপ ছিল বেশি। ১৯৮০ সালে মেয়েদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার স্তনের ক্যান্সারকে হার মানিয়েছে। এটা ধূমপানেরই পরিণাম। অন্যদিকে বৃটেনের চিকিৎসকদের দিকে নজর দেয়া যাক। বিগত দশকে বৃটেনের চিকিৎসকসমাজ বহুল পরিমাণে ধূমপানের বদভ্যাস পরিহার করেন। ফলে তাঁদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রকোপও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

পরিবেশের উপর ধূমপানের কুফল কিছুদিন আগে পর্যন্ত সামান্য কিছু শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন চোখ জ্বলা, নাক এবং গলায় কিছু কিছু অস্বস্তিভাব। অথচ এগুলোর জন্য ধূমপায়ীরা কোন সময় নিজেদের অপরাধী মনে করতেন না। কারণ ধূমপান পরিবেশকে দূষিত করে, এটা ছিল তাঁদের ধারণার বাইরে।

সম্প্রতি ঐচ্ছিক বা প্রত্যক্ষ ধূমপায়ী এবং অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। যাঁরা ধূমপান করেন না অথচ ধূমপানের দূষিত পরিবেশে থাকেন, তাঁদেরকে অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী বলা হয়। অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী কতটুকু বিপদগ্রস্ত হবেন তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। যেমন আবাসিক পরিবেশেও ধূমপানের কুফল পরিলক্ষিত হয়। ধূমপায়ী মাতা-পিতার শিশুদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত নানা রোগের প্রকোপ জন্মের প্রথম বছরে অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়।

গর্ভাবস্থায় ধূমপান জরায়ুর পরিবেশ দূষিত করে। ফলে নবজাতকের ওজন তুলনামূলকভাবে কম হয়। এমনকি জন্মের কিছুদিনের মধ্যে এসব শিশুর মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। আমাদের সমাজে ধূমপায়ীদের সংখ্যা নগণ্য নয় এবং স্বল্প-পরিসর স্থানে অনেক লোক বসবাস করেন। ফলে পরিবেশজনিত ধূমপানের বিপদ তুলনামূলকভাবে বেশি।

যে ধূমপান এমন একটা মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে তা নিঃসন্দেহে বিষপানের শামিল। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এর থেকে নিষ্কৃতির উপায় কি? এ মহা বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় এ বদভ্যাস ত্যাগ করা। এর সুফল প্রমাণিত। একটু আগেই বৃটেনের চিকিৎসকসমাজের উপর ধূমপানের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানা গেছে, ধূমপান বন্ধ করার পর ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা সময়ের ব্যবধানে কমতে কমতে দশ-বার বছর নাগাদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ধরনের ক্যান্সার এককালে আমাদের দেশে প্রায় অজানা ছিল। কারণ হয়ত একে সত্যিকারভাবে আমরা তখন সনাক্ত করতে পারিনি। তাছাড়া এ রোগের প্রাদুর্ভাব তখন হয়ত অনেকটা সীমিত ছিল। যে কারণেই হোক না কেন, আমরা জানি, লিভার বা যকৃতের ক্যান্সার এখন একটা দুর্লভ ব্যাধি নয়।

ভাইরাসজনিত লিভারের অসুস্থতা এখন আমরা পূর্বের তুলনায় অনেকটা সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারি। যেসব ভাইরাসে লিভারের প্রদাহজনিত পাণ্ডুরোগ দেখা দেয়, সেগুলোকে ভাগ করা যায় নিম্নরূপে :

ভাইরাস-এ,

ভাইরাস-বি,

ভাইরাস নন্-এ-নন্-বি (অর্থাৎ ভাইরাস-এ নয় কিংবা বি নয়, অথচ অজানা ভাইরাস),

ডেলটা ভাইরাস।

সাম্প্রতিককালে নন্-এ-নন্-বি ভাইরাস পরিবারের একটি নতুন সদস্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম হেপাটাইটিস সি ভাইরাস। এর বিস্তার, সংক্রমণের ফলে পরিণতি মোটামুটিভাবে বি ভাইরাসের মতোই। যকৃতের দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহের অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস অন্যতম। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকরী টিকা থাকলেও সি ভাইরাসের জন্য এখনও তা আবিষ্কৃত হয়নি।

হেপাটাইটিস সি ছাড়া হেপাটাইটিস ই ভাইরাসও অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের মতো ই ভাইরাস দূষিত পানি এবং খাবারের সঙ্গে রোগবিস্তার করে। তবে সুখের বিষয় হেপাটাইটিস এ ও ই ভাইরাসের কারণে যকৃতের দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহের নজির এখনও পাওয়া যায়নি।

নানাভাবে এসব ভাইরাসজনিত ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে ভাইরাস-বি এবং নন্-এ-নন্-বি বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন ধরনের ইন্জেক্শনের মাধ্যমে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত লোককে ইন্জেকশন দেবার পর একই সিরিঞ্জে একজন সুস্থ লোককে ইন্জেক্শন দেয়া হলে তিনিও সংক্রামিত হতে পারেন। তাছাড়া রক্তদান, মুখে একই থার্মোমিটার ব্যবহার, থুথু, মায়ের দুধ এবং শরীরের নানা সিক্রেশনের মাধ্যমে ভাইরাস বিস্তৃতি লাভ করতে পারে।

অনেক পাণ্ডু বা জন্ডিস রোগীকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন কয়েকমাস আগে হয়তবা ইন্জেক্শন নিয়েছেন, রক্ত নেয়া হয়েছে, অপারেশন করা হয়েছে অথবা তাঁরা হাসপাতালে ছিলেন। এই সময়ে ভাইরাস তাঁদের শরীরে প্রবেশ করে। সংক্রমণের পর রোগের লক্ষণ দেখা দিতে যে সময়টুকু লাগে তাকে বলা হয় ইনক্যুবেশন পিরিয়ড। আর ভাইরাস-বি হেপাটাইটিসের ইনক্যুবেশন পিরিয়ড ছ'সপ্তাহ থেকে ছ'মাস হতে পারে। সে সময়ে জন্ডিস দেখা দেয়। আবার রক্ত দেয়া-নেয়া, ইন্জেক্শন এসব কথা হয়ত তাঁর মনেও থাকবে না। অথচ এসব কারণ থেকেই এ রোগের উৎপত্তি।

ভাইরাস-বি থেকে লিভারের ক্রনিক প্রদাহ, ক্রনিক প্রদাহ থেকে সিরোসিস এবং সিরোসিসের উপর ক্যান্সার আস্তে আস্তে উৎপত্তি লাভ করে। তাহলে বুঝা গেল, ভাইরাস-বি হেপাটাইটিস ক্যান্সারের যে অন্যতম প্রধান কারণ তা আমাদের অভ্যাস, অজ্ঞতা বা গাফিলতির কারণে হয়ে থাকে।

গর্ভবতী মায়ের ভাইরাস-বি হেপাটাইটিস থাকলে নবজাত শিশুদের শতকরা

৯০ জনের এতে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা থাকে। লিভার ক্যান্সার বিভিন্ন কারণে হলেও ভাইরাস-বি জনিত হেপাটাইটিস নিঃসন্দেহে প্রধান। এই ভাইরাস-বি সংক্রমণ প্রতিরোধ যদি সম্ভব হয় তাহলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আগেই বলা হয়েছে নানা ধরনের ইন্‌জেক্‌শন, সিরিন্জ কিংবা রক্ত নেয়ার মাধ্যমে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। অতএব যে-কোন সামান্য কারণে সুই ফুটান থেকে শুরু করে অপারেশন পর্যন্ত এই রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। তাছাড়া যে ভাইরাস থেকে এই রোগের উৎপত্তি, তা অনেকের শরীরে সুস্থ অবস্থায় বাহক বা কেরিয়ার হিসেবে থাকতে পারে। এসব বাহকের রক্ত থেকে নানা উপায়ে এই ভাইরাস অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সুতরাং ইন্‌জেক্‌শন, রক্ত নেয়া কিংবা কোন কারণে শরীরে সুই ফুটান কোনটাই নিরাপদ নয়।

যদি জীবন রক্ষার জন্য রক্ত নেয়া বা রক্ত দেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ভাইরাস-বি রক্তে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। যে রক্তদানকারীর শরীরে এই ভাইরাস আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, সে ব্যক্তির রক্ত নেয়া যাবে না।

একই কারণে এসব লোকের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন থার্মোমিটার, সিরিন্জ ইত্যাদি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না।

সুখের বিষয়, এ বিশিষ্ট ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধক টিকা সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর নানা দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর উপকারিতা এখন প্রমাণিত। অন্যান্য টিকার তুলনায় এটা এখনও ব্যয়বহুল। নির্বিচারে এর ব্যবহার তাই সমীচীন নয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয়। যেমন মায়ের রক্তে এই ভাইরাস থাকলে নবজাত শিশুকে এই টিকা দেয়া উচিত। চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী হাসপাতালে বিভিন্ন জানা-অজানা রোগী থেকে এ রোগে সংক্রামিত হতে পারেন, তাঁদেরও এই টিকা নেয়া উচিত। যে পরিবারে লিভার ক্যান্সার বেশি ধরা পড়ে, সে পরিবারের সকলেরই এই টিকা নেয়া প্রয়োজন।

কি কি উপায়ে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস বিস্তৃতি লাভ করতে পারে, তা আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে। যেসব অভ্যাস বা প্রক্রিয়া এই রোগ বিস্তারে সহায়তা করে সেগুলো বর্জন কিংবা সেগুলো সম্বন্ধে উপরোক্ত সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। যেমন ধরুন ইন্‌জেক্‌শন যেখানে অপরিহার্য সেখানে ডিসপোজেবল সিরিন্জ ব্যবহার করা নিরাপদ। এই সিরিন্জে কাউকে ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে না। রোগীর আর্থিক অবস্থা

বিবেচনা করে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁকে নির্দেশ দিতে হবে আলাদা সিরিঞ্জ এবং ইন্‌জেক্‌শনের সুই কিনতে। এটা শুধু একই রোগীর জন্য ব্যবহৃত হবে এবং ইন্‌জেক্‌শনের পূর্বে কমপক্ষে আধঘণ্টা গরম পানিতে ফুটিয়ে নিতে হবে।

অহেতুক ইন্‌জেক্‌শন দেয়া একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, ইন্‌জেক্‌শনের উপকারিতা বেশি। সীমিত কয়েকটা ওষুধ ছাড়া রোগী যেখানে মুখে খেতে পারেন, সেখানে ইন্‌জেক্‌শন দেবার কোন যৌক্তিকতা নেই। অথচ অন্ধ বিশ্বাসে অনেকে মুখে না খেয়ে ইন্‌জেক্‌শন নিতে আগ্রহী। এ সমস্ত প্রবল ইচ্ছার সাথে কিছু সংখ্যক চিকিৎসকের নমনীয় ভাব সরলপ্রাণ রোগীকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। পরিণতি সম্বন্ধে তাঁদের ওয়াকেবহাল করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

ছত্রাকজনিত বিষাক্ত পদার্থ বিভিন্ন খাবারের সাথে শরীরে প্রবেশ করে লিভারের ক্ষতি করতে পারে। খাবার জিনিস এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ছত্রাক জন্মাতে না পারে। সাধারণতঃ ভিজা কিংবা স্যাঁতসেঁতে কিংবা স্তূপীকৃত ধান চাল ইত্যাদি খাবারের মধ্যে যে বিশেষ ছত্রাক আক্রমণ করে তার নির্গত বিষাক্ত পদার্থের নাম এফ্লাটক্সিন। এশিয়ায় এবং আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোতে এফ্লাটক্সিনজনিত যকৃতের পীড়া উন্নত দেশের তুলনায় বেশি। এ ধরনের রোগ থেকে লোকের সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সার হতে পারে। এ ধরনের খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে বিশেষ ছত্রাক সেখানে জন্মাতে না পারে।

এলকোহল বা মাদক দ্রব্য লিভার বা যকৃতের জন্য ক্ষতিকর। অবশ্য মদ পানের বদভ্যাস পশ্চিমা দেশের তুলনায় বাংলাদেশে কম। তবুও নানা নামের সুধা, সুরা এবং এ ধরনের বাজারজাত তথাকথিত টনিক আসলে মদ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বার্থান্বেষী বা ব্যবসায়ীদের জোরাল প্রচারণার মাধ্যমে অনেকে এগুলোতে আকৃষ্ট হন এবং শেষ পর্যন্ত এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে এর কুফল যে কতটা তা সহজেই অনুমান করা যায়। অধিকন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এগুলো কিছুতেই নিরাপদ নয়।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, লিভার ক্যান্সারের যে কয়টি কারণ আমাদের জানা আছে, মোটামুটিভাবে এর সব ক'টি প্রতিরোধ সম্ভব। যে দু'টো ক্যান্সার সম্বন্ধে আলোচনা করা হল, তার কোনটির সফল চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের জানা নেই। প্রতিরোধই একমাত্র প্রতিকার। এর কোন বিকল্প নেই।

ধূমপান : স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক দিক

মনে পড়ে ১৯৪৮–৫০ সালের কথা। তখন আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় পর্বের (ক্লিনিকেল) ছাত্র। তৃতীয় বর্ষ থেকে রোগীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। লিভার সিরোসিস আজকালকার মতো তখনও হাসপাতালের বিভিন্ন রোগীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করত। শীর্ণকায়, কিছুটা বিবর্ণ চেহারা, অস্বাভাবিকভাবে ফোলা পেট এবং অনেক ক্ষেত্রে ফোলা দু'টো পা এখনও চোখের সামনে ভেসে উঠে। এই ধরনের চেহারা নিয়ে লিভার সিরোসিস রোগী হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রায়ই ভিড় জমাত। আজও জমায়। ছাত্র হিসেবে আমাদের শেখান হত এই রোগের প্রধান কারণ পুষ্টিহীনতা। মদ্যপানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ক্রমে-ক্রমে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল — আমরা জানতে পারলাম ফ্রান্সে লিভার সিরোসিস অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। মদ্যপানের দিক দিয়ে এদেশ সবচেয়ে সেরা। আমেরিকায় মদ্যপান তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হলেও বৃটেনের ঊর্ধ্বে তার স্থান। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মদ্যপান কোন সময় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি। সিরোসিসের উপর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত অধিকাংশ চিকিৎসাবিজ্ঞানী পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিলেন। হয়তবা ব্যাক্তিগত অথবা সামাজিক কারণে সময়মতো সঠিক তথ্য ধরা পড়েনি। সে যা-ই হোক, অতিরিক্ত মদ্যপান লিভার সিরোসিসের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে আজ স্বীকৃত।

ধূমপানের গোড়ার কথা অনেকটা একই ধরনের। একদিকে ধূমপায়ী এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, অন্যদিকে সত্যনিষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী — এ-দু'য়ের টানা-হেঁচড়ায় প্রকৃত তথ্য অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৬২ সালে লন্ডনের রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস 'ধূমপান ও স্বাস্থ্য' সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। যতদূর মনে হয় ধূমপানের বিরুদ্ধে এটাই পরিকল্পিত এবং শক্তিশালী প্রথম পদক্ষেপ।

আজকালকার দিনে ধূমপান এবং স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের জানা আছে। আমরা জানি, শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যেটা ধূমপানের কুফল থেকে রেহাই পেতে পারে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ থেকে পায়ে গ্যাংগ্রিন পর্যন্ত যে-কোন কিছু ধূমপানের কুফল হিসেবে দেখা দিতে পারে। ধূমপান ক্রনিক ব্রংকাইটিস এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে পেটের আলসার একটা সাধারণ ব্যাধি। এই ধরনের রোগীর সংখ্যা অনেক। ধূমপায়ী আলসার রোগী সময়মতো চিকিৎসার সুফল লাভ করতে পারেন না। তাঁদের আলসার নিরাময় হতে অনেক বেশি সময় লাগে। ধূমপানজনিত বিষক্রিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এর ফলে মূত্রাশয়ের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ধূমপান করলে নবজাত শিশু শীর্ণকায় হয় এবং প্রথম কয়েক মাসে বিভিন্ন ধরনের শ্বাসরোগের প্রবণতা থাকে। এইসমস্ত শিশুর মৃত্যুর হার অনেক বেশি।

ধূমপানের কুফল প্রমাণিত হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে এখন আর যেখানে সেখানে নির্বিবাদে ধূমপান করা যায় না। সিনেমা হল, লাইব্রেরী, কন্‌ফারেন্স রুম এবং অন্যান্য মিলনায়তনে ধূমপান এখন নিষিদ্ধ। যানবাহনে ধূমপায়ীদের জন্য নির্ধারিত স্থান থাকে। এমনকি, সিগারেটের প্যাকেটে সাবধানবাণী লেখা থাকে, যেমন, 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'। অথচ এসব দেশ থেকে তৃতীয় বিশ্বে যে-সমস্ত সিগারেট রফতানি করা হয় তাতে সে সাবধানবাণী লেখা থাকে না। শুনেছিলাম, বাংলাদেশে দামী সিগারেট আমদানি নিষিদ্ধ। বিত্তবান এবং প্রভাবশালী ধূমপায়ীদের 'আভিজাত্যের' নিদর্শনস্বরূপ এইসব সিগারেটের প্যাকেট যেভাবে হাতে দেখা যায় তাতে মনে হয় না এগুলো নিষিদ্ধ।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, 'বাংলাদেশ তামাকবিরোধী আন্দোলন' ধূমপানের উপর এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এতে অংশ নিয়েছিলেন অন্যদের মধ্যে এডিনবরা রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানসের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট স্যার জন ক্রফটন এবং লেডী ক্রফটন। তাঁদের উভয়ের তথ্যপূর্ণ বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটি বিষয় সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁরা বলেন, বিদেশে রফতানিকৃত সিগারেটের মধ্যে নিকোটিনের পরিমাণ তাঁদের নিজেদের দেশে ব্যবহৃত সিগারেটের চেয়ে বেশি। এছাড়া তাঁদের দেশে ধূমপান কমতির সাথে সাথে রফতানির পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে অনেক বেড়ে গেছে। ধরে নিতে হবে তৃতীয় বিশ্ব সময়োচিত পদক্ষেপ না নিলে

ক্রমে-ক্রমে অধিক হারে উন্নত দেশসমূহের সিগারেট ব্যবসায়ীদের শিকারে পরিণত হবে। এছাড়া স্বদেশের ব্যবসায়ীরা তো আছেই। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তামাক ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ দেখতে পাই। দাবি করা হয় অনেক সুযোগ-সুবিধার — যাতে করে তামাক শিল্প আরও প্রসার লাভ করতে পারে।

জনবহুল বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে তামাক শিল্প যদি বিলুপ্ত হয় বেকারত্বের সংখ্যা কি বাড়বে না? এই সমস্ত শিল্পে নিয়োজিতদের ভবিষ্যৎ কি হবে? এখন দেখা যাক, তামাক শিল্প উৎপাদনমুখী নাকি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর। এ বিষয়ে যে কয়টি তথ্য আমাদের জানা আছে মোটামুটিভাবে তা হল — (১) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্বাসকষ্টজনিত কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ ধূমপান। (২) ধূমপান হৃদ্‌রোগের অন্যতম কারণ। (৩) ধূমপান বিভিন্ন শিল্পকারখানায় অন্যতম অগ্নিকাণ্ডের কারণ। যেমন ১৯৭৪ সালে বিলেতে বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় অগ্নিকাণ্ডের শতকরা ২০ ভাগ কারণ ধূমপানজনিত। (৪) বিভিন্ন শিল্পে কর্মদিন (**Working days**) নষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগ।

যুক্তরাজ্যে ১৯৮০ সালে ৩৫৮,০০০,০০০ কর্মদিন (**Working days**) বিভিন্ন রোগের জন্য নষ্ট হয়। তার মধ্যে ৫০,০০০,০০০ দিন নষ্ট হয় ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর ধূমপানজনিত রোগে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসের ফলে ক্ষতির পরিমাণ ১২-১৮ মিলিয়ন ডলার।

হিসেব করে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যে তামাক শিল্পে যত লোক নিয়োজিত আছে তার দ্বিগুণ লোক মারা যায় প্রতি বছর ধূমপানজনিত রোগে।

বিভিন্ন বিষয়ে নানা কারণে আমাদের দেশের সঠিক তথ্য বের করা মুশকিল। তবে কয়েকটি বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা প্রায় নির্ভুল অনুমান করতে পারি। যেমন ধরা যাক, ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ডের কথা। গ্রামবাংলায় প্রায় প্রতিটি ঘর এমনভাবে তৈরি যেখানে অগ্নিকাণ্ড অতি সহজ ব্যাপার। এখানকার সহজ-সরল অধিবাসী যেখানে-সেখানে নিঃসঙ্কোচে জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি ফেলতে অভ্যস্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এর কোন একটা এমন জায়গায় পড়ে যেখানে আগুন লাগা সহজ, তাহলে গ্রামকে গ্রাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উজাড় হয়ে যেতে পারে। সেখানে ফায়ার ব্রিগেড নেই। সব জায়গায় উপযুক্ত পানির ব্যবস্থা নেই, অগ্নিনির্বাপক কোন সংগঠন নেই। শহরেও ভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুরূপ দুঃখজনক ঘটনা মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। বস্তি এলাকায় অথবা পাটের গুদামে। এই সমস্ত কারণে ক্ষতির

পরিমাণ আমাদের হিসেবের খাতায় লেখা থাকে না। পত্রপত্রিকার মারফত একটা আনুমানিক হিসেব প্রচার করা হয়। সেগুলোকে আংশিক সত্য হিসেবে ধরে নিলেও ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ড যে বিরাট একটা আর্থিক ক্ষতির কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এছাড়া আমাদের শিল্পকারখানার মান, পরিবেশ, শ্রমিকদের বাসস্থান কতটুকু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল সেটা ভেবে দেখার মতো। তার উপর ধূমপান নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যহানির একটা প্রধান কারণ। সর্বনিম্ন দামের এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে যা পয়সা খরচ হয় তার পরিবর্তে স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার থেকে বঞ্চিত হন। দৈনিক কমপক্ষে এক প্যাকেট সিগারেটের বিনিময়ে তিনি হারান একটি কলা কিংবা একটি ডিম। ফলে পুষ্টিহীনতা এবং ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে তাঁর কর্মক্ষমতা কমে যায়। এভাবে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ জানা না থাকলেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, তামাক শিল্প আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির অন্যতম প্রধান কারণ। ধূমপানজনিত কারণে কত লোক অকালে মৃত্যুবরণ করেন, কত লোক গৃহহারা হন, কত শিল্প তার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় এ–সবের প্রকৃত তথ্য যখন জানা যাবে তখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে তামাক শিল্প একটা মারাত্মক মারণাস্ত্র! জাতির জন্য এটা অর্থনৈতিক সঙ্গতি আনতে পারে না। বরঞ্চ একটা ভয়বাহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

'দু'হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এই অঙ্গীকারের সাথে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই জন্য আমাদের যতই সঙ্গতি থাকুক না কেন, ধূমপানজনিত রোগ থাকবেই এবং তা যদি থাকে আমাদের এই অঙ্গীকার কার্যকরী হতে পারে না।

'বাংলাদেশ তামাকবিরোধী আন্দোলন' (পরবর্তীতে 'আধূনিক'–এ রূপান্তরিত) একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মী নিয়ে এটা গঠিত। উদ্দেশ্য — এই আত্মঘাতী বদভ্যাসের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। আমরা আশা করব সরকার, শিল্প সংস্থা এবং জনসাধারণ সকলের সহযোগিতায় এ আন্দোলন দিন–দিন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সফল হবে, সার্থক হবে।

আপনি ধূমপান না করলেও . . .

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্যে সাতটি এবং পৃথিবীর অন্যান্য দশটি দেশে পরিচালিত ত্রিশটি জরিপের মাধ্যমে যে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তা হল ফুসফুসে ক্যান্সারের আশঙ্কা প্রত্যক্ষভাবে পেয় সিগারেটের অনুপাতে বেড়ে যায়। ধূমপায়ীদের মধ্যে এর হার অধূমপায়ীদের চেয়ে ২০/৩০ গুণ বেশি।

ক্রনিক ব্রংকাইটিস এবং এমফিসেমার হার অধূমপায়ী অপেক্ষা ধূমপায়ীদের মধ্যে বেশি। দেখা যায়, যাঁরা দিনে বিশটি বা তার বেশি সিগারেট পান করেন, তাঁদের মধ্যেই এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি ; অধূমপায়ীদের চেয়ে প্রায় ১৫/২০ গুণ। যুক্তরাজ্যের চিকিৎসকরা ধূমপান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করেছেন বলে তাঁদের মৃত্যুর হার আজ ১০/৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এমফিসেমা এবং ক্রনিক ব্রংকাইটিসের মূল নিহিত রয়েছে ধূমপানে ও পরিবেশ দূষণের মধ্যে। এদের দ্বিতীয়টি দমন করা সোজা না হলেও প্রথমটি আমাদের দমন-ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিচালিত জরিপ থেকে জানা যায়, করোনারী আর্টারী ডিজিজ-এর নেপথ্যে ধূমপানের কু-প্রভাব রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এটাই মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। ধূমপান রক্তনালীকে সংকীর্ণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে যে রক্ত সরবরাহ হ্রাস করে, তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে পাওয়া যায়। স্ট্রোক থেকে মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীদের মধ্যেই বেশি। ধূমপায়ীদের মধ্যে 'ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন'-এর হারও অধূমপায়ীদের চাইতে বেশি। অধূমপায়ীদের থেকে ধূমপায়ীদের মধ্যে পেপটিক আলসারের হার প্রায় দ্বিগুণ।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সার্জন জেনারেল রিপোর্টে অনৈচ্ছিক ধূমপানের উপর একটা অধ্যায় লেখা হয়। এর উপসংহারে বলা হয়, 'স্বাস্থ্যবান অধূমপায়ীরা সিগারেটের ধোঁয়ার পরিবেশে থাকলেও মোটামুটিভাবে কোন ক্ষতি হয় না। যে সামান্য প্রতিক্রিয়া হয় সেগুলো বরং মানসিক।' হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগীদের জন্য ধূমপানের পরিবেশ ক্ষতিকারক বলে এই রিপোর্টে অবশ্য স্বীকার করা হয়।

পরিবেশের উপর ধূমপানের কুফল কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনুভূতি, বিতৃষ্ণা এবং সামান্য কিছু শারীরিক প্রভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন চোখ, নাক এবং গলায় কিছু-কিছু অস্বস্তি ভাব। ধূমপায়ীরা কোন সময় নিজেদের অপরাধী মনে করতেন না। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল ধূমপান পরিবেশকে দূষিত করে না।

সম্প্রতি ঐচ্ছিক বা প্রত্যক্ষ ধূমপায়ী এবং অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী কতটুকু বিপদগ্রস্ত হবেন তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। যেমন আবাসিক পরিবেশেও ধূমপানের কুফল পরিলিক্ষিত হয়েছে। ধূমপায়ী মাতা-পিতার শিশুদের মধ্যে বিবিধ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের প্রকোপ তাদের জন্মের প্রথম বছরে বেশি করে পরিলক্ষিত হয়।

গর্ভাবস্থায় ধূমপান জরায়ুর পরিবেশ দূষিত করে। ফলে নবজাতদের ওজন তুলনামূলকভাবে কম হয়। এমনকি জন্মের কিছুদিনের মধ্যে এ-সমস্ত শিশুদের মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। যে সমাজে ধূমপায়ীদের সংখ্যা নগণ্য নয় অথবা যেখানে স্বল্পপরিসর স্থানে অনেক লোক জমা হয়, সেখানে ধূমপানের বিপদ একই পরিবেশের সবার বেলায় প্রযোজ্য।

ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আজও বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে জানা গেছে, অধূমপায়ীরা ধূমপায়ীদের পরিবেশে এলে প্রায় সমভাবে বিপদের সম্মুখীন হন। এই সত্য ধূমপায়ীদের বিরুদ্ধে অধূম-পায়ীদের যুক্তির সহায়ক। ১৯৭৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত বৃটিশ মেডিকেল জার্নালের সম্পাদকীয়ের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এতে ধূমপানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার হবে বলে মনে করি। 'মন্ত্রী পরিষদের কোন সদস্য ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে আপাতদৃষ্টিতে যে-সব অসুবিধের সম্মুখীন বলে মনে করেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে সেগুলো তেমন বাধার কারণ হতে পারে না। বিগত ত্রিশ বছরে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন শিল্পের ক্রম-বিলুপ্তি এবং রূপ-পরিবর্তন। যেমন ধরুন রেলওয়ে, জাহাজ নির্মাণ, তুলা উৎপাদন ইত্যাদির কথা। ইরানের শাহের পতনের অব্যবহিত পরেই ট্যাঙ্ক-উৎপাদন শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী কাজে নিয়োগ করা হয়। এ যদি সম্ভব হয় তবে তামাক শিল্পে যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের জীবন-নির্বাহ পদ্ধতির প্রেক্ষাপটও পরিবর্তন করা যাবে না কেন? জনসাধারণের সুস্বাস্থ্যের দায়িত্ব যে সেক্রেটারী অব স্টেইটের উপর নিয়োজিত, এ-সমস্ত জেনেশুনেও যদি তিনি সন্দিহান হন তবে

আমরা বলব, তাঁর একবার ভাবা উচিত যুক্তরাজ্যে তামাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৩৬,০০০-এর কাছাকাছি। অথচ ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে বাৎসরিক মৃত্যুর হার কম করে হলেও ৫০,০০০।'

পশ্চিমা দেশগুলো যখন ধূমপানের বিরুদ্ধে এত সোচ্চার এবং বিভিন্ন কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে অনেকদূর অগ্রগামী, বাংলাদেশে আমদানিকৃত অথবা দেশে প্রস্তুত সিগারেটের গায়ে কেন সাবধানবাণী পর্যন্তও লেখা থাকবে না? অথচ উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক'।

এ-সমস্ত তথ্য অনুধাবন করে ধূমপানের বিপদ সম্পর্কে সজাগ হয়ে নির্ভীকভাবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এতে সাহসিকতার পরিচয় দেবেন বলে বিশ্বাস করি। বুঝতে হবে ধূমপান সবার জন্য বিপদজনক, তা আপনি ধূমপান করেন আর নাই-বা করেন। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে অনেক রহস্য আজ উন্মোচিত হয়েছে। ভুলকে মানুষ ত্যাগ করেছে। আলোর পথে এগিয়েছে। সেই অগ্রযাত্রাকে রহিত করা অর্বাচীনতা বৈ তো কিছুই নয়। তাই ধূমপানের মতো ধ্বংসাত্মক নেশা বর্জন করা কি শ্রেয় নয়?

খাবারে কুসংস্কার

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। যে কয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য যুক্তিতর্কের অবকাশ রাখে না, এটা তার অন্যতম। শুধু স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্যই নয়, বেঁচে থাকার তাগিদেও খাবারের দরকার।

খাবারের প্রয়োজনীয়তা আদি যুগেও মানুষের অজানা ছিল না। বস্তুতঃ খাবার সংগ্রহ ছিল তাদের প্রধান কাজ। সব প্রাণী খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়, স্থান পরিবর্তন করে, এমনকি দেশ–দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা অনেক অজানাকে জেনেছি। খাবারের প্রতিটি উপাদান বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছি, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতি–কর খাবার চিনতে পেরেছি। মোটকথা, চাহিদা অনুসারে গুণাগুণ বিচার করে সুষম খাদ্য তালিকা প্রণয়ন এখন আমাদের আয়ত্তে।

কুসংস্কার একটা ব্যাধি। এটা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান। যে–কোন বিষয় নিয়ে কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে। খাবার নিয়ে যেসব কুসংস্কার এদেশে প্রচলিত এখানে তার উপর কিছু আলোচনা করব।

শিশুদের বেলায়

জন্মের শুরুতেই

জন্মের প্রথম তিনদিন শিশুদের বুকের দুধ না দেয়া একটা বহুলপ্রচলিত কুসংস্কার। এই সময় বুকের দুধ একটু ঘন এবং হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় 'কলস্ট্রাম'। অনেকের ধারণা, এটা বিষাক্ত এবং অনেক ক্ষতিকর জিনিস এতে থাকে। খেলে নবজাতকের ক্ষতি হয় ভেবে স্তন থেকে চাপ দিয়ে বের করে এটাকে ফেলে দেয়া হয়। অথচ এই কলস্ট্রামে বিষ তো দূরে থাক, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন উপাদান থাকে এবং তা নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বুকের দুধ যে কয়দিন শিশুকে দেয়া হয় না, সে কয়দিন শিশুকে শুধু

পানি, সামান্য মধু বা চিনি মিশান পানি খাইয়ে রাখা হয়। এতে শিশুর বলতে গেলে জন্মের প্রথম তিনদিন অনাহারে কাটে, ফলে একদিকে পুষ্টিহীনতা, অন্যদিকে কলস্ট্রাম থেকে বঞ্চিত হওয়াতে জন্মলগ্ন থেকে শিশুর যে প্রতিরোধ শক্তি হবার কথা, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

শিশুর খাবার

মায়ের দুধ বনাম গরুর দুধ

অনেকেই মনে করেন গরুর খাঁটি দুধ খাওয়ান হচ্ছে, অতএব মায়ের দুধের দরকার কি? ঝামেলা করতে যাব কেন? এটা একটা ভুল ধারণা। ভিটামিন 'সি' গরুর দুধের চেয়ে মায়ের দুধে বেশি থাকে। লোহাও থাকে বেশি। ভিটামিন 'সি' লোহার শোষণ (এব্‌সর্‌প্‌সান) বাড়ায়। গরুর দুধের চেয়ে মায়ের দুধে ভিটামিন 'সি' বেশি থাকায় লোহার শোষণ ঠিকমতো হয়, গরুর দুধে তা হয় না। তাছাড়া গরুর দুধ সিদ্ধ করলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায়।

তেলজাতীয় খাবার শিশুদের শক্তি যোগায়। মায়ের দুধ এবং গরুর দুধে যথেষ্ট পরিমাণে তেল থাকে। লাফালাফি, ছুটাছুটি এবং খেলাধুলায় শিশুদের অনেক শক্তির (ক্যালোরি) প্রয়োজন। তেল বহুলাংশে সেই শক্তি যোগাতে পারে। কোন কোন কারণে শিশু যদি বুকের দুধ বা গরুর দুধ কোনটাই না পায়, কিছু তেলজাতীয় খাবার তাকে দিতে হবে। একই কারণে শিশুদের মাখনতোলা দুধ (স্কীম্‌ড্‌) খাওয়াতে নেই। এই দুধে তেলজাতীয় উপাদান থাকে না বলে শক্তির পরিমাণ খুব কম এবং শিশুর পুষ্টির জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। চীনাবাদাম এবং সয়াবিন, তেলের উৎস হিসেবে শিশুদের জন্য উপযোগী খাবার।

মায়ের দুধ শিশুদের জন্য উত্তম সুষম খাদ্য। পুষ্টি উপাদান শিশুদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন মায়ের দুধে ঠিক ততটুকুই থাকে। এটা তাদের জন্যই তৈরি। শুধু নিরাপদ নয়, এটা নির্ঝঞ্ঝাটও বটে। কিনতে হয় না, তৈরি করতে হয় না, বাসি হয় না, গরম-ঠাণ্ডার ঝামেলা নেই, শিশি-বোতল-গ্লাস-চামচ কোনটাই দরকার হয় না। এই দুধ খাওয়ান মা ও শিশু উভয়ের জন্য উপকারী। বুকের দুধ খাওয়ালে প্রসবের পর মায়ের জরায়ু স্বল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং পুনঃগর্ভধারণের সম্ভাবনা বিলম্বিত হয়। এছাড়া মা ও শিশু পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে বলে

মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। মোটকথা, মায়ের দুধের বিকল্প নেই। অন্য কোন দুধ এর সমান হতে পারে না। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই।

অন্যান্য খাবার

শিশুর খাবার নিয়ে কুসংস্কার একাধিক। অনেকে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে জানেন না অথবা দিতে চান না। বিশেষ করে গ্রামে এক বৎসর পর্যন্ত শিশুকে দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবারই দেয়া হয় না। তাঁদের ধারণা এগুলো শিশুর পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়।

অনেক শিক্ষিত পরিবারেও চার-পাঁচ মাস বয়স থেকে শিশুকে অন্য খাবার দেয়া হয় না। অথচ এ বয়সে শিশুরা পরিবারের সব খাবার খেতে পারে। সেসব খাবার নরম হলেই হল।

অনেকে শিশুদের শাক-সবজি দেবার কথা ভাবতে পারেন না। এগুলোর অভাবে শিশুদের ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ 'এ'-এর অভাব হতে পারে। ফলে কেউ কেউ রাতকানা এমনকি অন্ধও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এসব খাবারে অন্যান্য ভিটামিন এবং লৌহ জাতীয় পদার্থ থাকে বলে এগুলোর অভাবে শিশুর রক্তহীনতা এবং বিভিন্ন পুষ্টিহীনতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ অজুহাত দেখান যে তাঁদের বাচ্চা দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেতে চায় না অথবা পারে না। এটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অতি সামান্য থেকে শুরু করে, ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালাতে থাকলে শিশুকে বিভিন্ন খাবারে অভ্যস্ত করে তোলা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়।

অসুখে-বিসুখে

ডায়রিয়ায়

ডায়রিয়া বা ঘন ঘন পায়খানা হলেই অনেকে বিশ্বাস করেন এটা খাবারের ফলে হয়েছে। এমন কিছু-না-কিছু খাওয়ান হয়েছে যা শিশুর সহ্য হচ্ছে না। এতেই ডায়রিয়ার উৎপত্তি। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল হলেও বহুলপ্রচলিত। সামান্য পাতলা পায়খানা হলেও এ ধারণার বশে অনেকে খাবার বন্ধ করে দেন। শুধু বার্লি আর সাগু দিতে থাকেন। এতে শিশুর যা প্রয়োজন তা সে পায় না। শরীর থেকে যা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা পূরণ হয় না। তদুপরি যা চাহিদা, তাও মেটান হয় না। পরিণতি সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন জীবনরক্ষাকারী রাসায়নিক পদার্থ, লবণ ও পানি শরীর

থেকে বেরিয়ে যায় বলে এগুলোর ঘাটতিপূরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অন্যথায় পরিণতি ভয়াবহ হবার সম্ভাবনা থাকে।

খুব বেশি দিনের কথা নয়। কলেরা হলে ধরে নিতে হত মৃত্যু অবধারিত। লবণ-গুড়-সরবত আবিষ্কারের ফলে এই মৃত্যুর হার এখন অনেক নিচে। প্রতি একশ জন কলেরা রোগীর নিরানব্বই জনকে সুস্থ করে তোলা এখন সম্ভব। ডায়রিয়ার বেলায়ও একই কথা। এছাড়া আমরা এখন প্রমাণের উপর ভিত্তি করে জানি, শিশুদের ডায়রিয়া খাবারের দোষে, কিংবা বদহজমের লক্ষণ নয়। এটা নানা ধরনের ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফল।

মাতৃগর্ভ থেকে প্রাপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মের পাঁচমাস পর্যন্ত শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। যেমন ধরুন, মায়ের যদি কোনদিন হাম হয়ে থাকে, তার অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা নবজাত শিশুর শরীরে প্রবেশ করে এবং জন্মের পর পাঁচমাস পর্যন্ত থাকে। ফলে এই সময় তাদের হাম হয় না। এর পর ছ'মাস থেকে দেড় বছরের মধ্যে নানা ধরনের সংক্রমণের ফলে শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। এই সময় তাদের নানা রোগে ভোগা তাই অস্বাভাবিক নয়।

কাজেই খাবার বন্ধ করে নয়, শরীর থেকে যা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা পূরণ করে, নিয়মিত খাবারের মাধ্যমে পুষ্টিমান বজায় রেখে, এবং প্রয়োজনবোধে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করে চিকিৎসা করতে হবে।

লবণ-গুড়ের সরবতের সাথে স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। এর পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। এ সময় মায়ের দুধ বন্ধ করার কোন যুক্তি নেই। মায়ের দুধে এলার্জি হতে পারে বলে যে ধারণা, তা সম্পূর্ণ ভুল। কাজেই ডায়রিয়া হলে শিশুর স্বাভাবিক খাবার বন্ধ করার কোন যৌক্তিকতা নেই এবং মায়ের দুধ বন্ধ করা নিষ্ঠুরতার শামিল।

হাম হলে

শিশুদের হাম নিয়ে কুসংস্কার অনেকের মনে বদ্ধমূল। হামের প্রতিষেধক টিকা এখন পাওয়া গেলেও আর্থিক এবং অন্যান্য কারণে অনেকেই এটা নিতে সক্ষম নন। অদূর ভবিষ্যতে এ রোগের প্রকোপ কমবে, এমন আশা করা যায় না।

হাম হলে বুকের দুধ, মাছ, মাংস এবং অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে। অপুষ্টি এবং রোগের যুগ্ম শিকার হয়ে অনেক

উপসর্গ দেখা দেয়। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। পাতলা পায়খানা হওয়া এ সময় অস্বাভাবিক নয়। এটা হোক আর না-ই হোক, খাবারের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না, বরং পুষ্টিকর খাবার দেয়া বাঞ্ছনীয়।

মিষ্টিতে কৃমি

অনেকেই মনে করেন মিষ্টি খেলে কৃমি হয়। এই উদ্ভট ধারণার উৎপত্তি কোথা থেকে জানা নেই। মনে হয় কেউ কোনদিন শিশুকে মিষ্টি না দেয়ার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন। আর তা-ই এ যাবৎ চলে আসছে।

মিষ্টি খেলে কৃমি হয় না। হবার কোন কারণও থাকতে পারে না। এতে কৃমির উৎপত্তি বা বংশবৃদ্ধি কোনটাই হয় না। অতএব কৃমি হলেও মিষ্টি নিষেধ নয়।

শিশুর মলে

শিশুর মল নিয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। তারা যেখানে-সেখানে মলত্যাগ করে। তাদের মল তেমন বিপদজনক নয় বলে অনেকেই মনে করেন। এঁদের ধারণা, বয়স্কদের মল অধিক বিপদজনক। এটা সম্পূর্ণ ভুল। শিশুর মলে অনেক জীবাণু থাকে। এটা রোগ বিস্তারের অন্যতম প্রধান উৎস। মায়েরা অল্প পানি দিয়ে বাচ্চাদের মল ধুইয়ে তেমন কোন সাবধানতা অবলম্বন না করে অন্য বাচ্চাদের খাবার পরিবেশন করেন, কোলে নেন, আদর করেন। এর ফলে পরিবার যেখানে পরিকল্পিত নয়, এক পরিবারে যেখানে অনেক শিশু, রোগ বিস্তার সেখানে অতি সহজ।

অনেকেই বলে থাকেন ভাল পানি না পেলে শৌচকর্মের জন্য খাবার পানি কতইবা খরচ করবেন। পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে এটাই আসল কথা। ভাল পানি পাওয়া না গেলে অপরিষ্কার পানি ব্যবহার করতে হবে। পরিমাণে পর্যাপ্ত হলেই হল। ছাই দিয়ে হাত মুছে পরিষ্কার করাও নিতান্ত বিজ্ঞানসম্মত। এতে এ্যালকালী বা ক্ষার থাকে বলে জীবাণু টিকে থাকতে পারে না।

মায়ের বেলায়

মায়ের বয়স, স্বাস্থ্য এবং গর্ভকালীন খাবারের সাথে শিশু-মৃত্যু হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অথচ অল্প বয়সে বিবাহ আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে

বহুলপ্রচলিত। গর্ভবতী মাদের অপরিমিত খাবার একটা সাধারণ ব্যাপার। খাবারের বেলায় আর্থিক সঙ্গতি যতটা দায়ী, তার চেয়ে দায়ী কুসংস্কার।

মাতৃগর্ভের ভ্রূণের পুষ্টি প্রয়োজন। এর বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। তাই গর্ভবতী মায়ের বাড়তি খাবারের দরকার। বিশেষতঃ গর্ভধারণের শেষের তিন-চার মাস থেকে বর্ধিত খাবারের প্রয়োজন খুবই বেশি।

প্রশ্ন হচ্ছে, বেশিরভাগ লোকের যেখানে দু'বেলা পরিমিত খাবার জোটে না, সেখানে বাড়তি খাবার আসবে কোথা থেকে ! দামের সাথে অনেক ক্ষেত্রে খাবারের পুষ্টিমানের কোন সম্পর্ক থাকে না। সুষম খাদ্য স্বল্পদামেও সম্ভব।

গর্ভাবস্থায়

গর্ভাবস্থায় কেউ ডাল, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খান না। তাঁদের ধারণা এগুলো খেলে পেটে অসুখ করবে, বাচ্চার ক্ষতি হবে। এমনকি অনেকেই মনে করেন ডিম খেলে বাচ্চার হাঁপানি এবং মৃগেল মাছ খেলে মৃগী হতে পারে। কুসংস্কারের শিকার হয়ে গর্ভবতী মায়েরা অপুষ্টিতে ভুগেন। ফলে গর্ভজাত শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোজা কথায় গর্ভবতী মায়ের জন্য কোন খাবার নিষিদ্ধ হবার কোন কারণ নেই।

প্রসবের পর

সন্তান প্রসবের পর মায়েদের অনেক সময় আঁতুড় ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। ভাতের সাথে হলুদবাটা, মরিচবাটা এবং নিরামিষ খাওয়ান হয়। ফলে তাঁরা অপুষ্টিতে ভুগেন, নানা রোগে আক্রান্ত হন, বুকের দুধের পরিমাণ কমে এবং শিশু উপযুক্ত পুষ্টি পায় না। এমনি করে মা ও শিশু উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গর্ভবতী মা এবং বুকের দুধ দানকারী মা উভয়েরই বাড়তি খাবারের প্রয়োজন।

জ্বর হলে

যে-কোন কারণে জ্বর হলে রোগীদের খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। সাগু, বার্লি, ডাবের পানি ইত্যাদি দেয়া হয়। এমনকি দুধ পর্যন্ত দেয়া হয় না। অথচ জ্বরের সময় দেহের তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তির প্রয়োজন হয় বেশি এবং সেজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালোরি তথা খাবারের প্রয়োজন। এসব বিধিনিষেধের ফলে রোগী

দুর্বল হয়ে যান এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। শুধু কারণ দূরীভূত হলেও সুস্থতা অর্জনে সময় লাগে অনেক বেশি।

সাধারণতঃ ধরে নেয়া যায়, প্রায় সব রোগেই খাবারদাবারের তেমন কোন নিষেধ নেই। রোগী যদি বমি করতে থাকেন আর পেটে কিছু না রাখতে পারেন বা পেটে ব্যথা বা অস্বস্তিবোধ করেন অথবা পেট ফেঁপে থাকে, তাহলে সাবধান হতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কলেরা, আমাশয়, উদরাময়ে

কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি রোগে এখন আর খাবারের নিষেধ নেই। এই সেদিন পর্যন্ত এসব রোগীকে খেতে দেয়া হত না। ফলে মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। লবণ–গুড় সরবত ব্যবহারের ফলে মৃত্যুর হার এখন অনেক কম।

জন্ডিস বা পাণ্ডুরোগে

নানা কারণে জন্ডিস হতে পারে। পিত্তথলিতে পাথর অন্যতম প্রধান কারণ হলেও ভাইরাসজনিত জন্ডিসের প্রকোপ অনেক কারণে বেড়েই চলেছে। একাধিক ভাইরাস লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস করতে পারে। কারণে–অকারণে ইন্‌জেক্‌শন, সেলাইন কিংবা রক্ত গ্রহণ এই রোগ বিস্তারের প্রধান কয়েকটি কারণ। সম্প্রতি এর প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হলেও দামের দিক দিয়ে এটা কয়েকজন বিত্তশালী ছাড়া প্রায় সকলের নাগালের বাইরে।

এ ধরনের জন্ডিসের কুফল এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা এসব রোগীর খাওয়াদাওয়ায় ভুল ধারণা বা কুসংস্কার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করব।

সাধারণতঃ দেখা যায়, জন্ডিস হলে অনেক খাবার বন্ধ করে দেয়া হয়। শুধু দেয়া হয় গ্লুকোজ আর সেলাইন। তার সাথে কিছু এন্টিবায়োটিক আর দু'একটা ভিটামিন। ভাইরাসের উপর এন্টিবায়োটিকের কোন কার্যকারিতা নেই। ভিটামিন খাবারের সমতুল্য হতে পারে না। যদি তাই হত, তাহলে খাদ্য সমস্যাই থাকত না। খাবারের পরিবর্তে অনেকে ভিটামিন খেতে শুরু করে দিতেন। গ্লুকোজ এককভাবে খাবারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। বেশি করে গ্লুকোজ খেলে বমির ভাব হয়। অন্য কিছু খাবার সামান্য রুচিটুকুও থাকে না। সুষম খাদ্যের অভাবেই রোগী দুর্বল

হয়ে পড়েন। আর এই কারণেই স্বাভাবিক নিয়মে যে সময়ের মধ্যে এটা নিরাময় হওয়া সম্ভব, তা বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

এককালে বলা হত এবং পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকত যে, জন্ডিস হলে মাছ, মাংস, চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া নিষেধ। এ ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। দেখা গেছে, এসব রোগী যদি ঠিকমতো খেতে পারেন, তাঁদের রোগ সময়মতো সারে। মোটকথা, জন্ডিস বা পাণ্ডুরোগে খাওয়াদাওয়ার উপর যে নিষেধ রয়েছে, এটা আসলে একটা কুসংস্কার, কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। রোগী যা খেতে চান, তাই তিনি খেতে পারেন। বরং তাঁর খাদ্য যদি সুষম না হয়, বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে সেটাকে সুষম করা বাঞ্ছনীয়। যেমন গরিব হলে ভাত কিংবা রুটি, ডাল, শাক-সবজি ; একটু অবস্থা ভাল হলে তার সাথে মাছ, মাংস, ডিম, দুধের সংযোজন করা যেতে পারে। আর কেউ যদি মাখন খেতে চান তাতেও নিষেধ নেই।

সেলাইনের বন্যা

সম্প্রতি সেলাইন দেয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। মাথাব্যথা, পা ব্যথা থেকে আরম্ভ করে কারণে-অকারণে সেলাইন দেয়া হয়। আবার অনেকে এসে বলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমার একমাত্র অসুখ দুর্বলতা। ৭-৮টা সেলাইন নিয়েও কিছু ফল পাইনি !' — এটা রোগীর অপরাধ নয়। তাঁর বিশ্বাস জমেছে, বরং এ বিশ্বাস জন্মান হয়েছে যে, সেলাইন দিলে দুর্বলতা সারে ! এখন দেখা যাক কথাটা আসলে যুক্তিসঙ্গত কিনা। পানি ও লবণের সংমিশ্রণে তৈরি হয় সেলাইন, আর তার সাথে গ্লুকোজ থাকলে গ্লুকোজ-সেলাইন। গ্লুকোজ থাকুক আর নাই থাকুক, যে উদ্দেশ্যে এগুলো দেয়া হয়, সেলাইন তা পূরণ করতে পারে না। শরীরে কেবলমাত্র লবণ-জলের ঘাটতি হলে বিশেষ বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে সেলাইন কিংবা গ্লুকোজ-সেলাইন দেয়া হয়। লবণ-গুড়ের সরবত প্রবর্তনের ফলে সেলাইন ইন্জেকশনের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গেছে।

খাবারের বিকল্প সেলাইন হতে পারে না। এটা শুধু কোন একটা বিশেষ ঘাটতির সম্পূরক হতে পারে। সে যাই হোক, যে ভাইরাসজনিত জন্ডিস নিয়ে আলোচনা করছি তাতে সেলাইন কিংবা গ্লুকোজ-সেলাইনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। উপকারিতার প্রশ্নই উঠে না। এতে রোগীর হয়রানি, স্বাস্থ্যহানি, আর্থিক ক্ষতি এবং রোগের বিস্তার হয়। খাবারের পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সহজ-সরল অসহায় রোগী এভাবে ক্ষতির শিকার হন।

পেপ্‌টিক আলসারে

পেটে আলসার (যাকে সাধারণ লোক 'গ্যাস্ট্রিক' বলে জানেন) হলে খাবার সম্বন্ধে অনেক বিধিনিষেধ আরোপও করা হয়। এক ঘণ্টা পর পর কিছু খাওয়ার জন্য নির্দেশনামা কাগজে ছাপিয়ে কেউ কেউ ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। এতে আরও লেখা থাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দুধ খেতে হবে, রাত্রে শোয়ার সময় এক গ্লাস দুধ খেতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো মান্ধাতার আমলের নিছক ভুল ধারণা। দুধের আমিষ এবং ক্যালসিয়াম পাকস্থলীতে অম্লক্ষরণ বাড়ায়। তাহলে রাতে শোয়ার সময় দুধ খেলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি। অথচ এটা একটা বহুলপ্রচলিত কথা। অবশ্য চা, কফি খেলে অম্লক্ষরণ বাড়ে। এগুলো না খাওয়া ভাল। সামান্য মরিচ, মসল্লা দিয়ে খাবার তৈরি করলে তাতে আলসারের ক্ষতি হয় এমন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কোন্ রোগীর কোন্ খাবার খেলে আলসারের ব্যথা বাড়বে, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। রোগীর অভিজ্ঞতার আলোকে যে খাবারে এমন হয়, সেটা বাদ দিতে হবে। মোটকথা, খাবারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে এবং সে হিসেবে এগুলোকে বাছাই করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বাদ দিতে হবে।

ঘন ঘন খাবারের উপদেশ মানসিক এবং পারিবারিক অশান্তির কারণ হতে পারে। চিকিৎসার দিক দিয়ে বরং কুফল ডেকে আনে। যাঁরা অফিসে কাজ করেন, ঘন ঘন খাবার তাঁদের অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। বাসায় ঘন ঘন খাবার পরিবারের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অশান্তির সৃষ্টি করে। আলসারের দিক দিয়ে এটা অম্লক্ষরণের সহায়ক। আর্থিক দিক দিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সামাজিক দিক থেকে উৎপাত হিসেবে দেখা দেয়। আসল কথা, আলসার রোগীর উপর খাবারের বোঝা চাপানর কোন বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি নেই। তাঁকে নিয়ম মেনে চলতে হবে, সময়মতো খেতে হবে এই যা।

পুষ্টিকর খাবার

দামে আর মানে

খাবারের প্রয়োজনে খিদে লাগে। তবে যে-কোন কিছু খেয়ে পেট ভরালেই শরীরের প্রয়োজন মেটে না। সুষম খাদ্য খেতে হবে। খাবারের সংমিশ্রণ যত বেশি

হয়, তা তত সুষম হয়। সুষম খাবার পেতে হলে নানা ধরনের খাবারের সংমিশ্রণ দরকার।

দাম কম হলে খাবার খারাপ হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন ধরুন, আটা ও চালে প্রায় সমপরিমাণ শক্তি (ক্যালোরি) আছে। চালের চেয়ে আটার দাম কম। চালে প্রায় ৭% আমিষ থাকে আর আটায় থাকে ১২%।

ভাতের পরিবর্তে রুটি খেলে অথবা ভাতের পরিমাণ কমিয়ে আটা বেশি ব্যবহার করলে দু'টোর সংমিশ্রণে পুষ্টিমান বেড়ে যায়।

ডালে প্রায় ২৫% আমিষ থাকে। আর এতে শক্তি রয়েছে চালের মতোই। ডাল-ভাত এবং ডাল-রুটি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শক্তি এবং আমিষের পরিমাণ মোটামুটিভাবে পূরণ করতে পারে।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এবং খনিজ লবণ (মিনারেল) বিশেষ করে আয়রনের (লোহার) অভাব আমাদের দেশে অনেকের মধ্যে দেখা দেয়। মা ও শিশুর মধ্যে এর প্রকোপ বেশি। বিভিন্ন রকমের শাক আমাদের দেশে প্রায় সবসময় পাওয়া যায়। এসব শাকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ থাকে। পুষ্টির দিক থেকে ঘন বর্ণের শাক সবচেয়ে ভাল। অতএব দেখা যায় চাল অথবা আটা, ডাল এবং শাক অথবা সবজি — এই তিনের সমন্বয় একটা সুষম খাদ্য।

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, আমাদের দামী খাবারগুলো যেমন মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি শাক-সবজি জাতীয় খাবার থেকে উৎপন্ন হয়। গরু-ছাগল শুধু সবুজ গাছ-গাছড়া খেয়ে মাংস বৃদ্ধি করে, দুধ দেয়। অন্যদিকে হাঁস-মুরগিও গাছ-গাছড়া এবং বিভিন্ন শাক-সবজি খেয়ে শরীর বৃদ্ধি করে ও পুষ্টিকর ডিম দেয়। অথচ অনেকের কাছে শাক-সবজির কদর কম। আপেল, আঙ্গুর, কমলালেবু দামের বহরে অভিজাত খাবার। সস্তা বলে পেয়ারা আর আমলকির কদর নেই। অথচ গুণের দিক দিয়ে এগুলোর মান অনেক বেশি — ভিটামিন 'সি' থাকে প্রচুর।

চিনির দাম বাড়লে গরিবদের হতাশ হবার কারণ দেখি না। তাঁদের বলতে হবে চিনির বদলে গুড় খেতে। এটা চিনির চেয়ে ভাল। এতে লোহা (আয়রন), ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য উপাদান থাকে যা চিনিতে নেই।

শাক-সবজি কাঁচা খাওয়ার চেয়ে রেঁধে খাবার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশি। শাক-সবজি বেশিক্ষণ সিদ্ধ করলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়। যেসব সবজি কাঁচা খাওয়া যায় সেগুলো রান্নার পরিবর্তে কাঁচা বা সালাদ খেলে বেশি ভিটামিন পাওয়া যায়। এছাড়া কাঁচা শাক-সবজি প্রায় সময় কেটে ধোয়া হয়। এভাবে ধুলে পানিতে দ্রবণীয়

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন 'সি'-র অনেকটা অপচয় হয়। এগুলো ধুয়ে কাটলে অপচয় কম হয়।

অনাদৃত খিচুড়ি

বৃষ্টি-বাদলের দিনে খিচুড়ি খাবার প্রবণতা এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। কেউ কেউ এটাকে শৌখিনতা বলে ধরে নেন। আবার অনেকে মনে করেন এটা গরিবের খাবার। চাল, ডাল, শাক-সবজি দিয়ে সাধারণতঃ খিচুড়ি করা হয়। তাছাড়া ডিম, আলু, কাঁচাকলা ইত্যাদিও কখনও কখনও মিশান হয়। আসল কথা, বহু উপাদানের সংমিশ্রণে এটা তৈরি করা হলেও চাল, ডাল ছাড়া খিচুড়ি হয় না।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খিচুড়ি একটা সুষম খাদ্য। এটা তেল কিংবা ঘি দিয়ে তৈরি করা হয়। আমাদের খাবারে সাধারণতঃ চর্বিজাতীয় উপাদান কম থাকে, তেল বা ঘি এর অভাব পূরণ করে। কাঁচাকলার সংমিশ্রণে ভিটামিন এবং লোহার পরিমাণ বাড়ে।

রান্নার দিক থেকে এটা সহজ। সময় এবং জ্বালানি খরচ দুই-ই বেঁচে যায়। খিচুড়িতে যে কয়টা উপাদান দেয়া হয় তার প্রত্যেকটি যেমন চাল আর ডাল আলাদা আলাদা রান্না করতে হলে যে সময় লাগে, দু'টো মিশিয়ে রান্না করতে সময় লাগবে এর অর্ধেক। এ রকম প্রতিটি উপাদান হিসেব করলে দেখা যায় কত অল্প খরচে এবং কম সময়ে এটা তৈরি করা সম্ভব।

বয়সের দিক থেকেও খিচুড়ি ব্যবহারে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। পাঁচ মাসের শিশুদের খিচুড়ি খাওয়ান সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটা তাদের শরীর গঠনে সাহায্য করে। হাত দিয়ে পিষে আঙ্গুল দিয়ে শিশুদের খিচুড়ি খাওয়ান মা এবং শিশু উভয়ের জন্য তৃপ্তিদায়ক। বড় এবং বুড়োদের বেলায়ও খিচুড়ির একই গুণ। মোটকথা, সব বয়সের মানুষের জন্য এটা একটা সুষম খাবার।

স্বল্প খরচে আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুষম খাদ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের অতি পরিচিত এবং বহুলাংশে অনাদৃত এই খিচুড়ি।

সবুজে সোনা

ডাল-ভাত আমাদের সাধারণ খাবার। সকলে এ দু'টো খেয়ে থাকেন। ঘন ডাল খাওয়া যুক্তিসঙ্গত হলেও আর্থিক কারণে অনেকের ভাগ্যে তাও জোটে না। পাতলা

করে হলেও এঁরা ডাল খান। অবশ্য পাতলা ডাল অনেকে খেয়ে থাকেন কুসংস্কারের বশে। কথায় বলে সবুজের দেশ — বাংলাদেশ। আমি বলি সবুজ শাকের দেশ। পথ-ঘাট, মাঠ, পাহাড়-পর্বত যেখানেই যাই না কেন, যে-কোন ঋতুতেই কিছু-না-কিছু শাক পাওয়া যাবেই।

এর আগে শাকের গুণাগুণ নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে শাক সুষম খাদ্যের একটি বিশেষ অংশ। যে শাকের এত গুণ তাকে আমরা কদর দিতে শিখিনি। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং আভিজাত্যের বড়াই নিয়ে যে শাককে এতদিন ধরে অবহেলা করেছি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ তা সমাদৃত। কবির ভাষায় শাক এখন সবুজ সোনা। একে নিয়ে রচিত হয়েছে জারী গান। সম্প্রতি পুষ্টি ও খাদ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে গানটি আমার হস্তগত হয়েছে তারই কিছু অংশের এখানে উদ্ধৃতি দিলাম। পাঠকসমাজ এটা উপভোগ করবেন, উপকৃত হবেন, শাকের গুণাগুণ সম্বন্ধে খানিকটা অবহিত হবেন, এই আশা রাখি।

সবুজ সোনার কথা
(জারী গান)

শোন রে দেশবাসী ভাই
সোনার কথা বইলা যাই
সোনার বাংলার আছে যত সোনা
এই দুনিয়ায় নাই তার তুলনা
ওরে — নাই তুলনা নাই
শোন রে দেশবাসী ভাই . . .

কচুর পাতা গুণের রাণী
শাকের রাজ্যে মধ্যমণি
পালং, লালশাক, সরিষা, সজিনা
কোনটাই নয় যে ফেলনা
এরাই মোদের সবুজ সোনা
অল্প দামেই যায় যে কেনা।

শালগম, পেঁয়াজ, বীট, গাজর, মূলা
কিছুই না তার যায় যে ফেলা
মূল এদের ভাল কিন্তু আরও ভাল পাতা
খাদ্যগুণে ভরা হলেও দামে অনেক সস্তা
এই শাকেরে তুচ্ছ কইরা স্বাস্থ্য না হারাই
হাতের ধন পায়ে ঠেইলা কপাল না চাপড়াই
শোনরে . . . . ভাই . . .

চল এবার আমরা সবাই
এই কথাটি বইলা যাই
শাক খাব ভাই রাশি রাশি
চলবে না তা হইলে বাসি
'সি' ভাইটামিন পাইতে হইলে
রান্‌তে হইব অল্প জ্বালে,
হাঁড়ির উপর ঢাক্‌না দিতে
ভুল না হয় যেন কোন মতে।
বাড়ির যত আনাচ্‌ কানাচ্‌
করব এবার শাকের চাষ
সবুজ সোনার অলঙ্কার মাথায় তুলে
নেব রে ভাই,
শোন রে দেশবাসী ভাই
(নাহার কামাল আহমদ)

ভোজনে ওজন

মেদ–মাংস বেড়ে যার দেহ স্থূল হয়
শ্রমসাধ্য কর্মে তার ধ্রুব পরাজয়।

এই প্রবাদের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল তা আমার জানা নেই। তবে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখ থেকে একথা বহু বৎসর যাবৎ শুনে আসছি। পরবর্তী জীবনে এটাও উপলব্ধি করেছি যে কথাগুলো বৈজ্ঞানিকভাবেও সত্য। একটুখানি তলিয়ে দেখলে আপনিও ভিন্নমত পোষণ করতে পারবেন না। আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব বা পরিচিতদের মধ্যে স্থূলকায় কেউ থাকলে এর যথার্থতার দৃষ্টান্ত পাবেন। আর আপনি নিজে যদি ভুক্তভোগী হন, তাহলে তো কথাই নেই।

যাঁদের ওজন বেশি, মেদ–মাংসে দেহ যাঁদের স্থূল, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের পরাজয় ঘটে। দৈনন্দিন কাজেও তাঁদের বিপদ। নানা রোগের উপসর্গও তাঁদের বেশি। এখানে স্থূলতা ও তার জটিলতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে দেখা যাক। একটা উদাহরণ দিলে এগুলো উপলব্ধি করা সহজতর হবে বলে মনে করি।

ধরুন আপনি এবং আপনার সমবয়সী আর একজন। আপনাদের উচ্চতা যদি সাড়ে পাঁচ ফুট হয়, বয়স ৪০ থেকে ৪৫ বৎসরের মধ্যে এবং আপনার ওজন যদি ২০০ পাউন্ড হয় এবং অন্যজনের ১৪০ পাউন্ড, তাহলে তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন আপনার কত অসুবিধা। মানসিক দিক দিয়ে চিন্তা করুন, কোন একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে দু'জন একসঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। আপনি লক্ষ্য করবেন সবাই না হলেও অনেকেই আপনার দিকে তাকাচ্ছে। অবশ্য প্রবেশপথ যদি অপ্রশস্ত হয় আর লোকজনের সমাগম হয় বেশি, তাহলে আপনার প্রথম বিপদ সেখানেই। আগে এসেও সহজে ভিতরে প্রবেশ আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। অথচ অপর লোকটি আপনার জন্য অপেক্ষা করতে না চাইলে সহজেই এ কাজটি সমাধা করতে পারেন। যাই হোক, ভিতরে প্রবেশ করার পর, একটু আগেই যা বলেছিলাম, অনেকের দৃষ্টি পড়বে আপনার উপর। আপনি একটু অস্বস্তি বোধ করবেন নিশ্চয়ই। এরপর হলের

ভিতরে সাজান ভাড়া করা ফোল্ডিং চেয়ারে আপনারা দু'জন পাশাপাশি বসতে গেলেন, আর অমনিই পড়ে গেলেন মাটিতে। আপনার ওজন ক্ষীণকায় চেয়ার সহ্য করতে পারল না, সেটা ভেঙেই পড়ল। চারদিকে হৈ চৈ শুরু হল। একটু আগে যে অস্বস্তি বোধ করছিলেন সেটা এখন হয়ে পড়ল একটা লজ্জাকর ব্যাপার। অনেকে অবশ্য ঘটনাটা উপভোগ করলেন। কিন্তু আপনি? এমন বিপর্যয় আপনার পদে পদে ঘটতে পারে। আপনি বাজারে যান, প্রায় সকলের ধাক্কা খাবেন, এগুতে পারবেন না। রাস্তা পার হতে যান, ভয় পাবেন। কারণ শরীর ঘুরিয়ে এদিক ওদিক গাড়ি চলাচল দেখা আপনার জন্য অত সহজ হবে না। এছাড়া কর্মস্থলে যাওয়া-আসার ব্যাপারেও অসুবিধেয় পড়বেন আপনি। রিক্সাওয়ালা আপনাকে নিতে চাইবে না, বিশেষ করে আর একজন যদি সাথে যান। আপনাকে তাহলে হয় একাই পুরো রিক্সা ভাড়া দিয়ে যেতে হবে, না হয় কোন রিক্সাওয়ালাকে রাজি করার জন্য অনেকক্ষণ রাস্তার পাশে অপেক্ষা করতে হবে। বাসে যদি যেতে চান তাহলে আরও অসুবিধা। বাসের ছোট দরজা এবং যাত্রীর সংখ্যার তুলনায় ভেতরে স্থানের অভাব দু'টোই আপনার জন্য সমস্যা, সেই হলঘরের সমস্যার চাইতে এটা আরও প্রকট। এখানে চেয়ার ভাঙবে না, তবে বসবার বা দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হবে। আপনার যদি নিজের গাড়ি থাকে, আপনি একাই সেখানে দু'জনের আসন দখল করে বসবেন। সংখ্যানুপাতে সে গাড়িতে চালক ছাড়া আপনি নিতে পারছেন তিনজনের জায়গায় মাত্র দু'জন। অনেক সময় এজন্য পারিবারিক সমস্যা দেখা দেবে।

মোটকথা, স্থূল দেহ নিয়ে আপনি যেখানেই যান না কেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন, অস্বস্তিবোধ করবেন, এমনকি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন। এখানেই শেষ নয়। আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনার অতিরিক্ত ওজন আপনার শরীরের জন্য বোঝাস্বরূপ। ধরুন আপনার ওজন যা হওয়া উচিত তার চাইতে ৩০/৪০ পাউন্ড বেশি। একজন লোকের মাথায় ঐ পরিমাণ ওজন তুলে দিলে যা হয়, মোটামুটিভাবে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার শরীরে তাই ঘটছে। আপনার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর প্রতিফলন হবে। আপনার হৃৎপিণ্ডের কার্যভার বেড়ে যাবে। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে, বহুমূত্র রোগও দেখা দিতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ এবং বহুমূত্র রোগের ফলে শরীরের শিরা-উপশিরায় পরিবর্তন ঘটে রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। হৃৎপিণ্ডের কর্মবৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তসঞ্চালন যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহলে প্রথমে বুকে ব্যথা বা এনজাইনা এবং পরবর্তী পর্যায়ে করোনারী থ্রম্বোসিস

নামে মারাত্মক ব্যাধি হতে পারে। বিভিন্ন জরিপ এবং সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্থূলকায় লোকদের আয়ুষ্কাল তুলনামূলকভাবে কম।

শরীরের ওজন বহন করার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে অস্থি। যাঁদের ওজন বেশি, অতিরিক্ত ওজন বহন করার জন্য তাঁদের অস্থিগ্রন্থিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। সংযোজনস্থলে অধিক ওজনের ফলে অস্থির আকারের পরিবর্তন হয় এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিস নামে রোগ দেখা দেয়। যেহেতু সমস্ত শরীরের ওজন মেরুদণ্ড ও হাঁটুর মাধ্যমে মাটিতে যায়, হাঁটু, পিঠ ও কোমরের ব্যথা স্থূলকায় ব্যক্তিদের নিত্য সহচর। শরীরের অন্যান্য অস্থিগ্রন্থি বা গিরায় ব্যথা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এছাড়াও কুঁচকি ও পায়ের আঙুলের ফাঁকে দাদ রোগ স্থূলকায় ব্যক্তিদের বেশি হয়। অধিক চর্বি জমা হওয়ার ফলে পেটের এবং পায়ের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইসব মাংসপেশীর দুর্বলতার ফলে হার্নিয়া হয় এবং পায়ের শিরায় ভেরিকোসিটি দেখা দেয়। শিরায় ভেরিকোসিটি হলে শিরা সম্প্রসারিত হয় এবং পায়ের উপর আঁকাবাঁকা কালো শিরা দেখা যায়। ভেরিকোস শিরা থাকলে পায়ে এক ধরনের চর্মরোগ (একজিমা) দেখা দেয়। এমনকি পায়ে আলসার বা ঘা হতে পারে। স্থূলকায় ব্যক্তিদের শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক থাকে না এবং ফুসফুসে রক্তসঞ্চালন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। শেষপর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা (ফেইলিওর) প্রকাশ পায় এবং শরীরে, বিশেষ করে পায়ে ফোলা দেখা দেয়।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যাঁদের ওজন বেশি তাঁরা জটিলতা ও রোগের সম্মুখীন হন। আগে বলা হয়েছে তুলনামূলকভাবে এঁদের আয়ুষ্কাল কম। সমীক্ষা ও জরিপ চালিয়ে দেখা যাচ্ছে স্থূলতার সাথে মৃত্যুর হারের সরাসরি সম্পর্ক আছে। দেখা যাচ্ছে যাঁদের ওজন শতকরা ৩০ ভাগ বেশি তাঁদের মৃত্যুর হারও অন্যদের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ বেশি। একইভাবে ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ বেশি ওজন যাঁদের, তাঁদের মৃত্যুর হার আরও বেশি ; শতকরা ৫০ ভাগ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্থূলকায় লোকদের ওজন কমান হলে এই বর্ধিত মৃত্যুর হার অনেক কমে আসে। কাজেই ওজনের আধিক্যকে অবহেলা না করে শুধু একটা জটিল রোগ হিসেবে নয়, অনেকগুলো জটিল রোগের সমষ্টি হিসেবে ধরে নিতে হবে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুধু সমীচীনই নয় — সবল, সুস্থ জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য।

এখন দেখা যাক আমরা কি করতে পারি। কোন রোগের চিকিৎসার আগে তার কারণ জানতে হয়। স্থূলতার অনেক কারণ আছে। যেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সেটা হল চাহিদার তুলনায় অধিক ভোজন। অনেকেই বলে থাকেন,

‘অমুকের সঙ্গে একই খাবার খাই অথচ তার ওজন বাড়ে না, শুধু আমারই বাড়ে।’ এটা হওয়া খুবই সম্ভব এবং তার কারণ আছে। ওজন বাড়া শুধু আপনি কি খাচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে না, এটা জমা-খরচের ব্যাপার। আপনি সারাদিনে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কতটুকু শক্তি ক্ষয় করছেন, সেটার উপরও নির্ভর করে জমার হিসেব। একই আয় করে দু'জন লোক যেমন সমান অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন না, তেমনি একই খাবার খেয়ে দু'জন মানুষের ওজনও আলাদা হতে পারে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই জমা ও খরচের ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। আপনি নিশ্চয়ই কোন না কোন সময় ঈদের নামাজ পড়ার জন্য বায়তুল মোকার্‌রম মসজিদে গেছেন। নামাজশেষে বাড়ি ফেরার সময় অসংখ্য ভিখারির মধ্যে কাউকে কাউকে কিছু দান-খয়রাতও নিশ্চয়ই করেছেন। এদের মধ্যে কাউকে কি মোটা-সোটা দেখেছেন? একবার রিক্সাওয়ালা-দের দিকে নজর দিন। মোটা-সোটা কারও কথা কি মনে পড়ে? আপনার বাড়ি যদি গ্রামে হয় অথবা মাঝে-মধ্যে গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়, তবে মনে করে দেখুন, গ্রামে কোন মোটা লোক দেখেছেন কিনা। অথচ গ্রামের মানুষ আপনি যা খান হয়ত তার দ্বিগুণ খান। হিসেব মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এঁদের সবারই জমার চাইতে খরচ বেশি। অর্থাৎ খাবারের মাধ্যমে এঁদের যতটুকু শক্তি সঞ্চয় হয়, কাজের মাধ্যমে ক্ষয় হয় তার বেশি।

যাঁদের অর্থ আছে, খাবার আছে বা দু'টোই আছে, অথচ আনুপাতিক হারে কায়িক শ্রম কম তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা বিপরীত। এঁরা খাবার মাধ্যমে যতটুকু জমা করেন, শ্রমের মাধ্যমে ব্যয় করেন তার চাইতে কম। এঁদের ‘মেদমাংস বেড়ে দেহ স্থূল হয়’। অন্যদিকে, যাঁরা মাঠে-ঘাটে খাটেন, যাঁদের বসে থাকার উপায় নেই, অপরিমিত খাবার সুযোগও নেই — তাদের স্থূলকায় হবার সম্ভাবনাও নেই। তবে ক্ষেত্রবিশেষে হিসেবের পরিবর্তনও ঘটতে পারে। একজন সৈনিক যতদিন পরিমিত খাবার খান ও প্রয়োজনীয় ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করেন, ততদিন জমা ও খরচের সমতা বজায় রাখতে পারেন। কোন কারণে কর্মস্থল পরিবর্তিত হলে সেই লোকই যদি অতিরিক্ত খাবার খান ও নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক শ্রম না করেন, তবে স্থূলকায় হয়ে পড়েন।

এ পর্যন্ত যে উদাহরণগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খাবারের সঙ্গে যদি শারীরিক শ্রমের সমতা না থাকে, আপনার শ্রম অনুপাতে আপনার যা প্রয়োজন তার চাইতে আপনার খাবার পরিমাণ যদি বেশি

হয়, তাহলে আপনার ওজন বাড়বেই। কাজেই কম খেয়েও আপনার ওজন বাড়ছে, এ ধারণা ভুল। আপনার যা প্রয়োজন তার তুলনায় (অন্যের সাথে তুলনায় নয়) আপনি বেশি খাচ্ছেন, তাই আপনার ওজন বাড়ছে। মেনে নিতে হবে ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ অতিভোজন অর্থাৎ ভোজনেই ওজন।

ওজন কমাতে হলে কি করতে হবে এ-ক্ষণে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। আপনাকে প্রয়োজনের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে খেতে হবে। পেট ভরে খাওয়া কিছুতেই উচিত নয়। শরিয়তের নির্দেশও এ ব্যাপারে বিজ্ঞানভিত্তিক। আপনার খাবার ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। এক ভাগ হবে খাবার, এক ভাগ পানি, আর এক ভাগ থাকবে খালি। মোটকথা আপনার যতটুক খাবার ক্ষমতা আছে, তার চেয়ে কম খাবেন। পেট ভরে খাওয়া ওজন বৃদ্ধি ছাড়াও বদহজম, ডায়রিয়া ইত্যাদিও ঘটাতে পারে।

আজকাল অলিতে-গলিতে সব জায়গায় মিষ্টির দোকান দেখা যায়। মেহমান আপ্যায়নের অন্যতম উপায় মিষ্টি। আরও দেখা যায় চায়ের দোকানের ছড়াছড়ি। এক কাপ চায়ে ব্যক্তিবিশেষে এক থেকে তিন চামচ চিনি দেয়া হয়। অনেকেই প্রতিদিন ৫ থেকে ৮ কাপ চা এবং দু'তিনবার মিষ্টি খেয়ে থাকেন। এই অভ্যাস ওজন বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক।

এ পর্যন্ত আলোচনায় আশা করি এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ভোজন এবং তার ফলে দেহের যে অতিরিক্ত ওজন হয় তা একটা ব্যাধি। এতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। নিয়মিত খাবার এবং শারীরিক পরিশ্রম দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি আপনার ওজন সীমিত রাখতে চান তাহলে —

১। পরিমিত খাবার খাবেন।

২। রীতিমতো কাজকর্ম, ব্যায়াম, শারীরিক পরিশ্রম করার অভ্যাস করবেন।

৩। চিনি, মিষ্টি-জাতীয় খাবার যথাসম্ভব বাদ দেবেন।

৪। ঘি, মাখন, চা, চর্বি-জাতীয় খাদ্য পরিহার করবেন।

৫। শাক-সবজি, তরিতরকারি বেশি করে খেলে শরীরের প্রোটিনের পুরো চাহিদা মিটবে।

৬। ভাত কম খাবেন।

৭। সম্ভব হলে খাবার সম্বন্ধে পারদর্শী লোকের কাছ থেকে এ ব্যাপারে উপদেশ নেবেন।

৮। সহজ কথায়, খাওয়া ও পরিশ্রমের ব্যাপারে গরিবী হালে চলতে হবে।

ওজন কমানর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোর কোনই কার্যকারিতা নেই। সম্প্রতি এগুলো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে অতীতে এই সমস্ত ওষুধের বিক্রি বাড়ান হত। এখনও কালোবাজারীদের বদৌলতে এসব ওষুধের অস্তিত্ব আছে। প্রকৃতপক্ষে, এসব ওষুধ ব্যবহারে অর্থের অপচয় তো ঘটেই, অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে।

মনে রাখতে হবে আরাম-আয়েসের বিভিন্ন কুফলের অন্যতম ওজন বৃদ্ধি। সারা দুনিয়ার বিত্তশালী দেশসমূহে অতিভোজনকারী মানুষেরা যে খাদ্যের অপচয় করে, তা বন্ধ করলে সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যে বিত্তহীন দেশসমূহের অনেক লোককে অনাহার থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও অতিভোজনকারীরা সংযমী হলে অনেক দরিদ্রের খাদ্য সমস্যা কিছুটা লাঘব করা যায়। আপনার পরিমিত খাবারের অতিরিক্ত কিছু যদি পার্শ্ববর্তী লোকের অনাহার নিবারণ করতে পারে সেটা আপনার সুখের, স্বাস্থ্যের এবং গৌরবের কথা।

হজমীতে টাকা হজম

ওষুধ নামে কত কি যে বাজারে পাওয়া যায়, এর কোন হিসেব নেই। টনিক, টেবলেট, হজমী আরও কত কি। এই ধরনের অনেক কিছু এককালে সরকারী খাতায় রেজিস্ট্রিকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। রেজিস্ট্রেশন মোটামুটিভাবে এ-সবের গুণাগুণের একপ্রকার সরকারী স্বীকৃতি। আসলে কিন্তু এই রেজিস্ট্রেশন এবং গুণাগুণের মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। কোন্ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বা বিচারের মাপকাঠিতে এগুলো স্বীকৃতি পেয়েছিল, শত চেষ্টা করেও তার হদিস পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কয়েকজন সচেতন চিকিৎসক এহেন পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেন। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। তাঁদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল দেশে ওষুধ প্রস্তুত এবং আমদানির ক্ষেত্রে গুণাগুণ বিচার করে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা এবং অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাতিল করা। এই কমিটির সুপারিশক্রমে প্রায় সাড়ে আট হাজার রেজিস্ট্রিকৃত ওষুধের সংখ্যা কমিয়ে সাড়ে চার হাজারে আনা হয়। বাদ পড়ে চার হাজারের মতো বিভিন্ন নামের তথাকথিত ওষুধ।

এর ফলে কিছুসংখ্যক ওষুধ প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ীমহল এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠে। কারণ এদের স্বার্থে আঘাত লাগে। প্রশাসনিক সাহায্য কিংবা সহানুভূতির অভাবে বিভিন্ন ধরনে চেষ্টা-তদবির করেও তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। নিষিদ্ধ-ঘোষিত ওষুধ বাজার থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে।

১৯৭৫ সালের আগস্টের মাঝামাঝি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বার্থান্বেষী মহল অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠে। বিশেষজ্ঞ কমিটি ভেঙে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল অনেক ওষুধের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। অবশেষে তাই হল। ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকর ওষুধ বাজারে আবার প্রচলিত হয়।

এমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে সচেতন চিকিৎসকসমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন একথা বললে ভুল হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ফোরামে এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা জনসাধারণকে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ওষুধ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল করার চেষ্টা করেছেন। সরকারের সক্রিয় ভূমিকা না থাকায় এসব সীমিত প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তবে এতে প্রশাসনের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ যে সম্ভব হয়েছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলশ্রুতি হিসেবে পরবর্তী প্রশাসন জনস্বাস্থ্যের খাতিরে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এর উপর নজর দেন। তদানীন্তন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ.এম.এরশাদের নির্দেশে ১৯৮২-র ১২ই জুন একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। তাঁদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয় গুণাগুণ বিচার করে প্রচলিত ওষুধের বাছাই করা, অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ওষুধ বাতিল করা এবং একটা নতুন বাস্তব ওষুধনীতি প্রণয়ন করা। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশক্রমে প্রায় দু'হাজার ওষুধ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কারণে বাতিল করা হয়। তাঁরা একটি ওষুধনীতিও প্রণয়ন করেন। ওষুধনীতি ঘোষণার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যবসায়ীমহল বিশেষ করে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠে। বাংলাদেশে ওষুধের বাজারে তাদের আধিপত্য বিনষ্ট হোক, এটা তারা সহ্য করবেই বা কেন? নানা ধরনের প্রচারণার মাধ্যমে তারা প্রচার করতে চেষ্টা করে জাতীয় ওষুধনীতি ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অনুরোধ জানায় পুনর্বিবেচনা করার জন্য। যাই হোক বিভিন্ন কারণে একটা রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে দু'একটা ওষুধের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

বাংলাদেশের ওষুধনীতি আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষভাবে সমাদৃত। দেশ, বর্ণ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে সকলেই একবাক্যে এর প্রশংসা করেছেন। আখ্যা দিয়েছেন সময়-উপযোগী এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আরও বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অভিপ্রেত।

বাংলাদেশের ওষুধনীতি একটা যুগান্তকারী ঘটনা। আসলে এটা একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। এ বিপ্লব দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। বিপ্লব সুখের এবং শান্তির। বিত্তবান কয়েকটি পরিবারের জন্য এ বিপ্লব নয়, দেশের দরিদ্র জনগণের হিতার্থে এই 'ওষুধনীতি'। 'অল্প খরচে উপযোগী ওষুধ দেশের অগণিত জনগণের কাছে পৌছুক — সে উদ্দেশ্যে এই ওষুধনীতির প্রণয়ন', বলেছেন তদানীন্তন প্রধান

সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। ছাত্র সংসদের উদ্যোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ওষুধনীতির উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে তিনি একথা বলেন। অনির্ধারিত এক সংক্ষিপ্ত সফরে সেদিন তিনি চট্টগ্রাম যান। দেশের প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে আমরা কয়েকজন ওষুধনীতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার জন্য তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব শামসুল হকের নির্দেশে সেমিনারের আয়োজন করি। তাঁর কথায়, 'ওষুধনীতি বাস্তবায়নের এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর ওষুধ থেকে রেহাই পাবার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপ্‌শন। এ-ক্ষেত্রে ওষুধনীতির সকল দিক অবহিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।' এই উদ্দেশ্যেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদ এই আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। আমাদের প্রথম সেমিনার এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

ওষুধনীতির সম্পূর্ণ পর্যালোচনা এখানে সম্ভব নয় — উদ্দেশ্যও নয়। স্বার্থান্বেষী ওষুধ প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতার খপ্পরে পড়ে যুগে-যুগে অগণিত জনসাধারণ স্বাস্থ্য লাভের আশায় লোকসানের শিকার হয়েছেন তথাকথিত ওষুধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে। এই সেদিন পর্যন্ত যেসব ওষুধ বাজারে বহুলপ্রচলিত ছিল, ঘরে ঘরে যে ওষুধ প্রায় দেখা যেত, যার প্রতি 'যা না হলে চলে না' এমন একটা বিশ্বাস ছিল, সে-সব ওষুধের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে রেখেছিল তথাকথিত টনিক এবং হজমী ওষুধ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান জরিপ করে দেখিয়েছে বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকর ওষুধের পিছনে প্রয়োজনীয় ওষুধের তুলনায় খরচের পরিমাণ অনেক বেশি। শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ টাকা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পিছনে খরচ করা হয়। আর বাংলাদেশে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর ওষুধের পিছনে খরচ করা হয় শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ টাকা।

বিভিন্ন রকমের কার্যকারিতা দাবি করে বিভিন্ন নামে যে-সব অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাজারে চালু আছে, সেগুলোর উপাদান, সংমিশ্রণ কিংবা উপাদানের পরিমাণ কোনটাই বিজ্ঞানসম্মত নয়। দু'একটা উপাদান মানুষের পক্ষে উপকারী হলেও সংমিশ্রণের ফলে সে-সব উপাদানের গুণগত মান আর থাকে না। কত রকমের যে হজমী টনিক বাজারে প্রচলিত আছে, তার হিসেব নেই। এগুলোর একটা-না-একটা নাম কার-না-কার কাছে জানা আছে।

আপনার, আমার সকলের কোন-না-কোন সময় খাওয়া-দাওয়া বা অন্য কোন

কারণে হজমের ব্যাঘাত হবেই। বদহজমের অনেক কারণ। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল বেপরোয়া খাওয়া-দাওয়া। অনেকে লোভ সামলাতে না পেরে যা পান যত ইচ্ছে খেয়ে ফেলেন, পরবর্তী পর্যায়ে পেট ফাঁপা, ঢেঁকুর উঠা এবং পেটে অস্বস্তি বোধ করেন। এমন সময় কেউ যদি বলে থাকেন অমুক ওষুধ অত পরিমাণ খেয়ে নিলে খুব ভাল হবে, যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি আছে, যাঁরা খাওয়া-দাওয়ার পিছনে হিসেব না করে খরচ করে থাকেন, তাঁদের বেলায় এটা সামান্য ব্যাপার। কাউকে বাজারে পাঠিয়ে হজমী বা টনিক কিনে নিয়ে আসেন এবং নির্দেশমতো সেবন করেন। বাকি অংশ যত্নের সাথে রেখে দেন। ওষুধের গন্ধমিশ্রিত দু'একটি ঢেঁকুর সেবনকারীকে তৃপ্ত করে।

আসলে কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সাময়িক বদহজম লোপ পেলেও তার কৃতিত্ব নেয় সেই কেনা হজমী ওষুধটি। ব্যাপারটি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞাপন কিংবা লোককথা কিংবা কারও দেয়া ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে তিনি যে ওষুধ সেবনে পরিতৃপ্তি লাভ করলেন এবং সময়ের কারণে উপকার পেলেন, সে বিশ্বাস শুধু তাঁর মাধ্যমেই অনেকের কাছে প্রকাশ পাবে। এমনি করে এক থেকে দুই, দুই থেকে বহু লোক একটা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচারণার এবং বিভ্রান্তির শিকার হয়ে অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হন। এভাবে এই ওষুধ বিক্রির বিস্তৃতি ঘটে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গঞ্জে এবং বিত্তবান থেকে দরিদ্র জনগণের মাঝে, দেশের আনাচে-কানাচে। অথচ একটু আগেই বলেছি উপাদানের পরিমাণ এবং সংমিশ্রণে এগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বদহজমের বিভিন্ন কারণগুলোর মধ্যে যেগুলো এক ধরনের এনজাইম দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, সেগুলোর সংখ্যা অনধিক দু'টো। একটা পেনক্রিয়াসের প্রদাহ থেকে সৃষ্টি হয়, আর একটা হয় লেকটেইজের অভাব থেকে। পেনক্রিয়াসের প্রদাহ থেকে যে রোগের সৃষ্টি হয়, সেখানে পাউডারের আকারে পেনক্রিয়াসের এক্সট্রাক্ট দিতে হয়। তবে পরিমাণে চাহিদার তুলনায় দেড়গুণ বেশি দিতে হবে যেন খাবার পর কিছুটা নষ্ট হলেও যতটা চাহিদা তা পূরণ হয়।

পাকস্থলীর এসিড বা অম্লের সংমিশ্রণে এনজাইম নষ্ট হয়। এই জন্য এনজাইম দেবার আগে বিভিন্ন উপায়ে অম্লের পরিমাণ কমান হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে খাবার পর-পরই যখন অম্লের পরিমাণ কম থাকে, তখন এই ওষুধ সেবন করা হয়। আবার আলসার রোগের যেসব চিকিৎসা প্রচলিত আছে সেগুলো ব্যবহার করা হয়। এসিড কমানর সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ সাইমিটিডিন (টেগামেট) বা রেনিটিডিন কেউ

কেউ ব্যবহার করার সুপারিশ করেন। নিঃসন্দেহে এগুলোর ব্যবহারে যে পরিমাণ অম্ল হ্রাস পায়, তাতে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। কিন্তু সাইমিটিডিনের বর্তমান বাজার দর মধ্যবিত্ত পরিবারের সামর্থ্যের বাইরে। যাঁরা দরিদ্র এই ওষুধ তাঁদের ব্যবহারের প্রশ্নই উঠে না।

পাকস্থলীর অম্ল ছাড়াও এনজাইম অতি সহজে বিনষ্ট হয়। বিভিন্ন তরল সংমিশ্রণে যেসব এনজাইম বা হজমী বাজারজাত করা হয়, তাতে বিভিন্ন তরল পদার্থের সংমিশ্রণে হজমী ওষুধ কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। দেখা গেছে কয়েক দিন নয়, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেও এটা ঘটে থাকে।

এখন হিসেব করে দেখা যাক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব হজমী ওষুধের স্থান কোথায়।

প্রথমতঃ, অনেক ক্ষেত্রে বদহজমের প্রথম এবং প্রধান কারণ অতিভোজন কিংবা অনিয়মিত ভোজন কিংবা গুরুপাক খাবার।

দ্বিতীয়তঃ, যেসব কারণে বদহজম হয়, সেগুলোর চিকিৎসা হচ্ছে যথাযথ নির্ণয় ও প্রতিকারের ব্যবস্থা। বিভিন্ন ধরনের বিশেষ-বিশেষ ব্যাধি যেমন পাকস্থলীর প্রদাহ অথবা আলসারজাতীয় রোগ সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করে, হজমী ওষুধের মাধ্যমে নয়।

তৃতীয়তঃ, বিশেষ কোন এনজাইমের অভাবহেতু যে বদহজমের সৃষ্টি হয় তা দু'য়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন পেনক্রিয়াসের প্রদাহ এবং লেকটেইজের অভাব।

চতুর্থতঃ, তরল ওষুধ যা শিশি হিসেবে বাজারজাত করা হয়, তাতে রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে হজমী ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ, যে দু'টো কারণে এনজাইম অতি প্রয়োজন, সে দু'টো কারণ নির্ধারিত হবার পর প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণ এনজাইম এক্সট্রাক্ট পাউডারের আকারে কেপসুল হিসেবে সেবন।

উপরে উল্লেখিত তথ্য থেকে বোঝা যায় তথাকথিত ওষুধের ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনেই বেশি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এগুলো ব্যবহারের কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রচলিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে উপশমের আশায় দিনের পর দিন হজমী ওষুধ খেয়ে শুধু অর্থের অপচয় হয় না, সংকটেরও সৃষ্টি হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম থেকে শুরু করে পাকস্থলীর জটিল রোগ যেমন ক্যান্সার — এর যে-কোন একটি হজমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের শেষোক্ত কারণে যদি হজমের ব্যাঘাত ঘটে এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া হজমী ওষুধ

খেয়ে সময় নষ্ট করেন, তাহলে বিপদ অনিবার্য। আসল রোগের বিস্তৃতি হজমী ওষুধ রোধ করবে না, করতে পারে না। শুরুতেই এই রোগ নিরাময়ের যে সম্ভাবনা থাকে, তা ক্রমশঃই লোপ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে এই জটিল রোগ যখন এর জটিলতা এবং লক্ষণসমূহের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন আর করার কিছুই থাকে না। চিকিৎসক সেখানে নিরুপায়। রোগ হয়ত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তখন বিস্তৃত। এহেন করুণ পরিণতির অন্যতম প্রধান কারণ বদহজমের প্রতি অবহেলা এবং তথাকথিত হজমী ওষুধের প্রতি নির্ভরশীলতা এবং ভালবাসা। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যে ওষুধের কোন কার্যকারিতা নেই, অন্ধ বিশ্বাসের ফলে বাজারে তা বহুলপ্রচলিত। এহেন অন্ধ বিশ্বাসের মূলে রয়েছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচার এবং কিছু সংখ্যক চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র। কত খরচ হয় তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন আমরা দেখি কোন-কোন কোম্পানী শুধু এই ওষুধ বানিয়ে ব্যবসায় প্রসার লাভ করছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরিতে এরা আগ্রহী নয়। এদের উদ্দেশ্য রোগের উপশম নয়, ব্যবসায় লাভের অংক। আসল কথা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা আমাদেরই দায়িত্ব। তাঁদের জানাতে হবে হজমী ওষুধ বদহজমের প্রতিকার নয়, টাকা হজমের একটা মাধ্যম। এগুলো বদহজমের উপশম করে না, সংকটের সৃষ্টি করে।

জোলাপে যন্ত্রণা

তখন আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। ডাক্তারী বিদ্যার বড় বড় বই, বিশাল আকারের হাজার পৃষ্ঠাসম্বলিত গ্রে-র এনাটমী, স্টার্লিং-এর ফিজিওলজী প্রথম দৃষ্টিতে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার করেছিল, তা আজও মনে পড়ে। ডিসেকশন হলে প্রথম প্রবেশ। সারি-সারি মৃতদেহ এখানে-সেখানে কাটা অবস্থায়। এমনি একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, তার উপর প্রিজারভেটিভ (সংরক্ষণকারী) হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের কেমন একটা গন্ধ। মনে হয়েছিল যেন গোটা পরিবেশটাই শুধু অস্বস্তিকর নয়, অস্বাস্থ্যকরও বটে। ক্রমে-ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। দিনভর যেন মাথা ধরে থাকে, গা-হাত নিশপিশ করে, ক্ষুধা মন্দা, একটা বিরক্তির ভাব, কিছু কিছু ঘুমের ব্যাঘাত। ৬৩ নং তালতলা লেনে বড় ভাই মোহাম্মদ আছহাবের সাথে মেসে থাকতাম। পড়াশুনা করতাম ছাদের সিঁড়িঘরে একটা ছোট কামরায়। বিজলি বাতির ব্যবস্থাও ছিল না। হারিকেন জ্বালিয়ে পড়াশুনা করতাম।

সে যাই হোক, মেসে বড় ভাইয়ের বড় শ্যালক সিরাজুল হক খান-সহ আরও সাত-আট জন লোক থাকতেন। তাঁদের চোখে আমি ছোট ভাইয়ের মতো ছিলাম। একটু দূরে ১৬ নং ওয়েলেসলী স্কোয়ারে পিতৃতুল্য মামা ইকবালুর রহমান সাহেব থাকতেন। তিনি ছিলেন ইনকাম ট্যাক্সের একজন অফিসার। বড় ভাই এবং মামার সম্পর্ক ছিল অকৃত্রিম ভালবাসার। বড় ভাই ছিলেন শম্ভুনাথ হাসপাতালের হেড ক্লার্ক। প্রায় সব কিছুতেই তাঁরা পরামর্শ করতেন। দু'জনই বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

আমার অসুখের কথা শুনে বড় ভাই উপদেশ দিলেন মামার পরামর্শ নিয়ে কোন ডাক্তার দেখাতে হবে।

বিকেলবেলায় অন্য দিনের মতো মামার বাসায় গেলাম । তিনি কুশল জানতে

চাইলে বললাম, 'শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। বড় ভাই বলেছেন আপনার পরামর্শ নিয়ে কোন ডাক্তার দেখাতে।' একটুখানি তিরস্কারের সুরে মামা বললেন,' 'এত অল্প বয়সে তোমাদের অসুখ হয়।' ঠিক করা হল পরের দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। আমি যেন যথাসময়ে আসি।

কলেজে সেদিনের পড়াশুনা শেষ করে মেসে গিয়ে আমি হাত-মুখ ধুয়ে নির্ধারিত সময়ে মামার বাসায় হাজির হই। মাগরিবের নামাজ পড়ে মামা আমাকে নিয়ে গেলেন তালতলায় ডা: তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। মামাকে দেখে ডাক্তার সাহেব অভ্যর্থনা জানিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। জানতে চাইলেন আমি কে। পরিচয় নিয়ে তিনি আমাদের বসতে দিলেন। জানতে চাইলেন আমার অসুবিধা কি। একে-একে সব লক্ষণ বললাম। শেষটায় এও জানিয়ে দিলাম অনেকে পরামর্শ দিয়েছে পায়খানা যদি পরিষ্কার হয়, সব সেরে যাবে। সেজন্য আমি এগারল খেতে পারি। ডাক্তার বাবু অতি মনোযোগের সাথে সব শুনলেন। আমাকে পরীক্ষা করলেন। আস্তে-আস্তে চেয়ারে এসে বসে একটুখানি চুপ থেকে বললেন, 'তুমি কি ওষুধ খেতে চাও?' উত্তরে বললাম, 'অনুমতি দিলে এগারল খেতে পারি।' তিনি মুচকি হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ ! খেতে পার, এখন তোমার জীবনের শুরু। রাত্রে যদি এক চামচ করে খেতে শুরু কর, হয়ত পায়খানা হবে। শেষে এমন এক সময় আসবে যখন এক চামচে চলবে না, এক বালতি খেতে হবে। এটাই হল জোলাপের নিয়ম। প্রথমে অল্পে হয়। আর শেষে লাগে ঢের বেশি। তরিতরকারি যত পার খাও। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি খাবে, এতেই পায়খানা পরিষ্কার হবে। তোমার বর্তমান সমস্ত অসুবিধা আস্তে-আস্তে সেরে যাবে।'

মামা নির্দেশ দিলেন ডাক্তার সাহেবের পরামর্শমতো কাজ করতে। তা মেনে নিলাম। এরপর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষে ফার্মাকোলজীতে বিভিন্ন ধরনের জোলাপ এবং তাদের কার্যকারিতা জানার সুযোগ ঘটে। তালিকায় এইগুলোর নাম অনেক — কেস্টরওয়েল থেকে কেসকেরা, মেগসালফ আরও কত কি। শুধু বই-পুস্তক থেকে পরীক্ষা পাসের তাগিদে এগুলো জানাই সার। কোনদিন ব্যবহার করিনি। ১৯৫১ সালে এম.বি. পাস করার পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে চাকরিতে যোগদান করি। ১৯৫৪ সালে উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাজ্য যাবার সুযোগ ঘটে। এই সময়ে এডিনবরা রয়াল কলেজে জোলাপের উপর একটা আলোচনা সভা হয়। একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক এই সভা পরিচালনা করেন। বিভিন্ন দেশের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশ

নেন। সব মিলে প্রায় সাড়ে তিনশ জন। অনেকক্ষণ ধরে জোলাপের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করার পর অভিজ্ঞ অধ্যাপক সাহেব মন্তব্য করলেন, 'মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে এগুলোর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। খাওয়া-দাওয়া এবং অভ্যাসের মাধ্যমে পাকস্থলীর কার্যক্রম অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ক্ষমতা থাকলে আমি হয়ত বিভিন্ন ধরনের জোলাপ নিষিদ্ধ করে দিতাম।' ডা: তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতার একটা গলি থেকে আট-নয় বৎসর আগে জোলাপ সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ রেখেছিলেন, উন্নত পশ্চিমা দেশ যুক্তরাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এডিনবরায় এতদিন পরে যেন তার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। আত্মতৃপ্তি লাভ করলাম। সেই সময়ে জীবনের শুরুতে সৎ উপদেশ না পেলে এতদিনে আমিও হয়ত এগারলের পিছনে অনেক টাকা অহেতুক খরচ করতাম। লাভ হত কোম্পানীর, আর শারীরিক ক্ষতি হত আমার।

কলকাতার সেই ডাক্তার আর এডিনবরার সেই অধ্যাপক দু'য়ের মাঝখানে বেশ কয়েক বৎসর, তারপরও দু'যুগের বেশি কেটে গেল ; জোলাপ এখনও বহুল-প্রচলিত। একটুখানি তলিয়ে দেখলে এর উত্তর মেলে। এখনও অনেকের ধারণা সপ্তাহে একবার যদি জোলাপ খাওয়া যায়, শরীরের সমস্ত বিষ তরল পায়খানার সাথে বেরিয়ে যাবে। এ বিশ্বাসের সূত্রপাত কখন হয়েছিল জানা নেই। তবুও মোটামুটিভাবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলো এ দাবি করেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে জোলাপ বাজারজাত করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই অন্ধ বিশ্বাস। ট্র্যাডিশন সমানেই চলছে। এখনও বিভিন্ন প্রচারপত্রে, দৈনিকে, সাপ্তাহিকে সুন্দর করে লেখা হয় : 'একদিনের জোলাপ আপনাকে গোটা সপ্তাহের আরাম দেবে !' পায়খানা পরিষ্কার না হলে শরীরের নানা ধরনের ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ রক্তে সঞ্চিত হয় বলে অনেকের ধারণা। তাঁদের মতে এরই ফলে অনেক লক্ষণ দেখা দেয়। এমন একটা ধারণা নিতান্ত কাল্পনিক। এর কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

বহুদিন জোলাপ ব্যবহারের ফলে শরীরে নানা রকমের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। জোলাপের জন্য পাতলা পায়খানার ফলে শরীর থেকে বিভিন্ন কার্যকরী উপাদান নিঃসৃত হয় — সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম এদের অন্যতম। এগুলো ছাড়া শরীরের প্রোটিন এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণও কমে যায়। ফলে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। পটাসিয়াম ঘাটতির ফলে দুর্বলতা দেখা দেয়। পাকস্থলীর সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ ক্ষমতা কমে যায়। বায়ু জমে, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। এ

অবস্থায় জোলাপ ব্যবহার করার ফলে এই সমস্ত উপসর্গের উপশম না হয়ে জটিলতা বাড়ে। প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম ঘাটতির ফলে অস্থি-মাংস দুর্বল হয়ে পড়ে, এমনকি কোন-কোন ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের কোন কোন অস্থির স্বাভাবিক আকার বদলে পাতলা চেপ্টা হয়ে যেতে পারে — যাকে মাছের হাড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

অনেকদিন জোলাপ ব্যবহার করার পর একটা নির্ভরশীলতা জন্মায়। জোলাপ ছাড়া তখন আর শরীর-পদ্ধতি কাজ করতে চায় না। অর্থাৎ পায়খানা হয় না। দু'এক দিন পায়খানা না হলেই মনে হয় শরীরের বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। জোলাপ ব্যবহার করার পর বিশ্বাসের বশে অভ্যস্ত লোক স্বস্তি বোধ করেন। এমনি করে দিনের পর দিন জোলাপ খাওয়ার অভ্যাস একটা দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। শোবার আগে জোলাপ একটা নিয়ম হয়ে বসে।

আগে বলা হয়েছে, জোলাপ শরীরের পক্ষে উপকারী নানা প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্যাদির ঘাটতি করতে পারে। যেহেতু জোলাপ খেলে কৃত্রিম উপায়ে এক ধরনের ডাইরিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়, অন্ত্রের শোষণক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে, ফলে অনেক রকমের ভিটামিনের অভাব শরীরে দেখা দেয় এবং তৎসংলগ্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের পক্ষে এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার। সুষম খাদ্য বা পুষ্টির অভাব এখানে প্রায় সর্বস্তরে। আবার এদিকে জোলাপ ব্যবহারের বদ-ভ্যাসের কারণে খাদ্যের শোষণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে এই সীমিত বা নিম্নমানের খাবারের অনেকটা যদি জোলাপের কারণে দেহের পুষ্টিসাধনে ব্যর্থ হয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অনেকটা যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো।

দীর্ঘদিন ধরে জোলাপ ব্যবহারের কি কুফল তা অনেকেই জানেন না। এর জন্য কে বা কারা দায়ী সেটা আমার বিচার্য নয়। তবে এর কুফল সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করা একটা নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব।

নিজ-নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা যদি অতীতের অনেক ঘটনার উপর আলোকপাত করি তাহলে জোলাপের জটিলতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। হঠাৎ পেটে ব্যথা আরম্ভ হবার সাথে সাথে পায়খানা পরিষ্কার হয়নি বলে জোলাপ খাইয়ে দেয়া জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের লক্ষণ নানা কারণে হতে পারে। এপেনডিসাইটিস এগুলোর অন্যতম। নাভির চারপাশে ব্যথা শুরু হয়ে তলপেটের ডানদিকে এর বিস্তৃতি, কোষ্ঠকাঠিন্য, সামান্য জ্বর এপেনডিসাইটিসের বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ। রোগ নির্ণয় না করে পায়খানা হলে সব সেরে যাবে এই

ভেবে তাড়াহুড়ো করে এখানে জোলাপের ব্যবহার রোগীর সাংঘাতিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। জোলাপের পর খাদ্যনালীর সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন বৃদ্ধির ফলে প্রদাহযুক্ত এপেন্ডিক্স্ ছিড়ে যেতে পারে। এতে জীবন অনেকটা বিপন্ন হয়। এ রকম ভুলের ফলে আমরা কত লোককে হারিয়েছি তার হিসেব দেয়া যাবে না। তবে এমন ঘটনা যে ঘটেছে তা অনেকের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। শুধু এপেন্ডিসাইটিস নয়, খাদ্যান্ত্রের আরও বহু প্রকার অসুখ বিশেষ করে যেগুলো হঠাৎ পেটে বেদনা নিয়ে আরম্ভ হয়, যেগুলোর সাথে উচ্চ কিংবা মধ্যম তাপমাত্রা থাকে, সেগুলোতে জোলাপের ব্যবহার রোগের জটিলতা সৃষ্টির সহায়ক। অন্যদিকে বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের বেলায় দেখা গেছে তৈলজাতীয় জোলাপের ব্যবহারে ফুসফুসে এক ধরনের নিউমোনিয়া হতে পারে। জোলাপ খেয়ে রাত্রে শোবার পর তৈলাক্ত জোলাপের সামান্য কিছু যদি শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে, সেখানে এক ধরনের প্রদাহের সৃষ্টি করে যা নিউমোনিয়াতে পরিণত হয়। অন্যদিকে এ ধরনের জোলাপ অনেক সময় পায়খানার রাস্তা দিয়ে অল্প-অল্প বেরিয়ে এসে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, পায়খানার রাস্তার চারপাশে অস্বস্তির ফলে চুলকাতে থাকে।

এককালে গর্ভধারণের প্রারম্ভিক অবস্থায় জোলাপ ব্যবহারের ফলে ভ্রূণ নষ্ট হয়েছে এমন উদাহরণও মিলে।

বহুদিন ধরে জোলাপ ব্যবহারের ফলে অন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে। মায়েন্টারিক প্লেক্সাস নামের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা নষ্ট হয় বলে অন্ত্রের গতিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং সে কারণে জোলাপের মাত্রা পরবর্তী পর্যায়ে অনেক বাড়িয়ে দিতে হয়। বিভিন্ন রকমের জোলাপের এইসমস্ত সাধারণ উপসর্গ ছাড়াও বিশেষ উপসর্গ দেখা যেতে পারে। কোন-কোন জোলাপ অন্য ওষুধের কার্যক্ষমতা ব্যাহত করে। আর কোন-কোন জোলাপ মাংসপেশীর দুর্বলতা এমনকি চিন্তাশক্তিও ব্যাহত করতে পারে। আর কতগুলো জোলাপ যা এক সময় স্বাস্থ্যবর্ধক নামে পরিচিত ছিল, পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে সেগুলো লিভারের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। অতএব স্বীকার করতে হবে জোলাপ ব্যবহার নিরাপদ নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে এগুলো না হলে চলে কি না। মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া যায় জোলাপের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। অন্ধ বিশ্বাসের বশেই এগুলো বহুলপ্রচলিত।

কোম্পানীর আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন এবং শোনা কথা জনসাধারণকে কিভাবে বিভ্রান্ত করতে পারে জোলাপ তার একটা উদাহরণ। সপ্তাহে একদিন জোলাপ নিলে

বাকি দিনগুলি ভাল যাবে এ ধরনের বিশ্বাস বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। রীতিমতো পায়খানা পরিষ্কার হওয়া একটা অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। এটা খাবার জিনিসের উপর অনেকটা নির্ভর করে। পায়খানা পরিষ্কার না হলে ক্ষতি হবে এই ধারণা নিয়ে চিন্তিত মনে কেউ যদি পায়খানা করতে যান, তাঁর পায়খানা পরিষ্কার না হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন ঘুম হবে না এই চিন্তা নিয়ে যাঁরা ঘুমাতে যান, তাঁদের সহজে ঘুম আসে না। পাকস্থলীর উপর মানসিক প্রক্রিয়ার প্রভাব অনেকেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারবেন। যেখানে পায়খানা বা প্রস্রাবের ব্যবস্থা নেই, সেখানে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় বেশি, বিশেষ করে যাঁদের মানসিক দুর্বলতা থাকে বা অহেতুক ভয় থাকে।

আবার অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরালে কয়েকটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। গরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি চতুষ্পদ প্রাণী আদৌ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে কিনা সন্দেহ। অন্ত্রে বিশেষ কোন রোগ হলে আমাদের মতো এ সমস্ত তৃণভোজী প্রাণীরও কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় অহেতুক জোলাপের ব্যবহার। যেখানে কোষ্ঠকাঠিন্য বিশেষ কোন রোগের কারণে হয়ে থাকে, সেখানে এ কারণ দূরীভূত করাই বাঞ্ছনীয়। যেসব তৃণভুক্ জীবজন্তুর কথা বলা হল তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না কেন তা তলিয়ে দেখতে হবে। এগুলো খায় কি? এগুলো গাছগাছড়া, লতাপাতা, ঘাস ইত্যাদি খায়। মোটকথা আঁশজাতীয় খাদ্যই তাদের মূল উপাদান। সেজন্যই এইসমস্ত প্রাণীর মলত্যাগ একটা নিয়মিত ব্যাপার। এ ধরনের অভ্যাস এককালে পাহাড়িয়াদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থাভাবে হোক কিংবা প্রচলিত অভ্যাসের বশেই হোক গ্রামের লোকেরা শাকসবজি বেশি খেয়ে থাকেন যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য তেমন দেখা যায় না। সুতরাং জোলাপের ব্যবহার তাঁদের অনেকের কাছে অজানা। যত সমস্যা উচ্চ কিংবা অর্ধশিক্ষিত বা বিত্তশালী, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শহুরে লোকদের নিয়ে। এ সমস্ত ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণ শাক-সবজি খাওয়াকে গরিবী খাবার বলে মনে করেন। অন্যদিকে আকর্ষণীয় কার্টনেভরা জোলাপের বোতল এঁদের অনেকের বাড়িতে শোভা পায় এবং অনেকে আবার দামী জোলাপ নিয়ে গর্বও অনুভব করেন। এঁদের দেখাদেখি শহরে স্বল্প আয়ের অনেক পরিবারেও জোলাপ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক। যে বিশ্বাসের বশে জোলাপ আজকাল সমাজে প্রচলিত তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। জোলাপ ব্যবহারের যে উপকারিতা দাবি করা হয়, তা নিছক সত্যের অপলাপ। আগেই বলা হয়েছে বেশি পরিমাণে আঁশজাতীয় খাবার খাওয়ার

অভ্যাস নিয়মিত মলত্যাগের অন্যতম সহায়ক। এছাড়া যে কয়েকটা জিনিস সস্তা, নিরাপদ এবং উপকারী সেগুলো হল ইছপগুলের ভুসি, বেল, আনারস ইত্যাদি। রাতের বেলায় শোবার সময় ২/৩ চামচ ইছপগুলের ভুসি পানির সাথে খেলে অতি সহজে পায়খানা পরিষ্কার হয়। এগুলো দামে সস্তা। ফ্যাশনের বশে অনেকে ইছপগুলের ভুসির প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন অথচ আইসোজেল খেয়ে তৃপ্তি পান। শেষোক্ত জিনিসটা আমাদের দেশী ইছপগুলের বিলিতি সংস্করণ। দামে বেশি, সুন্দর কার্টনে ভর্তি, সবার উপরে এটা বিদেশে তৈরি, তাই এত কদর। বেলের দুর্ভাগ্য এটা দামে সস্তা, যদিও গোটা বছর ধরে এটা পাওয়া যায় না। শাক-সবজি ছাড়া বেশ কয়েকটি দেশীয় ফলমূলে পায়খানা পরিষ্কার হয়, এতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কারণ কখনও বেল, কখনও আনারস, কখনও আম, আবার কখনও বা অন্য কিছু গোটা বছর জুড়ে থাকে। এছাড়া শাক-সবজি তো আছেই। ইছপগুলের অভাব এখনও দেখা যায়নি। তাহলে জোলাপের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যে জোলাপ শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি ঘটায়, অন্ত্রের স্নায়ুর দুর্বলতা আনে, এমনকি কোন-কোন সময় মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে, সে জোলাপে সান্ত্বনা নয়, বরং যন্ত্রণা।

আমাশয়ে অমানিশা

ডিসেন্ট্রি বা আমাশয় একটা অতি পরিচিত শব্দ। এটা এক বা একাধিক রোগের নাম। এ-রোগে আক্রান্তের হার অত্যন্ত ব্যাপক। পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা এবং কম-বেশি রক্তযুক্ত পায়খানা এ-রোগের প্রধান লক্ষণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বর্তমান নিবন্ধে ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি বা সিগেলা নামক জীবাণুজনিত আমাশয়ের কথা নয়, আমরা আলোচনা করব এমিবিক ডিসেন্ট্রি বা এমিবাজনিত আমাশয়ের কথা।

সাধারণভাবে বলা যায়, সিগেলা জীবাণুজনিত আমাশয়ের ক্ষেত্রে পনের-বিশ বার থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বার পর্যন্ত পায়খানা হওয়া স্বাভাবিক। মলের তুলনায় অধিক পরিমাণ রক্ত এবং পায়খানার রাস্তায় শূল এবং জ্বর এ ধরনের আমাশয়ের বিশেষ লক্ষণ। এ ধরনের আমাশয় ক্ষণস্থায়ী এবং তুলনামূলকভাবে এতে কম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমিবিক আমাশয় সম্পর্কে বলা যায় এটা হচ্ছে একটা জাতীয় সমস্যা।

অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিজেদের এমিবিক আমাশয়ের রোগী বলে মনে করেন এবং আপন ব্যবস্থামতো ওষুধ সেবনে ব্রতী হন। এ-থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, এ ধরনের রোগের ওষুধের চাহিদা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বাংলাদেশের বাজারে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ অথবা একই ওষুধ বিভিন্ন নামে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অনেকেই যখন-তখন এসব ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন।

মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরাধিককাল ধরেও ওষুধ ব্যবহার করে আসছেন, এমন লোকের সংখ্যা অজানা হলেও নগণ্য বলা ঠিক হবে না। প্রশ্ন হল, পায়খানার সাথে সামান্য আম অথবা মাঝে-মাঝে রক্ত গেলেই কি সেটাকে সন্দেহাতীতভাবে আমাশয় বলে ধরে নিতে হবে?

আমার পরিষ্কার জবাব হচ্ছে, না।

এ ধরনের উপসর্গকে আমাশয় বলে ধরে নেয়া শুধু যে অবৈজ্ঞানিক তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে বিপদজনক। বিশেষ করে বয়স্ক লোকের এ ধরনের লক্ষণ যদি

স্বল্পকালীন হয়, তাহলে তাঁর অন্য কোন জটিল রোগ আছে কিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হওয়া অত্যাবশ্যক।

অন্যদিকে এ ধরনের লক্ষণ অল্পবয়সীদের মধ্যে যখন মাসাধিককাল ধরে বার বার দেখা দিতে থাকে, তখন সেটা আমাশয় না হয়ে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (Irritable bowel syndrome) নামে ভিন্ন ধরনের একটা রোগও হতে পারে। দু'টোর চিকিৎসা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরন্তু, শেষোক্ত রোগটার নাম জটিল হলেও তাতে তেমন কোন জটিলতা দেখা দেয় না।

এ আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি সেটা হল, যেসব লক্ষণকে আমরা সরাসরি আমাশয় বলে মনে করি, সেগুলোর সব আমাশয় নয়। সুতরাং রোগনির্ণয় যেখানে সঠিক নয়, চিকিৎসাও সেখানে বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। আরও প্রশ্ন আছে। পছন্দমতো ওষুধ ক্রয় করে ইচ্ছেমতো সেবন করা কি আদৌ নিরাপদ? বাজারে বিভিন্ন ধরনের আমাশয়ের ওষুধ পাওয়া যায়। চাহিদার তুলনায় এসব ওষুধের পরিমাণ কম, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। প্রচলিত ওষুধের মধ্যে যেগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার কয়েকটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি :

এন্টারোভায়োফর্ম, সাইওডোএন্টারিন, মেক্সাফর্ম, এডাইসিন, ইনটেস্টোপেন, নিভেমবিন, এন্টারোগুয়ানিডিন, এমবিকুইন ইত্যাদি।

এসব ওষুধ কতটুকু নিরাপদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা সময়োচিত বলে মনে করি। নতুন জাতীয় ওষুধনীতিতে ক্লিওকুইনল এবং হাইড্রোক্সিকুইনোলিন গ্রুপের কম-বেশি পঁয়ত্রিশটি ওষুধ ক্ষতিকর বলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞার পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে।

ক্লিওকুইনল ও হাইড্রোক্সিকুইনোলিন গ্রুপের যেসব ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে :

ওষুধের নাম	**কোম্পানীর নাম**
স্টেরিকল	ফাইজার
ফিসট্রেপ টেবলেট	ফাইসন্স
এমবিকুইন	বি.পি.আই
নিভেমবিন	
কুইক্সালিন	স্কুইব

ডাইসেডিন	এডরুক
সাইওডোএন্টারিন	এলবার্ট ডেভিড
এন্টারোগুয়ানিডিন	
এডাইসিন	ফার্মাদেশ
আইডোকুইন	ফার্মাদেশ
এন্টারোসিল	গ্যাকো
ডাইরোকুইন	সিনথো ল্যাবরেটরীজ লি:
এন্টারোসাইড	ইউনাইটেড কেমিকেলস এন্ড ফার্মাসিউটিকেলস লি:
অরাকুইনল	স্টানডার্ড ল্যাবরেটরীজ লি:
এসিকুইন	এশিয়াটিক ল্যাবরেটরীজ লি:
ডিওকুইন	ডক্টরস্ কেমিকেলস লি:
এনটেনল	সরমা কেমিকেলস ওয়ার্কস
রেসটোরেন কমপোজিটাস	বেক্সিমকো
ডিপেনডাল	এস.কে.এন্ড এফ.
এন্টারোভায়োফর্ম	সিবা গেইগী
মেক্সাফর্ম	সিবা গেইগী
ইনটেসটোপেন	স্যানডজ
এন্টারোসেপটল	ইজিট, হাঙ্গেরী

১৯৩০ সালে এই জাতীয় ওষুধের প্রথম আবির্ভাব। ১৯৩৪ সালে আমাশয় রোগের চিকিৎসায় এই ওষুধ প্রথম প্রয়োগ করা হয়। ভায়োফর্ম অথবা এন্টারোভায়োফর্ম নামে বহুপ্রচলিত ওষুধ সিবা গেইগী কোম্পানী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করে কি বিপুল মুনাফা অর্জন করেছে, তা সহজে অনুমেয়। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে এ ধরনের ওষুধের বিষক্রিয়া প্রথম ধরা পড়ে কয়েকজন জাপানী চিকিৎসকের কাছে।

এসব ওষুধের দীর্ঘকালীন ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তার মধ্যে আছে শরীরে ঝিনঝিনা ভাব, অনুভূতি এবং চলৎশক্তি হ্রাস কিংবা বিলোপ। অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তিও বিনষ্ট হয়। কালক্রমে জাপানে এ ধরনের বিভিন্ন লক্ষণজনিত দশ হাজারেরও বেশি রোগীর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়।

ব্যাপক সমীক্ষার পর ১৯৭০ সালের দিকে এইসব ক্ষতিকর উপসর্গের জন্য এন্টারোভায়োফর্মকে দায়ী করা হয়। এই সময়ে অনেকেই এই ওষুধটাকে শুধু আমাশয় চিকিৎসার জন্য নয়, প্রতিরোধক হিসেবেও ব্যবহার করে চলেছিলেন।

১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে জাপান সরকার এন্টারোভায়োফর্ম এবং একই জাতের ১৮৫টা ওষুধের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ১৯৭১ সালে ক্ষতিপূরণ দাবি করে কোম্পানীর বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা দায়ের করা হয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং সরকার বিবাদী হিসেবে বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করতে থাকে। উপরন্তু ওষুধজাত বিষক্রিয়াগুলোকে তারা সরাসরি ভাইরাসজনিত বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে। ১৯৭৬ সালে সিবা গেইগী কোম্পানী নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে একটা আপস-মীমাংসার জন্য আদালতকে অনুরোধ জানায়। কোর্ট শেষ পর্যন্ত ৯৮ (আটানব্বই) কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করে। এর এক-তৃতীয়াংশ জাপান সরকারকে দিতে হয়। বাকি দু'-তৃতীয়াংশ প্রদান করে সিবা গেইগী এবং দু'টি জাপানী সংস্থা। সুইডেন এবং লন্ডনে এ ধরনের ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করা হয়। এত কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের ১০০টিরও অধিক দেশে এইজাতীয় ওষুধ আজও অবাধে বিক্রি হচ্ছে।

আমেরিকা স্কুইব কোম্পানীর বিরুদ্ধে একই জাতীয় ওষুধ কুইক্সালিনের জন্য মামলা দায়ের করা হয়। ক্লিওকুইনল গ্রুপের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে তা **SMON (Sub-acute Myelo-optic Neuropathy)** অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের রোগ নামে পরিচিত এবং এই রোগের লক্ষণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি। বাংলাদেশের ঝিনঝিনা রোগ মাঝে-মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মাত্র কিছুদিন আগেও এ ধরনের রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই রোগাক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই যে আমাশয়জনিত ওষুধের শিকার, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাশয় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা বাংলাদেশের জনমনে এত ব্যাপক যে কোন উন্নত দেশে এর কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

নিজে-নিজে ডাক্তারি করে ওষুধ খাবার প্রবণতা তৃতীয় বিশ্বে তথা বাংলাদেশে একটা সাধারণ ঘটনা। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সহজ সরল জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দেশী এবং বিদেশী কোম্পানী কত ক্ষতিকর এবং তথাকথিত আমাশয়ের ওষুধ বাজারজাত করেছে, এর উদারহরণ দেয়াই বাহুল্য। অন্ধত্ব, ঝিন-ঝিনা কিংবা পক্ষাঘাত যাই হোক না কেন এদেশের জনসাধারণ সেটাকে কপালের

লিখন বলে মেনে নেন। তথাকথিত ওষুধকে সনাক্ত করে ক্ষতিপূরণ দাবি করা তাঁদের কল্পনার বাইরে। স্কুইব কোম্পানী এবং আরও বহু ওষুধ কোম্পানী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। নিজের দেশে যেটা নিষেধ যেমন কুইক্সালিন, বাংলাদেশে তা বাজারজাত করতে তাদের কোন দ্বিধা নেই। এর ফলে এ দেশের কত লোক বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন, তার হিসেব কে রাখে?

বাংলাদেশের জাতীয় ওষুধনীতিতে এসব ক্ষতিকারক তথাকথিত ওষুধগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে আমাশয় রোগের কার্যকর এবং স্বল্পমূল্যের অনেক ওষুধ সবসময় বাজারে পাওয়া যায়।

সঠিক রোগ নিরূপণ করে চিকিৎসা করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। রোগ নিরূপণই চিকিৎসায় সাফল্যের প্রথম ধাপ। যখন তখন এন্টারোভায়োফর্ম, কুইক্সালিন, মেক্সাফর্ম অথবা এ জাতীয় ওষুধ সেবন আমাশয়ের চিকিৎসা নয় বরং ঘোর অমানিশা।

গর্ভবতী মায়ের জন্য

একদিকে যেমন নতুন নতুন ওষুধের সংখ্যা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব হচ্ছে। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন রোগ নির্ণয়ের মান উন্নয়নের ফলে অথবা রোগ নির্ণয়ে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অনেক রোগ এখন আমরা সঠিকভাবে নির্ণয়ে সক্ষম। এটা বহুলাংশে সত্য হলেও সম্পূর্ণভাবে নতুন রোগের আবির্ভাব অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন কারণে এগুলোর উৎপত্তি হতে পারে। যে ওষুধ রোগ প্রতিকার বা উপশমের জন্য তৈরী সে ওষুধ কোন কোন ক্ষেত্রে অসুখ সৃষ্টি করতে পারে।

কাজেই ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে চিকিৎসককে সদা-সর্বদা এই বিষয়ে অবশ্যই সজাগ থাকতে হয়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল না থাকলে রোগীর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।

এই প্রবন্ধে আমরা গর্ভাবস্থায় ওষুধের ব্যবহার সম্বন্ধে দৃষ্টি আর্কষণ করব। এককালে গর্ভবতী মা এবং ভ্রূণকে এককভাবে বিচার করা হত। অসুখ এবং ওষুধ দু'টোর বেলায় এদেরকে আলাদাভাবে দেখা হত না। পরবর্তীকালে দেখা গেছে রুবেলা বা জার্মান মিজেল্স্ যেটা মোটামুটিভাবে অতি সাধারণ রোগ এবং সেরে যায়, গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে কোন মহিলার এ রোগ হলে শিশুর এক ধরনের হৃদ্‌রোগ হতে পারে।

সারা বিশ্বে আলোড়নসৃষ্টিকারী থেলিডোমাইড আপাতদৃষ্টিতে মায়ের পক্ষে ক্ষতিকর না হলেও গর্ভাবস্থায় এটা সেবনের ফলে শত শত বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়েছে। গর্ভাবস্থায় ওষুধ প্রয়োগে সতর্কীকরণ থেলিডোমাইডের কুফল আবিষ্কারের ফলশ্রুতি। বিকলাঙ্গ কিংবা বিভিন্ন রোগ বা রোগসমষ্টি নিয়ে নবজাত শিশু যেন জন্মগ্রহণ না করে, মাতৃত্বের প্রত্যাশা যাতে প্রবঞ্চিত না হয়, সে উদ্দেশ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন ওষুধের ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া অবহিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগের কুফলের একটা তালিকা নিচে দেয়া

হয়েছে। যদিও এই তালিকা সম্পূর্ণ বলে দাবি করা যায় না, তবুও এটা অনেকাংশে সহায়ক হবে এই বিশ্বাস রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে। গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে যখন ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ হতে থাকে তখনই বিপদজনক সময়। আগে উল্লিখিত জার্মান মিজেল্‌স্ গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে হলে শিশুর হৃৎপিণ্ডে ত্রুটি হতে পারে। এই বিশেষ সময়ে বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করলে নানাবিধ কুফলও পরিলক্ষিত হয়।

গর্ভাবস্থায় ক্ষতিকর ওষুধের প্রয়োগের ফলে ভ্রূণের আকার-আকৃতিতে, গঠনে, স্নায়ুতন্ত্রে এমনকি পরবর্তীতে মানসিক বিকাশেও বিকৃতি ঘটতে পারে। শুধু তাই নয়, এমন বহু ওষুধও আছে যা সেবনে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের স্বাভাবিক গঠনপ্রণালী পরিবর্তিত হয়ে নানাবিধ বিকট আকৃতিবিশিষ্ট শিশুরও জন্ম ঘটাতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে এগুলো গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক মাসে হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়েও অনেক ওষুধের ক্ষেত্রে শিশু নিরাপদ নয়। প্রথম তিন মাসে যেমন ভ্রূণের বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়, কুফল দেখা যায়, তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে ভ্রূণের গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ওষুধের বিষক্রিয়ার ফলে নানা রকমের জটিলতা দেখা দিতে পারে। ওষুধ সেবনের পর প্লেসেন্টার মাধ্যমে তা গর্ভস্থ শিশুর শরীরে প্রবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে মা এবং শিশুর রক্তে এ ওষুধের পরিমাণ প্রায় কাছাকাছি হয়ে পড়ে। অথচ এই ওষুধের নিষ্কাশন ক্ষমতা মায়ের তুলনায় শিশুর অনেক কম বলে রক্তে ওষুধের পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফলে বিভিন্ন দেহতন্ত্রে নানা ধরনের ব্যাঘাত ঘটে। মোটামুটিভাবে গর্ভাবস্থায় ওষুধের বিষক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটা টেরাটোজেনিক অর্থাৎ বিভিন্ন দেহতন্ত্র এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে নানা ধরনের ত্রুটি দেখা দেয় এবং যা গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে কোন-কোন ওষুধ প্রয়োগে পরিলক্ষিত হয়।

আর দ্বিতীয়টা হল শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দেহতন্ত্র গঠনের পর অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ে ওষুধ সেবনের ফলে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশুর দেহে বিভিন্ন বিষক্রিয়া। সব ওষুধে এ-সমস্ত কুফল পরিলক্ষিত হয় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে এই কুফল প্রমাণিত হয়। আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে এগুলো সন্দেহের অতীত নয়। আসল কথা হল গর্ভাবস্থায় যে ওষুধ নিঃসন্দেহে নিরাপদ নয়, সেগুলো ব্যবহার করা কিছুতেই উচিত নয়।

যে সমস্ত সাধারণ ওষুধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং প্রাণবিকৃতকরণ করে (টেরাটোজেনিক) বলে প্রমাণিত তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেয়া হল :

	ওষুধ	পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	প্রাণবিকৃতকরণ (টেরাটোজেনিক)
১.	জোলাপ জাতীয় ওষুধ :	অসময়ে জরায়ুর সঙ্কোচনের ফলে রক্তক্ষরণ এমনকি গর্ভপাতও হতে পারে	
২	সালফনামাইড (Sulphonamide) এবং এই জাতীয় ওষুধ :	গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের পাণ্ডুরোগ দেখা দিতে পারে	পাণ্ডুরোগের জন্যে এবং পরবর্তীকালে নবজাত শিশুর মগজেও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে
৩.	ইন্‌ডেরাল (Inderal) জাতীয় উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ :	নবজাত শিশুর রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায় ও হৃৎস্পন্দন-মাত্রা কমে যেতে পারে	
৪.	থায়াজাইড (Thiazide) জাতীয় প্রস্রাব বাড়ানর ওষুধ :	রক্তের জলীয় অংশ কমে যায় ও মাতৃগর্ভে রক্ত প্রবাহ কমে যায়	নবজাতকের রক্তক্ষরণ হতে পারে
৫.	উচ্চ রক্তচাপে ব্যবহৃত ওষুধ : রিসারপিন (Reserpin)	নবজাতকের ঝিমুনি, নাক-বন্ধ ভাব	
৬.	কফ্ সিরাপ বা মিক্সচার (যার মধ্যে	নবজাতকের Thyroid hormone-এর	

Iodine জাতীয় অংশ রয়েছে :	স্বল্পতা	
৭. মৃগীরোগের ওষুধ (Phenytoin, Phenobarbitone) :	নবজাতকের রক্তক্ষরণের প্রবণতা	জন্মগত বিকলাঙ্গতা
৮. এসপিরিন (Aspirin) জাতীয় ওষুধ (Aspirin, Indome-hacin, Naproxen) :	নবজাতকের রক্ত–ক্ষরণের প্রবণতা ও পাণ্ডুরোগ। প্রসবকাল দীর্ঘায়িত হয় ও মায়ের রক্তক্ষরণ প্রবণতা (গর্ভকালীন শেষ কয়েক সপ্তাহ এই ওষুধ অবশ্যই পরিহার করা উচিত)	ফুসফুসে উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি
৯. ঘুমের ওষুধ :	নবজাতকের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়, ঝিমুনি ও শারীরিক অসাড়তা	
১০. স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) :	মা ও নবজাতকের শ্রবণশক্তি কমে যায় ও শারীরিক ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন ঘটায়	শ্রবণশক্তি কমে যায়
১১. টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline) টেরামাইসিন জাতীয় ওষুধ :	মায়ের যকৃতের ক্ষতি করে, শিশুদের দাঁতের রং বিকৃত করে	

১২. ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol) :	কোন-কোন নবজাতকের প্রাণসংশয় দেখা দিতে পারে (Gray baby syndrome)	
১৩. ম্যালেরিয়ায় ব্যবহৃত ওষুধ (Quinine, Primaquine, Pyrimethamine) :	নবজাতকের লোহিত কণিকা ধ্বংস হতে পারে	বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে
১৪. Steroid, যেমন Prednisolone ও এই জাতীয় ওষুধ :	এড্‌রেনাল গ্রন্থির কার্যকারিতা হ্রাস পায়	
১৫. সেক্স হরমোন (Sex hormone) :	নবজাতক কন্যাশিশুর পুরুষ আকৃতির বহিঃ-প্রকাশ এবং যৌননালীতে ক্যান্সার হতে পারে।	
১৬. জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি		নবজাতকের প্রাণবিকৃতকরণ করতে পারে

অতি প্রিয় অথচ অপ্রয়োজনীয়

বাজারে প্রায় সব দোকানে বেশ কয়েকটি ওষুধ প্রচুর পরিমাণে মজুদ থাকতে দেখা যায়। এগুলোর চাহিদা অনেক। তাই এত কদর। অন্ধ বিশ্বাসের উপর এগুলোর ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলো নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, এমনকি কোন-কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। এখন এগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ধরনের সবক'টি ওষুধ লিপিবদ্ধ করে পর্যালোচনা করা এখানে সম্ভব নয় বলে কয়েকটি বাছাই করে নেয়া হল :

ডিজিপ্লেক্স

ভিটামিন বি১২-সহ বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন ও ডায়াসটেজ এনজাইমের সংমিশ্রণে এই ওষুধ প্রস্তুত করা হয়েছে। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ফলে এই ওষুধ বাজারে খুবই চালু। কিন্তু এইসমস্ত প্রচারে চিকিৎসক ও ক্রেতাদের ভুল তথ্য দেয়া হয়। তরল অবস্থায় ডায়াসটেজ-এর স্থায়িত্বকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চ্যালেঞ্জ করার পর ডায়াসটেজ টেবলেট আকারে দেয়া শুরু হয়। তবে টেবলেট অবস্থায়ও ডায়াসটেজ-এর কার্যকারিতা প্রায়ই থাকে না। বিজ্ঞাপনে যেসব দাবি করা হয় তার কোনটাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। প্রস্তুতকারক ফাইসন্স কোম্পানীর নিজ দেশে ওষুধটি নিষিদ্ধ। অথচ এদেশে বাজারজাত করে এই অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লাভের পাহাড় গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার ক্ষতিকর।

গ্রাইপ ওয়াটার

কিছুটা মদ, খাবার সোডা, সরবত ও সুগন্ধি-সহযোগে এই ওষুধ প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, বাচ্চাদের বৃহদন্ত্রের নার্ভগুলোর সাময়িক অপরিপূর্ণতার কারণে কখনো-কখনো বৃহদন্ত্রের অস্বস্তিকর নড়াচড়ার ফলে বাচ্চা কেঁদে উঠে। বাচ্চাকে

কোলে নিলে কান্না আপনিই থেমে যায়, এর জন্য ওষুধের প্রয়োজন নেই। এই ওষুধে খাবার সোডা থাকার কারণে নিয়মিত ব্যবহার করলে মিল্ক-এ্যালকালী সিনড্রোম, বৃক্কের (কিডনীর) ক্ষতি ও প্রস্রাবের গণ্ডগোল হতে পারে। অথচ চটকদার বিজ্ঞাপনের দ্বারা মা ও ডাক্তাররা এই ওষুধের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ওষুধ একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় ও অর্থ অপব্যয়কারী, অন্যদিকে এটা ক্ষতিকরও। ক্রেতাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এই ওষুধের মাধ্যমেও প্রচুর মুনাফা করা হচ্ছে।

মিনোলাড

এই ওষুধ গ্লিসারোফসফেট, খনিজ পদার্থ ও মালটি-ভিটামিন সহযোগে প্রস্তুত। অপ্রয়োজনীয় পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অতিরিক্ত মূল্য নেয়া হয়। দেশী কোম্পানীকে বাজার থেকে সরিয়ে রাখার একটা অপচেষ্টা।

ডেকাটোন কেপসুল

ভিটামিন, লোহা, হরমোন ও এনজাইম সংমিশ্রণে এই ওষুধ তৈরি করা হয়েছে। হরমোন সংযোজনের ব্যাপারটাও অদ্ভুত, কারণ পুরুষ ও স্ত্রী — দুই জাতীয় হরমোনই দেয়া হয়েছে। পুরুষেরা স্ত্রী হরমোন কেন খাবেন এর কোন ব্যাখ্যা কোম্পানী দেয় না। এই সংমিশ্রণের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই। লিঙ্গান্তর ঘটলে কে দায়ী হবে? ক্রেতা, চিকিৎসক, না ওষুধ কোম্পানী? বাংলাদেশে ইদানীং এত লিঙ্গান্তর ঘটার জন্য এসব ওষুধের অবদান কতটুকু? লিঙ্গান্তর ঘটলে যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় তার দায়িত্ব কি কোম্পানী নিতে রাজি আছে? ওষুধটি বৃদ্ধদের জন্য এবং যৌনশক্তি বাড়ায় বলে দাবি করা হয়, কিন্তু এর কার্যকারিতার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। বরং স্ত্রী-হরমোন থাকাতে পুরুষের যৌনশক্তি আরও কমে যায়। পুরুষত্বহীনতা ও নির্বীর্যতা হতে পারে। এভাবে ফাঁকি দিয়ে মুনাফা উপার্জন করা নৈতিকতা-হীনতার পরিচায়ক। কাজেই এই ওষুধটি শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে।

মিনাডেক্স সিরাপ

খনিজ পদার্থ ও বিভিন্ন ভিটামিনের সংযোগে প্রস্তুত এই ওষুধ অপ্রয়োজনীয়। অতিরিক্ত ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ শরীরের ক্ষতিসাধন করতে পারে। অথচ এই

অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থের জন্য ক্রেতাকে চড়া মূল্য দিতে হয়। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন আমরা শাকসবজির দ্বারাই মিটাতে পারি।

প্যারাপাইরিন টেবলেট

বেদনা-নিবারক কয়েকটি উপাদানের সংযোজনে এই ওষুধ প্রস্তুত। বেদনা-নাশক যে কোন একটি উপাদান যে কাজ করে, কয়েকটির সংমিশ্রণে তার কার্যকারিতা বাড়ে না। বরঞ্চ একাধিক রাসায়নিক পদার্থ সেবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়।

নোভালজিন টেবলেট

এই বেদনা-নাশক ওষুধের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কথা এখন প্রমাণিত। এটি এতই ক্ষতিকর যে পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশেই এটা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশেও এটা আগে একবার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই ওষুধের বহু বিকল্প ওষুধ, যেগুলোর নোভালজিনের মতো বিষক্রিয়া নেই, বাজারে পাওয়া যায়।

ফেস্টাল ড্রাগিস

নানাপ্রকার এনজাইম ও অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে এই ওষুধ প্রস্তুত। এই ধরনের সংমিশ্রণ অপ্রয়োজনীয়। নিয়মিত ব্যবহার করলে স্বাভাবিক পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়, ওষুধটির উপর নির্ভরশীলতা বাড়ায় এবং শরীরের পরিপাকতন্ত্রকে পঙ্গু করে। কোন-কোন অসুখে এই ওষুধের একটি উপাদান কাজে লাগতে পারে, সেজন্য অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বাদ দিয়ে নতুন ফর্মুলা জমা দিতে বলা হয়েছে।

মিক্সোজেন টেবলেট

মেয়েদের ব্যবহারের জন্য হরমোনজাতীয় ওষুধ। প্রচুর অপব্যবহার করা হয়। অথচ অপব্যবহারে ক্যান্সার হতে পারে, একথা প্রমাণিত। ওষুধটিতে পুরুষ হরমোন আছে। পুরুষ হরমোন ব্যবহার মেয়েদের জন্য ক্ষতিকর। এতে মেয়েদের শরীরে পুরুষালী লক্ষণ (ভিরিলাইজেশন) দেখা দিতে পারে, এমনকি লিঙ্গান্তর পর্যন্ত ঘটতে পারে। ক্ষতিকর পুরুষ হরমোনটি বাদ দিয়ে নতুন ফর্মুলা জমা দিতে বলা হয়েছে।

ফেনসিডিল কফ্ লিঙ্কটাস

কাশির জন্য এই ওষুধ ব্যবহারের উপদেশ দেয়া হয়, অথচ এর কার্যকারিতার কোন প্রমাণিত তথ্য নেই। এই ওষুধে নেশা উদ্রেককারী পদার্থ রয়েছে। নেশার জন্য এই ওষুধের ব্যবহার সুবিদিত।

বিকোসুলস কেপসুল/বিকোনেক্স সিরাপ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই ওষুধের ব্যবহার সাধারণ মানুষের অর্থের অপব্যয়েরই নামান্তর।

বিকোনেক্স এইচ.পি.ইন্‌জেক্‌শন

এতে বিভিন্ন ভিটামিনের অনাবশ্যক অধিক মাত্রা দেয়া আছে। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও অকারণে অর্থের অপচয় ঘটায়।

ভিব্রামাইসিন সিরাপ

এই ওষুধ টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের। বাচ্চাদের জন্য অসম্ভব ক্ষতিকর। এই ওষুধ সেবনে বাচ্চাদের দাঁত ও নখ কালো হয়ে যেতে পারে এবং হাড় ও শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ওষুধ গর্ভবতী মায়েদের খাওয়া নিষেধ। কারণ বিকলাঙ্গ বা দু'মাথা, তিন হাত ইত্যাদি ধরনের অদ্ভুত শিশু জন্ম নিতে পারে।

পলিটামিন টনিক

ওষুধের মোড়কে সবচেয়ে বেশি বিক্রীত মদগুলির একটি। এ দেশে খাবার পানির অভাবের কথা মনে করেই হয়ত কোম্পানী পানির বদলে মানুষকে মদ সেবন করায়। পালোয়ানের ছবি মোড়কে লাগিয়ে এই ওষুধ খেতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। অথচ ওষুধ এই অজুহাতে প্রকাশ্যে মদ বিক্রির জন্য সরকারকে আবগারী করও দিতে হয় না। ওষুধ হিসেবে চালাবার জন্য কয়েক পয়সার ভিটামিন মিশিয়ে কোম্পানী প্রচুর মুনাফা লুটছে। দেশের লোকদের নেশাগ্রস্ত করার প্রচেষ্টায় এই ওষুধটি অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছিল। কোম্পানীটি শুঁড়িখানা না ওষুধ কোম্পানী এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে আসে।

ভারডিভিটন এলিক্সির

সবুজ রঙ–এর মদ। আবগারী কর ফাঁকি দিয়ে ওষুধ হিসেবে চালানর জন্য কিছু ভিটামিন মিশিয়ে দেয়া হয়েছে যা অতি পরিচিত কৌশল। ওষুধ হিসেবে অপ্রয়োজনীয় তো বটেই বরং মদ ব্যবহারে স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হতে পারে, বিশেষতঃ যকৃতের (লিভার)। এই ওষুধ বিক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানী যেমন একদিকে প্রভূত লাভ করছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে।

অরাবোলিন ড্রপস

এই হরমোনজাতীয় ওষুধ বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শরীরের গঠন বৃদ্ধি করে বলে প্রচারিত। সাময়িকভাবে বাচ্চাদের শরীরের বৃদ্ধি ঘটালেও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে এই ওষুধ শেষ পর্যন্ত ব্যাহত করে। ফলে পূর্ণ বয়সে যে বাচ্চা এই ওষুধ ব্যবহার করেছে তার বৃদ্ধি স্বাভাবিকের চাইতে কম থাকে। উপরন্তু, হরমোনজাতীয় পদার্থের প্রয়োগে শোথ, লিভারের টিউমার, ভিরিলাইজেশন অর্থাৎ মেয়েদের শরীরে পুরুষালী লক্ষণ ইত্যাদি অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে, যেগুলোর সম্পর্কে সাবধানতা এই কোম্পানী উন্নত দেশগুলোতে দিলেও, আমাদের দেশের চিকিৎসকদের জানায় না। বাচ্চাদের জন্য অতি চমৎকার ওষুধ, এ কথা বলে প্রচার চালান হচ্ছে। এইভাবে ব্যবসার নামে জালিয়াতি করে প্রচুর মুনাফা লুটছে।

যা না হলে চলে

অনেক রোগই বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সে-ক্ষেত্রে চড়া মাশুল দিতে হচ্ছে। সেসব দেশের অর্থসম্পদ সীমিত হওয়ার কারণে বাজেটে রোগ-প্রতিরোধ ও চিকিৎসা খাতে এক নগণ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকে। এর ফলে শুধু রোগীর শুশ্রূষাই নয় বরং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাও বিঘ্নিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে জনসংখ্যা সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে-ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। চাহিদা ও সম্পদের অসমতা দ্রুত বেড়েছে বলে মৃত্যুহারও বেড়েছে, ফল দাঁড়িয়েছে প্রজনন ক্ষমতাও বেড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাংলাদেশে মৃত্যুহার যেমন, জন্মবৃদ্ধির হারও কোন অংশে কম নয়। জন্ম এবং মৃত্যুর হার যদি জনসংখ্যার পরিবৃত্তির মাধ্যমে **(Demographic transition)** কমিয়ে আনা না যায় তাহলে জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধাসহ সর্বক্ষেত্রে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে।

নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত আমরা। দেশের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য আজও আমাদের রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করতে হয়। এ সমস্যা শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন প্রযোজ্য, আমাদের দেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধের বেলায়ও একইভাবে প্রযোজ্য।

আমরা বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কথা না ভেবে ঐতিহ্যের মতো পুরনো ধারণা আঁকড়ে ধরে আছি। উন্নত দেশের অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যক্ত কিংবা নিষিদ্ধ সামগ্রী আমদানিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা কোন জাতির জন্যই শোভন নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে অনেক উন্নত দেশই উন্নয়নশীল দেশের এ ধরনের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের অবৈজ্ঞানিক রদ্দি মালের বিশ্বস্ত ক্রেতা হিসেবে আমাদেরকে ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের ইচ্ছাকৃত অপরাধ দমনের জন্য জাতিসমূহের কমিটির মধ্যে এমন কোন নৈতিক বা আইনগত বিধিনিষেধ দুর্ভাগ্যবশতঃ নেই। মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সুখ নিয়ে যে জঘন্য পাপ-ব্যবসা চলছে

তার হুবহু চিত্র তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। চিকিৎসা পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তি ও হতভাগ্য ক্রেতাদের জন্য কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উল্লেখ না করে পারছি না।

নিকেথেমাইড

বিত্তহীন অসংখ্য লোক পরম নিশ্চিন্তে নিকেথেমাইড (কোরামিন) গলাধঃকরণ করে চলেছেন। অনেক সময় অবিবাহিতা (বিবাহিতাও হতে পারেন) মহিলার এ ধরনের উক্তি শোনা মোটেও বিচিত্র নয়, 'ডাক্তার সাহেব, আমার প্রায়ই মাথা ঘোরে, অস্থির লাগে, অস্বস্তিবোধ হয় আর অসুস্থ হয়ে পড়ি। জিভে দু'-তিন ফোঁটা কোরামিন দিলে সাথে-সাথে ভাল লাগে। এটা আমি দু'-তিন বছর যাবৎ চালিয়ে যাচ্ছি ; কেননা আমার ডাক্তার বলেছেন, আমার হার্ট নাকি দুর্বল, আর এই দুর্বলতার জন্য এটা খুব উন্নতমানের টনিক।'

এবার এই উক্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যাক। যদি আমরা কোন ওষুধ মুখে পুরে গিলে ফেলি তখন তা শরীরের ভেতরে যাবে, সঞ্চলনে পৌঁছবে, তারপর রক্ত-লেভেল অর্জন করবে। প্রতিটি ওষুধের রক্ত-লেভেল অর্জন করার একটি অনুকূল মাত্রা আছে।

দু'-তিন ফোঁটা কোরামিন জিভে দেয়ার সাথে-সাথে এই মহিলা ভাল বোধ করেন বলে জানিয়েছেন। প্রথমতঃ, দু'ফোঁটা কোরামিন কখনও পর্যাপ্ত মাত্রা হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এটা পর্যাপ্ত মাত্রা হলেও সরাসরি ইন্‌জেক্‌শনের সাহায্যে প্রয়োগ করা ছাড়া কার্যকরী হতে পারে না। সুতরাং এই বিখ্যাত হার্ট টনিকের কার্যকারিতার পিছনে বিশ্বাস ছাড়া কোথাও কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই। ভেষজবিদ্যায় এটা হল শ্বাসীয় উত্তেজক এবং হৃৎপিণ্ডে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। এছাড়া সংবহন উত্তেজক হিসেবে এর ব্যবহারেরও কোন ভিত্তি নেই।

সায়ানোকোবলামাইন (সাইটামেন, রেডিসল)

এটা হল ভিটামিন বি১২। ভিটামিন বি১২ খাবার পর শোষিত হবার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদানের আবশ্যক। এই উপাদান পাকস্থলী তৈরি করে। এর অনুপস্থিতির কারণেই ভিটামিন বি১২-র অভাব হয়। এবং সেইজন্য এক বিশেষ ক্ষতিকর রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এ কথা ঠিক যে এই ক্ষতিকর রক্তাল্পতায়

আরোগ্য এনে দেয় কেবলমাত্র ভিটামিন বি১২, অন্যকিছু নয়। কাজেই পাকস্থলীর এই অপরিহার্য উপাদানের অভাব ঘটলে কেবলমাত্র অনান্ত্রিক (**Parenteral**) পথেই ভিটামিন বি১২ গ্রহণ সঙ্গত।

কিন্তু ব্যবস্থাপত্রদানকারীরা কি সত্যি জানেন যে বাংলাদেশে এই ক্ষতিকর রক্তাল্পতার মাত্র একজন প্রকৃত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে?

তাই যে-কোন ধরনের রক্তাল্পতায় রোগীর ব্যবস্থাপত্রে ভিটামিন বি১২ দেয়ার কোন বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আছে কি?

ক্যান্সারের জন্য পাকস্থলীর সম্পূর্ণ অপসারণের ফলে অপরিহার্য উপাদানের অভাবহেতু ভিটামিন বি১২-র ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এটা তেমন প্রয়োজনীয় নয় কারণ যকৃতে জমা হয়ে থাকা ভিটামিন বি১২ পাঁচ-ছ' বছর পর্যন্ত এর অভাব পূরণ করতে পারে। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে পাকস্থলী অপসারণের পর শতকরা মাত্র দশজন রোগী সর্বাধিক পাঁচ বছর বেঁচে থাকেন।

ভিটামিন বি১২-র দৈনিক চাহিদা হচ্ছে ২-৩ মাইক্রোগ্রাম। পশুর যকৃৎ, বৃক্ক (কিডনী), গোশ্‌ত, দুধ, পনির, মাছ ও ডিমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি১২ পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক চাহিদা এত অল্প যে, কদাচিৎ ভিটামিন বি১২ স্বল্পতা দেখা যায়।

প্রান্তিক স্নায়ুরোগ (**Peripheral neuropathy**)-এর জন্য ভিটামিন বি১২ দেয়া হয়। এটি সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক এবং এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তথাকথিত টনিকে ভিটামিন বি১২-র অন্তর্ভুক্তির জন্য দাম দিতে হয় বেশি অথচ উপকার নেই।

ফিতা কৃমির দরুন ভিটামিন বি১২-র ঘাটতি পৃথিবীর এই অংশে দেখা যায়নি। আমাদের দেশে মেগালো ব্লাস্টিক নামের রক্তাল্পতার প্রধান কারণ গর্ভধারণ ও অশোষণ (**Malabsorption**)। এসব ক্ষেত্রে ফোলিক এসিড স্বল্পতাই মূল কারণ। যেখানে পরীক্ষাগার নেই সেখানে রক্তাল্পতার জন্য লৌহ ও ফোলিক এসিড-এর ব্যবস্থাপত্র দেয়ার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। মুখ দিয়ে কিংবা ত্বক, পেশী বা শিরার মধ্যে উচ্চ অথবা কম মাত্রায় ভিটামিন বি১২ অনুপ্রবেশ করানর ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং অবৈজ্ঞানিক। এই ভিটামিনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এত গভীর যে এর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সাধারণ লোকদের, সাংবাদিকদের এবং কিছু-কিছু ডাক্তারদের বুঝাতে সময় লাগবে। এটা কি খুবই হাসির ব্যাপার নয় যে, কখনও-কখনও ভিটামিন বি১২-কে ব্যবস্থাপত্রে ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক হিসেবে উল্লেখ করা হয়?

ভিটামিন সি

পূর্ণবয়স্ক একজন ব্যক্তির জন্য ভিটামিন সি-এর প্রাত্যহিক চাহিদা গড়ে ৪৫ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলার ৬০ মিলিগ্রাম। টকজাতীয় ফল যেমন : লেবু, কমলা, টমাটো, কামরাঙ্গা, আমলকী এবং সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি বর্তমান। এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো দাঁতের মাড়ি ফোলা ও রক্তক্ষরণ, কেরাটোটিকাধিক (**Hyperkeratotic**) কেশগ্রন্থি। পরবর্তী লক্ষণসমূহ হল মাংশপেশীর প্রচণ্ড মোচড়, শরীরের বিভিন্ন জোড়া ফুলে যাওয়া, রক্তক্ষরণপ্রবণতা, রক্তাল্পতা, দাঁত নড়া বা পড়ে যাওয়া।

মারাত্মক সংক্রমণ, ক্ষত, হাড়ভাঙ্গা এবং পোড়া ক্ষত নিরাময় এবং বিশেষ করে স্কার্ভি রোগের জন্য এই ভিটামিন খুবই কার্যকরী। বর্তমানে যে মাত্রায় এটা ব্যবহার করা হচ্ছে তা খুবই বেশি। সাধারণতঃ প্রাত্যহিক ১০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি-সহ নিত্যদিনের খাবার খেলে দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়। কারণ শরীরে ঘাটতি অবস্থায় ওষুধের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়।

সাধারণ সর্দির চিকিৎসায় ভিটামিন সি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যদিও এই রোগে এর কার্যকারিতা কখনও প্রমাণিত হয়নি। এছাড়া দীর্ঘদিন ভিটামিন সি গ্রহণের ফলে মূত্রাশয়ে যে পাথর হতে পারে সে খবর এখন পর্যন্ত অনেক চিকিৎসকেরই জানা নেই।

মেগাভিটামিন চিকিৎসা

বিশুদ্ধ অথবা কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রস্তুত ভিটামিনের চেয়ে নানান ভিটামিনের 'অশোধিত' উৎসগুলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে বেশি কার্যকর হয়ে থাকে। বিশেষ ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট গুরুতর অবস্থায় 'বিশুদ্ধ' ভিটামিন দেয়া প্রয়োজন। বহুবিধ ভিটামিন-স্বল্পতার জন্য বিশুদ্ধ ভিটামিন ব্যবহার অবস্থার উন্নতি না করে অবনতি ঘটাবে।

ভিটামিন-স্বল্পতার চিকিৎসা হচ্ছে পর্যাপ্ত সুষম, আমিষ ও ভিটামিন গ্রহণ। সাধারণভাবে যে পরিমাণ ভিটামিনের প্রাত্যহিক প্রয়োজন চিকিৎসার ক্ষেত্রে সে পরিমাণের পাঁচ-দশগুণ বেশি গ্রহণ করতে হয়।

ব্যবস্থাপত্রে দেয়া বিশুদ্ধ ভিটামিন অনেক ক্ষেত্রে অশোধিত ভিটামিনের চেয়ে কম কার্যকর হয়। বিশুদ্ধকরণে কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান সরিয়ে ফেলা কিংবা

গুণাগুণ নষ্ট হওয়া অমূলক নয়। সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে।

কতগুলো ভিটামিন যেমন এ, ডি, কে এবং নিয়াসিন–এর অধিক মাত্রা বিষাক্ত (Toxic) এবং দীর্ঘদিন ধরে এগুলো গ্রহণ করা হলে অসুস্থ হবার আশঙ্কা থাকে। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই অনির্ণীত ব্যাধির জন্য তথাকথিত জনপ্রিয় মেগাভিটামিন চিকিৎসা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয় বরং বিপদজনকও বটে।

ভিটামিন চিকিৎসার বিপদ

ভিটামিন 'এ' যদি ছ'মাস বা তারও বেশি সময় ধরে ৭৫০০ একক খাওয়া হয় তবে বিশেষ করে শিশুদের ভিটামিন 'এ' আধিক্য (Hypervitaminosis) হয়। অরুচি ও ওজনহীনতা, যকৃৎ বৃদ্ধি, রক্তে ক্যালসিয়ামাধিক্য, প্লীহা বৃদ্ধি, রক্তাল্পতা এবং নানাবিধ স্নায়বিক গোলযোগ দেখা দেয়।

প্রতিদিন কম করে ৫০০ একক ভিটামিন ডি দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে ভিটামিন ডি আধিক্য হয়। এ থেকে বৃক্কের (কিডনীর) ক্ষতি এবং ক্যালসিয়ামের স্থানান্তরে সঞ্চয়ন (Metastatic calcification) রোগ হয়।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কে (কে^{৩} মেনাডিওন থেকে আহরিত) ছোট শিশু বিশেষ করে নবজাতকদের বেশি মাত্রায় দিলে হেমোলিটিক রক্তাল্পতা হয়, পিত্তরঞ্জনাধিক্য ঘটে (Hyperbilirubinaemia) ও যকৃৎ বৃদ্ধি হয়। বড়দের G-6 PD স্বল্পতাজনিত কারণে এই ভিটামিন হেমোলিটিক প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

শুধুমাত্র পথ্যের অভাবজনিত কারণে ভিটামিন কে স্বল্পতা হয় না বললেই চলে। এন্টিবায়োটিক কিংবা অশোষণীয় সালফোনামাইড দিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করলে তা ভিটামিন কে–র অণুজীব সংশ্লেষণকে (Micro-organism synthesis) বাধা দেয়, সেখানে ভিটামিন কে স্বল্পতা দেখা দিতে পারে।

দীর্ঘদিন অধিক মাত্রায় ভিটামিন সি গ্রহণের দরুন বিপদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

গ্লিসারোফসফেট এবং লেসিথিন

খুবই জনপ্রিয় স্নায়ু টনিক (যেমন বিজিফস, নিউরোপ্লেক্স, নিরোলেসিথিন, নিউরনস ইত্যাদি) নাকি খুব কাজের এবং বিভিন্ন গ্লিসারোফসফেট এবং লেসিথিন

জীবনীশক্তি, স্মৃতিশক্তি এমনকি বুদ্ধিমত্তার জন্য উপকারী ওষুধ বলে দাবি করা হয়। বিভিন্ন ধরনের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন অধিকাংশ রোগীকেই বিপথে নিতে পারে, যত না নিচ্ছে জ্ঞানহীন চিকিৎসক। এসব টনিকের দাম অনেক বেশি। যেমন দশ থেকে কুড়ি আউন্স পরিমাণ ওষুধের দাম সত্তর থেকে আশি টাকা। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব ওষুধ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

লিউইস ফার্মাকোলজী থেকে উদ্ধৃত করা যায় : 'তথাকথিত টনিকের (শারীরবৃত্তে যার কোন বলকারক ক্ষমতা নেই) সাধারণ লোক ও গৃহচিকিৎসকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা, সেই সব টনিকের তিক্ত সুরাবিশেষের উপর নির্ভর করে। তাদের অন্যান্য উপাদান যেমন গ্লিসারোফসফেট, লৌহ, ভিটামিন এবং যকৃৎ-নির্যাস প্রভৃতি কোনরূপ সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই জুড়ে দেয়া হয়। তথাকথিত 'নিউরোফসফেট' কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন উপকারে আসে না।'

রেচক (লাক্সাটিভ)

রক্তক্ষরণের মতো বিরেচন (**Purgation**) এককালে জনপ্রিয় ও মারাত্মক চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল। সাময়িক বিশেষ অবস্থায় যেমন : আফিম-ঘটিত ওষুধ সেবনের আগে কোষ্ঠকাঠিন্য উপশমের জন্য কিংবা অপারেশনের পর বা অর্শ রোগীর রক্তক্ষরণের সময় মল নরম রাখার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বর্তমানে রেচক দিয়ে থাকেন।

অনেকে মনে করেন, স্বাভাবিক মলত্যাগের অভ্যাস অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। অনেকে আবার স্ববিষক্রিয়ার (**Autointoxication**) ধারণায় ভুগেন বলে স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মলত্যাগ করেন। মলত্যাগ করাটা সর্বাগ্রে করণীয় কর্ম বলে অনেকে এক ধরনের বিকারে ভুগেন, যদিও সংখ্যার ব্যাপারে তাঁরা মোটেই মাথা ঘামান না।

রেচকের ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। মলান্ত্রে মল আবার ভরে না উঠা পর্যন্ত রেচকের সাহায্যে মলত্যাগের পর থেকে পরবর্তী বেগ না আসার মধ্যে বিরতি থাকতে হবে। যদি কারও কাছে এই বিরতি খুব দীর্ঘ মনে হয়, তবে অউদ্দীপিত বেগ আসার জন্য অপেক্ষা না করে রেচক পুনরায় গ্রহণ করতে পারেন। অনির্দিষ্টভাবে এই আবর্তনের পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

কোন কোন চিকিৎসক প্রায়ই ভুলে যান যে, রেচক আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন

নয় যা অপ্রয়োজনীয় মল নিঃসরণ করিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু শোষণে সহায়তা করে। এটা ইলেকট্রোলাইট বিমুক্ত করে, স্বাভাবিক মলত্যাগ সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত করে এবং কঠিন কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকে বুঝেন না যে, প্রকৃতি শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিঃসরণের সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘাম, প্রস্রাব, মলত্যাগ ইত্যাদি। উত্তেজক রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানসিক কারণেই হয়। মানবিক বুদ্ধিমত্তার একটা প্রভাব তার মলত্যাগের অভ্যাসের, বিশেষ করে কোষ্ঠকাঠিন্যর উপর আছে। কিন্তু ইতর প্রাণীবিশেষের তা নেই। একথা পরিষ্কার মনে রাখা দরকার যে, প্রতিদিন মলত্যাগ সর্বজনীন নয়। এটাও অজানা নয় যে, বহু লোক সপ্তাহে, দু'সপ্তাহে এমন কি তারও বেশি সময় পরে মলত্যাগ করে থাকেন।

আমিষাম্ল (Amino acid) এবং এনজাইম

যে-সব রোগে এই দু'টি গ্রুপে প্রস্তুত ওষুধ ব্যবহৃত হয় বলে দেখা যায়, বদহজম তার শীর্ষে।

বিষাক্ত দ্রব্যগুলোর বিষক্রিয়া নষ্ট করা যকৃতের অন্যতম কাজ। যকৃতের পীড়ায় এবং বিশেষ করে যকৃৎ বিশুষ্কতা (Cirrhosis)-র বেলায় নানাবিধ বিষাক্ত দ্রব্য যকৃতের কার্যকরী রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়াই মস্তিষ্কে পৌঁছে যেতে পারে। যদিও মস্তিষ্ক বিষের (Cerebral intoxicants) প্রকৃতি বিতর্কিত, তবুও এমোনিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। বিভিন্ন ধরনের যকৃৎ পীড়ায় বিশেষ করে ভাইরাসজাত যকৃৎ প্রদাহ এবং যকৃৎ বিশুষ্কতায় এমিনো এসিডের কোন ভূমিকা নেই। এগুলো রক্তে এমোনিয়াম লেভেল কমায় বলে বলা হলেও এর ফলাফল ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করার পক্ষে রায় দেয় না। হেপাটোসেলুলার অবনতিতে এমিনো এসিড (যেমন মেথিওনাইন) রোগীর কাছে বিষবৎ। যকৃতে এগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না এবং প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যায়। একই রকম লিপোট্রোপস (যেমন কোলিন) মূল্যহীন এবং বিষাক্ত হতে পারে।

ক্যালসিয়াম

ক্যালসিয়াম বল ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে বলে লোকের বিশ্বাস এত গভীর যে রোগীরাই চিকিৎসককে ব্যবস্থাপত্রে ক্যালসিয়াম ইনজেক্‌শন লিখে দিতে অনুরোধ

করেন।

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, রক্তের মধ্যে (serum) ক্যালসিয়াম লেভেল বৃদ্ধি হৃৎপিণ্ডের মাংশপেশীর সঙ্কোচন বাড়িয়ে দেয় এবং নিলয়ী অসম স্পন্দন (Ventricular extrasystole) ঘটাতে পারে। বিশেষ করে যখন রোগী ডিজিটালিস নামের ওষুধ সেবনরত অবস্থায় থাকেন তখন এগুলো বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি গ্রহণের বিষক্রিয়ার ফলে অরুচি, দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও বমির উদ্রেক করতে পারে। রক্তক্ষরণজনিত বৈকল্যে ওষুধ হিসেবে ক্যালসিয়াম পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ রক্তক্ষরণের চিকিৎসায় এটা খুব বেশি ব্যবহার করা হয়।

এ প্রসঙ্গে বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যবসায়িক নামের রক্তক্ষরণ-প্রতিরোধক সম্পর্কে দু'টি কথা বলা প্রয়োজন। কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই অনেক সময় রক্তক্ষরণ ঘটে। কতক ক্ষেত্রে সংবহন নালিকা-সংক্রান্ত (Vascular) অস্বাভা-বিকতা দায়ী, অপরাপর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু যে-ভাবে এই সব রক্তক্ষরণ-প্রতিরোধক ব্যবহৃত হচ্ছে তার পিছনে বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি নেই। রক্ষক্ষরণ বিশেষ করে রক্তবমি হলে দৃঢ় আশ্বাস এবং শয্যায় থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। পাকান্ত্রিক নালী (Gastrointestinal tract) থেকে রক্তক্ষরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘা, ক্যান্সার বা স্ফীত ও প্রলম্বিত ধমনী (Varices)-র জন্য হয়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, তথাকথিত রক্তক্ষরণ-প্রতিরোধক কতটা উপকারী।

এমনিভাবে বহু ওষুধের অপব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বেশির ভাগ লোক প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে অক্ষম সেখানে মূল্যবান অথচ অপ্রয়োজনীয় এমনকি কতক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেয়া রীতিমতো পাপ। বৈজ্ঞানিক ন্যায্যতা ছাড়াও সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার কারণে ওষুধ অবশ্যই আমাদের দেশে প্রস্তুত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত উপকারী, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে। ২৮তম বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিবেশনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান পরিচালক তাঁর প্রতিবেদনে বলেন : 'উন্নত দেশগুলোর বর্তমান সমস্যা হল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার অথবা অপব্যবহারের ফলে ওষুধে অত্যধিক ব্যয়। প্রস্তুতকারীর নিজ দেশে যে-সব ওষুধ বিক্রির অনুমতি দেয়া হয় না কিংবা নিরাপত্তা অথবা কার্যকারিতার অভাবে বাজার থেকে তুলে নেয়া হয়, সে-সব ওষুধ উন্নয়নশীল দেশে

রফতানি করে ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে জোর প্রচার চালান হয়। এই রীতি শুধু বে-আইনীই নয়, নীতিবহির্গত এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।'

একথা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নত দেশে প্রস্তুত ও সেখান থেকে রফতানি করা বহু পরিত্যক্ত এমনকি বিপদজনক ওষুধ আমরা ব্যবহার করে আসছি। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দায়ী প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজ আর্থিক সামর্থ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সুযোগ দেয়া। আজকাল ব্যবস্থাপত্রে এমনও অনেক ওষুধের নাম থাকে যেগুলো পরিত্যাগ করার মতো। এগুলো পরিত্যাগ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। কাজেই আমাদের সই করা প্রতিটি ব্যবস্থাপত্র অবশ্যই সঙ্গত হতে হবে।

* নিষিদ্ধ ওষুধ

— কি ও কেন

অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই (শতকরা ৮০ ভাগ) প্রয়োজনের সময় ওষুধ পান না। অথচ বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ওষুধ আমদানি করেছে। এই অর্থ ১৯৭৯–৮০ সালের বাজেটে মোট স্বাস্থ্য খাতের ১.৭ গুণ। এত অর্থ ব্যয় করেও ব্যাপক জনসাধারণের নাগালের মধ্যে জীবনরক্ষাকারী বা প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দিতে আমাদের ব্যর্থতার কারণ কি?

যেসব ওষুধ আমাদের দেশের বাজারে চালু আছে, এদেশে ব্যবসারত বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের জরিপ থেকেই দেখা যায় তার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় অথবা ক্ষতিকর। একটি জরিপ থেকে জানা যায় যে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগই হচ্ছে ভিটামিন, আয়রন টনিক, কাশি ও ঠাণ্ডার ওষুধ। তথাকথিত টনিক, বলবর্ধক ও মোটা হবার ওষুধ, এনজাইম বা হজমকারক, এন্টাসিড ও মানসিক রোগের ওষুধ। অথচ এন্টিবায়োটিক, কৃমি ও পরজীবী–বিধ্বংসী ওষুধ ইত্যাদির উৎপাদন মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ। যদিও এগুলো এদেশের মানুষের জন্য আরও বেশি প্রয়োজন। সীমিত সম্পদের অধিকারী আমাদের দেশের পক্ষে অপচয় মারাত্মক। প্রয়োজনীয় ও জীবনরক্ষাকারী ওষুধের জন্য সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় আরও অনেক মানুষের কল্যাণ নিয়ে আসবে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসকের অপ্রতুলতার দরুন জনসমষ্টিকে বর্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত স্বাস্থ্য–পরিচর্যা দেয়া সম্ভব নয় এবং অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। কাজেই বেশির ভাগ লোককেই, বিশেষতঃ গ্রাম এলাকায়, অসুখের সময় গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসকদের পরামর্শমতো ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। অনেকেই নিজেদের পছন্দমতো ওষুধ কেনেন। ওষুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোম্পানীগুলোর অযৌক্তিক দাবি ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণার ফলে অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পিছনেই

* ১৯৮২ সালে প্রণীত ওষুধনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত।

দরিদ্র জনসাধারণ প্রভূত অর্থ ব্যয় করে থাকেন। চিকিৎসকরাও অনেক সময় প্রয়োজনীয় ওষুধের সাথে–সাথে অপ্রয়োজনীয় অথবা তেমন প্রয়োজন নয় এমন ওষুধ লেখেন। দেখা গেছে যে সীমিত অর্থের কারণে রোগী অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় ওষুধই কিনছেন, জরুরি বা জীবনরক্ষাকারী ওষুধ কিনছেন না — কারণ কোনটা বেশি প্রয়োজনীয় আর কোনটা কম প্রয়োজনীয়, তা রোগী বা তাঁর আত্মীয়স্বজনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় ওষুধ আমাদের দেশ ছাড়াও অন্যান্য কোন কোন দেশে চালু আছে। কিন্তু সেসব দেশের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য রয়েছে। সে সমস্ত দেশে ব্যক্তিগত আর্থিক সচ্ছলতা রয়েছে। ওষুধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞানও বেশি এবং প্রায় ওষুধই ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া দেয়া হয় না। আমাদের দেশে অপ্রয়োজনীয় ওষুধের জন্য অর্থ অপচয় প্রতিরোধের একমাত্র পথ হচ্ছে জনগণের নাগালের মধ্য থেকে এগুলোকে সরিয়ে নেয়া।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের ওষুধ সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলে সুবিদিত। পরিস্থিতির যথোপযুক্ত পর্যালোচনার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ পরিষদ ১৯৭৯ সালে সুপারিশ করেন যে, ব্যাপক জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় ও জীবনরক্ষাকারী ওষুধ পৌছানর পথ হচ্ছে প্রত্যেক দেশে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী একটি প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা প্রস্তুত করা এবং ওষুধের সরবরাহ এই তালিকা অনুযায়ী সীমাবদ্ধ রাখা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ পরিষদ একটি খসড়া তালিকাও প্রণয়ন করেন। উল্লেখ করা যায় বাংলাদেশে বাজারজাত অধিকাংশ ওষুধই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করার বাংলাদেশী প্রয়াস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এছাড়া বহু ওষুধ রয়েছে যেগুলোর কার্যকারিতার চেয়ে বিষক্রিয়া অনেক বেশি। এই কারণে উন্নত দেশসমূহে এই ওষুধগুলোর ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকার দরুন এই ধরনের অনেক ওষুধই আমাদের দেশে চালু রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ওষুধ রয়েছে যা অপ্রয়োজনীয় বা কার্যকারিতাহীন। এগুলো বাজারে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। কোন কোন ওষুধ কার্যকর — কিন্তু বিষক্রিয়াহীন বিকল্প ওষুধও রয়েছে। অতএব মারাত্মক বিষক্রিয়ার সম্ভাবনাবহুল এই ওষুধগুলো জনগণের নাগালের বাইরে নেয়া উচিত।

ওষুধ বাজারে চালু রাখা বা বাতিল করার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক গঠিত

বিশেষজ্ঞ কমিটি কতগুলো নীতির উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করেন। নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিচে উল্লেখ করা হল :

ক. সাধারণভাবে একের অধিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ওষুধ বাজারে চালু রাখা হবে না। (কতগুলো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে।) কেননা এর ফলে যে বিশেষ উপাদান রোগীর জন্য প্রয়োজন নেই, তাঁকে সে উপাদানও কিনতে এবং ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এছাড়া প্রয়োজনে রোগীর জন্য একটি উপাদানের ভিন্ন মাত্রাও চিকিৎসকগণ ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ মিশ্রিত ওষুধে উপাদানের পরিমাণ স্থির থাকে। উপাদানসমূহ আলাদা আলাদা ওষুধ হিসেবে চালু থাকতে পারে, যদি সেগুলো প্রয়োজনীয় হয়। বিশেষতঃ এন্টিবায়োটিকের সংমিশ্রণ ও এন্টিবায়োটিকের সাথে কর্টিকোস্টেরয়েড বা ভিটামিনের সংমিশ্রণ রাখা যাবে না। ব্যথা–উপশমকারী ওষুধসমূহের সংমিশ্রণও বন্ধ করা হবে, কারণ এতে কার্যকারিতা বৃদ্ধি হয় না অথচ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

খ. বি–কমপ্লেক্স ভিটামিনসমূহের কার্যকারিতা যেহেতু পরস্পর–সম্পর্কিত, অতএব সংমিশ্রণ হিসেবে এগুলো চালু থাকবে। কিন্তু অন্যান্য ভিটামিন পৃথক পৃথক ওষুধ হিসেবে চালু করতে হবে। তরল ভিটামিন ওষুধ তৈরি করা যাবে না, কারণ এতে জাতীয় সম্পদের সর্বাধিক অপচয় ঘটে। শুধু শিশুদের জন্য ড্রপ আকারে ভিটামিন বাজারজাত করা যাবে।

গ. কফ্ মিকশ্চার, থ্রোট লজেন্স, গ্রাইপ ওয়াটার, এ্যালকালী ইত্যাদির রোগ ভাল করার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। এই জাতীয় ওষুধের উৎপাদন এবং আমদানি বন্ধ করা প্রয়োজন যাতে আমাদের সীমিত সম্পদের অপচয় না হয়।

ঘ. টনিক ও বলবৃদ্ধিকারী ওষুধসমূহের কোন কার্যকারিতা নেই, অথচ প্রচুর মানুষ বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতার কারণে এগুলোর জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। উপরন্তু মাদকদ্রব্য থাকার জন্য এগুলো একটা অভ্যাস, এমনকি নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। এগুলোর উৎপাদন এবং আমদানি বন্ধ করা হবে।

ঙ. এনজাইম এবং হজমের ওষুধও প্রভূত অর্থের অপচয় ঘটায়। যদিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলোর কোন কার্যকারিতা নেই। শুধুমাত্র প্যানক্রিয়াস গ্ল্যান্ডের

এনজাইমসমূহ ও ল্যাকটেজ একক উপাদান হিসেবে বাজারজাত করা যাবে, কারণ কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার প্রয়োজন।

চ. শিশুদের জন্য ক্ষতিকর কোন এন্টিবায়োটিক তরল আকারে বাজারজাত করা যাবে না।

ছ. ক্ষতিকর, অপ্রয়োজনীয় ও সন্দেহজনক কার্যকারিতার অপব্যবহৃত ওষুধ নিষিদ্ধ করা হবে। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া বা বৃটিশ ফার্মাসিউটিকেল কোডেক্স-এ সম্প্রতি অন্তর্ভুক্ত নয়, এসব ওষুধও চালু রাখা যাবে না।

জ. প্রমাণিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্পন্ন কতগুলো ওষুধ চালু রাখা হবে শুধু বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য। কারণ বিশেষ রোগে এগুলোর ভূমিকা রয়েছে।

ঝ. স্থানীয়ভাবে যদি কোন ওষুধ বা উপাদান বা এগুলোর বিকল্প যথেষ্ট উৎপাদিত হয়, তবে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য এগুলো আমদানি করা যাবে না। বাংলাদেশে নিজস্ব কারখানা না থাকলে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে অন্যের কারখানায় তৈরি করে ওষুধ বাজারজাত করতে দেয়া উচিত নয়। যেসব ওষুধ প্রস্তুত করা সহজ (যেমন ভিটামিন ও এন্টাসিড) সেগুলো শুধু দেশী কোম্পানীগুলোই প্রস্তুত করবে। জটিলতর প্রস্তুতপ্রণালীসম্পন্ন ওষুধ প্রস্তুতকরণে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর আত্মনিয়োগ করা উচিত।

বাতিলকৃত ওষুধগুলোকে তিনটি তালিকায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম তালিকায় রয়েছে সে সমস্ত ওষুধ যেগুলোর কার্যকারিতার চেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব বেশি এবং যেগুলোর যথোপযুক্ত বিকল্প রয়েছে। এর মধ্যে অনেক ওষুধ রয়েছে যেগুলো উন্নত দেশসমূহে নিষিদ্ধ করা হয়েছে অথবা বাজারজাত করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

প্রথম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিছু ওষুধের নাম ও বাতিলের প্রধান কারণ উল্লেখ করা হল :

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
১. **ট্রেট্রাসাইক্লিন সিরাপ** ; যেমন : ক্লিনমাইসিন, ভাইব্রামাইসিন, টেরামাইসিন, ইমপেরাসিন, সুমাইসিন, রেস্টেক্লিন, এ্যালডাসাইক্লিন, অক্সালিন, লেডারমাইসিন ইত্যাদি সিরাপসমূহ।	টেট্রাসাইক্লিন সিরাপসমূহ শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ এটা শিশুদের হাড়ের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয় ও দাঁতের রং পরিবর্তন করে।

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
২. **হাইড্রোক্সিকুইনোলিন জাতীয় ওষুধ** ; যেমন : এন্টারোভায়োফর্ম, মেক্সাফর্ম, রেসোট্রেন, ডায়াডোকুইন, ডিপেনডাল, ইনটেসটোপান, এ্যাডাইসিন, আয়াডোকুইন, এন্টারোগুয়ানিডিন, কুইক্সালিন, নিভেমবিন, ফাইস্ট্রেপ, ডাইসেডিন ইত্যাদি।	এই জাতীয় ওষুধ স্নায়ুতন্ত্রের এক ধরনের ব্যাধি (সাব–একিউট মাইলো–অপটিক নিউরোপ্যাথী) সৃষ্টি করতে পারে। এই অসুখে হাতপায়ের অবশ হওয়া ও অন্ধত্ব হতে পারে। অথচ এইসব ওষুধের কার্যকর অথচ কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বিকল্প রয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি ওষুধে একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণও রয়েছে যা নীতিমালা–বিরোধী।

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
৩. **মাদকদ্রব্য (এলকোহল)-সমন্বিত ও ভিটামিন-মিনারেল-যুক্ত টনিক** ; যেমন : পলিটামিন, ভারডিভিটন এলিক্সির, টোনাম, ডুরল, রুব্রাটন এলিক্সির, নিউরোপ্লেক্স, নিউরোলেসিথিন, নিউরোনা, ভিটাটোন, এডিকোমল্ট এক্সট্রাক্ট কালমেঘ, অশোকা, করডিয়েল, ফেরোটোন, ফেরিটোন ইত্যাদি।	একাধিক ভিটামিন ও কোন কোন ক্ষেত্রে মিনারেলের সমন্বয় নীতিমালা-বিরোধী। এছাড়া মাদকদ্রব্যের সং-যোজন অভ্যাস এমনকি নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে ও যকৃতের জন্য ক্ষতিকর। নাম টনিক হলেও কোন টনিক-ক্ষমতা নেই, সাময়িক উত্তেজনা আনে মাত্র। এলকোহলের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ার, ওয়াইন ইত্যাদি মদগুলোর চেয়েও বেশি।

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
৪. **মাদকদ্রব্য, ভিটামিন ও এনজাইম সমন্বিত ওষুধসমূহ** ; যেমন : ডাইজাইম, ডায়াপ্টোজাইম, ডেকাজাইম, পেপটেনজাইম, জাকোজাইম ইত্যাদি।	মাদকদ্রব্যের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, একাধিক ভিটামিনের সংমিশ্রণ ও এনজাইমের কার্যকারিতার অভাব।

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
৫. **ক্ষুধা বা রুচিবর্ধক ওষুধসমূহ**; যেমন : পেরিয়াকটিন, পেরিয়াকটিন ভিটা, পেরিটল, পেরিডিন, পেরিগান, হেপটামিন, সিপটাডিন ইত্যাদি।	এই ওষুধসমূহের উপাদান সাইপ্রোহেপ্টাডিন-এর অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে ; যেমন : রক্তকণিকা কমে যাওয়া, রক্তপাত হওয়া, দৃষ্টিশক্তির গণ্ডগোল, মানসিক ব্যাধি ইত্যাদি। এই ওষুধ সাময়িক রুচি বৃদ্ধি করলেও শেষ পর্যন্ত কার্যকর থাকে না, রুচি কমে যাওয়ার মূল কারণ দূর করে না।
৬. **মাদকদ্রব্য-সমন্বিত কফ সিরাপ** ; যেমন : সিরাপ বাসক, বেঙ্কোলীন, কেফ্লেক্স, এ্যাসমালেক্স, প্রোমোডিল ইত্যাদি।	অভ্যাস-সৃষ্টিকারী কোডিন রয়েছে। কফের মূল কারণ দূর না করে শুধু লক্ষণ কমায়। রোগ নিরাময় করে বলে প্রমাণিত হয়নি।
৭. **একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত অথবা ক্ষতিকর বেদনানাশক ওষুধ;** যেমন : নোভালজিন টেবলেট, ইন্‌জেক্‌শন এবং ড্রপস, বেরালজিন টেবলেট, বাসকোলাইসিন ইন্‌জেক্‌শন ইত্যাদি।	প্রমাণিত ক্ষতিকর উপাদানে প্রস্তুত এবং অনেক দেশে নিষিদ্ধ। একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণ নীতিমালা-বিরোধী।

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
৮. গ্রাইপ ওয়াটার	শিশুদের পেট ব্যথা বা কান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের এইজাতীয় লক্ষণ সাধারণতঃ ক্ষতিকর নয় ও আপনিই ভাল হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই শিশু ক্ষুধা, কাপড় ভিজা থাকা অথবা মা–বাবার আদর পাবার জন্য কাঁদে। গ্রাইপ ওয়াটার এসব ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এছাড়া গ্রাইপ ওয়াটারে এ্যাল–কালী বা এলকোহল রয়েছে। অধিক সেবনে এ্যালকালী শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং বৃক্কের (কিডনীর) ক্ষতি করে। এলকোহলও শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।
৯. **শরীরের বাড়ন বৃদ্ধিকারক ওষুধ** ; যেমন : এ্যানাপোলিন, ওরাবলিন, ডুরাবোলিন ইত্যাদি।	যত্রতত্র ব্যবহার করা হচ্ছে শরীরের বাড়ন বৃদ্ধি ও ওজন বাড়ানর জন্য। এ জাতীয় ওষুধ সেবনে জন্ডিস ও লিভারের রোগ হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে পুরুষালী লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া, লিঙ্গান্তর ইত্যাদি হতে পারে। প্রথম দিকে কিছু শারীরিক বৃদ্ধি হলেও পরবর্তী পর্যায়ে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয় তালিকায় বর্ণিত ওষুধসমূহে কোন কোন উপাদান রয়েছে যেগুলো ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয়। এইসব উপাদান বাদ দিয়ে তৈরি করলে ওষুধগুলো বাজারজাত করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিছু ওষুধের নাম ও অন্তর্ভুক্তির কারণ দেয়া হল :

বাণিজ্যিক নাম	২য় তালিকাভুক্তির কারণ
১. **এন্টিবায়োটিক ও অন্য উপাদানের সংমিশ্রণ** ; যেমন : ক্লোরামেক্স ফোর্ট, হেস্টাক্লোর এফ, অমনাসিলিন, অমনাসিলিন ফোর্ট, রেস্টোক্লিন, টেরামাইসিন এস. এফ. ইত্যাদি।	এন্টিবায়োটিকের সঙ্গে ভিটামিন ও অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণের ফলে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। এন্টিবায়োটিকের সঙ্গে ভিটামিনের প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত উপাদানগুলো বাদ দিতে হবে।
২. **একাধিক ভিটামিন অথবা ভিটামিন ও লিভার এক্সট্রাক্ট বা খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ওষুধ সেবন** ; যেমন : বিকোনেক্স, রুব্রাফেরেট, ফেরোনেট-বি, ফেমারোন, ফেরোফেনল, ভিটাপ্লেক্স, ভিটাপ্লেক্স ফোর্ট, পেনভিট, ফিডাপ্লেক্স, লিভেক্স ও বি-কমপ্লেক্সের সংমিশ্রণ, সাইট্রেভিট, বিকোটোন, ট্রাইএডিপ্লেক্স ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয়ভাবে একাধিক ভিটামিনের সংমিশ্রণ, ভিটামিন ও লিভার এক্সট্রাক্ট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। লিভার এক্সট্রাক্টের কোন প্রয়োজন নেই। কতগুলো ভিটামিন যেমন বি^{১২} আমাদের দেশে প্রয়োজন নেই, কারণ খাবারে এটা যথেষ্ট পাওয়া যায়। সব খনিজ পদার্থেরও প্রয়োজন নেই।
৩. **এলকোহল ও বেদনানাশক ওষুধের সংমিশ্রণ** ; যেমন : টাইডিনল সিরাপ, পাইরিটোন এলিক্সির, প্যারাপেক্স, জেরিন এলিক্সির ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয় এলকোহল বাদ দেয়া যেতে পারে।

বাণিজ্যিক নাম	২য় তালিকাভুক্তির কারণ
৪. **একাধিক বেদনানাশক উপাদান ও অন্য উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ওষুধ** ; যেমন : এনাপাইরিন, এ.পি.সি. বায়োসপ্রিন, পেরাপাইরিন ইত্যাদি।	বেদনানাশক ওষুধসমূহের সংমিশ্রণে কার্যকারিতা বাড়ে না কিন্তু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অন্যান্য উপাদান, যেমন ফেনোবারবিটোন একত্রে দেয়া অনাবশ্যক।
৫. **গ্লুকোজের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণ** ; যেমন : গ্ল্যাক্সোজ–ডি, গ্যাকোজ–ডি, এডিস গ্লুকোজ।	ভিটামিন–ডি ও ক্যালসিয়াম গ্লিসা–রোফসফেটের অনাবশ্যক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গ্লুকোজের মূল্যবৃদ্ধি।
৬. **হাঁপানির ওষুধের সঙ্গে অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণ** ; যেমন : এসমারিন এইচ, এসমাটোন।	হাঁপানির কার্যকর ওষুধের সঙ্গে অন্যান্য অনাবশ্যক উপাদান, যেমন ক্যাফেইন, প্রমেফাজিন–এর সংমিশ্রণে মূল্যবৃদ্ধি।

তৃতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ওষুধসমূহ নিম্নলিখিত কারণে নিষিদ্ধ :

ক. বিভিন্ন উপাদানসমূহের সংমিশ্রণে ওষুধ তৈরি করা হয়েছে অথবা উপাদানসমূহের কোন কার্যকারিতা নেই বা সংমিশ্রণের ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. উপাদানসমূহের সামান্য রদবদলের পর কার্যকারিতায় কোন পরিবর্তন ছাড়া বিভিন্ন নামে ওষুধ বাজারে ছাড়া হয়েছে। এতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। যে প্রতিষ্ঠান বেশি প্রচার করতে পারে, তাদের ওষুধই বেশি বিক্রি হয়। এভাবে আসল কার্যকর ওষুধের পরিবর্তে অকার্যকর ওষুধ বাজারে বিক্রি হয়। ফলে রোগের উপশম না হয়ে অনেক সময় জটিলতা বাড়ে।

গ. ওষুধ বা উপাদানসমূহ বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয় অথচ একই জিনিস আমদানি করা হচ্ছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ছাড়াও দেশীয় উৎপাদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং রোগীদের অধিক মূল্য দিতে হচ্ছে।

ঘ. যে সমস্ত ওষুধ দেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করতে পারে, যেমন এন্টাসিড, ভিটামিন, সেগুলো বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রস্তুত করণ বন্ধ করা।

ঙ. অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কোন কারখানা ছাড়াই অন্যের কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ না করেই ওষুধ বানাচ্ছে এবং নিজেদের নামে বাজারজাত করছে। এতে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। এদেশে কারখানা বসানর পরই কেবল এসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের নামে ওষুধ বাজারজাত করার অনুমতি দেয়া যায়। অন্যথায় যে প্রতিষ্ঠানে এসব ওষুধ তৈরি হয়, তারা তাদের নামে বাজারজাত করতে পারে।

নিচে এই তালিকার কিছু ওষুধের নাম ও তালিকাভুক্তির কারণ দেয়া হল:

বাণিজ্যিক নাম	**৩য় তালিকাভুক্তির কারণ**
১. করিবান, পেনিট্রায়াড, স্টেপ-টোট্রায়াড, সালফাট্রায়াড, পেনটিডস, রুব্রাভিট, এ্যালডাসাইক্লিন ফোর্ট, অক্সালিন ফোর্ট, ফার্মাক্সিন ফোর্ট কেপসুল, ডালএয়াল, এমপিক্লক্স, ফিমোটার, ইউনিক্যাপ-এম ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয় সংমিশ্রণ অনেক সময় ক্ষতিকর। অনাবশ্যক মিশ্রণের ফলে মূল্যবৃদ্ধি। মিশ্রণের ফলে কার্যকারিতা বাড়েনি।

বাণিজ্যিক নাম	৩য় তালিকাভুক্তির কারণ
২. ডলালজিন, টারবলান, বেসিরল, স্যালিসিটামল, নরজোসিক ইত্যাদি।	একাধিক উপাদান যোগ করার ফলে মূল্যবৃদ্ধি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা-বৃদ্ধি।
৩. প্লেক্সামিন–বি, লাইসোভিট, বিকোনেক্স, অস্টোক্যালাসিয়াম, বিকাডেক্স, হেলিবোরেন্জ, বি-ভিটামিন এলিক্সির, ফার্মাভিট ইত্যাদি।	অনেকগুলো ভিটামিনের অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ। ভিটামিনের সঙ্গে খনিজ পদার্থ, গ্লিসারোফসফেট, হরমোনের মিশ্রণ। তরল আকারে ভিটামিন মিশ্রণের ফলে অপচয়।
৪. মেথিপ্লেক্স, পেপসিডিন ভি, ফার্মাজাইম, নিওরোভিট, সুপারজাইম, ইউনিজাইম ইত্যাদি।	কার্যকারিতার কোন প্রমাণ নেই। টনিক, স্বাস্থ্যবর্ধক, হজমবর্ধক ইত্যাদি নামে জনগণের অজ্ঞতার সুযোগে অবাধে বিক্রি হয়।
৫. কোরেক্স, ডাইমাইরিল, পিরিটোন জি লিঙ্কটাস, পিরিটোন এক্সপেক্টোরেন্ট, ডেকোয়ডিন, ফেনসিডিল, ভ্যালেক্স, সায়োএ্যালকালী, এলকাসিড, সাইট্রোল, টুসকা, টুসিকফ, পেপস, স্ট্রেপসিলস ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর উপাদান মিশিয়ে কফ্ সিরাপ, থ্রোট লজেন্স, ব্লাড এ্যালকালাইজার, গ্রাইপ ওয়াটার ইত্যাদি নামে চালান হচ্ছে। কার্যকারিতার কোন গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

বাণিজ্যিক নাম	৩য় তালিকাভুক্তির কারণ
৬. ডুরাবলিন, ডেকা ডুরাবলিন, অরাবলিন, সাসটানোন, ডেকডিন, ডেকাবলিন ইত্যাদি।	উপাদানসমূহের সামান্য পার্থক্য অথচ বিভিন্ন নামে বাজারে প্রচলিত আছে এবং বিক্রি হচ্ছে। কার্যকারিতা সন্দে–হজনক বা নগণ্য এবং অপব্যবহার প্রচুর।
৭. ডুয়ামিন–এস, বিসমোজিম, স্টমাক কিউর, স্টমাকিন, ওয়াটারবেরীস কম্পাউন্ড, মরিয়ামীন এম–২ ও ডি–২, সিরাপ হেমোগ্লোবিন, বেলাডিনাল, রেডিসল, লিব্রাক্স, কাইমার ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক এবং প্রতারণামূলক নাম।
৮. সিরাপ বাসক, গ্যাকোফেক্স, বিসমাথ এটএ্যামোন সাইট্রেট, টিংচার ক্যাম্ফর, রাউন্ড পিল, বিসমোজিম, লিভারজিন, লিং–কটাস একোনাইট ইত্যাদি।	আধুনিকতম ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া বা ফার্মাসিউটিকেল কোডেক্সে অন্তর্ভুক্ত নয়। কার্যকারিতার জোরাল প্রমাণ নেই।
৯. সেমিকো, এ্যাসমার, অক্সাসিলিন, ব্যাকট্রিন, ক্লোরোমাইসিটিন, ইনসিডাল, এমোক্সিল, পলিবাইওন, সেবিয়ন ইত্যাদি।	যথেষ্ট দেশীয় উৎপাদন থাকায় বিদেশ থেকে আমদানির প্রয়োজন নেই।

	বাণিজ্যিক নাম	৩য় তালিকাভুক্তির কারণ
১০	লিডারমাইসিন, অমনিপেন, পেনব্রিটিন, সেপট্রিন ইত্যাদি।	বিদেশী স্বত্বাধীন নামে তৈরি হবার জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে হয় অথচ সমমানের ওষুধ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রয়েছে।

কিডনী রোগে করণীয়

আমাদের দেশে কিডনী রোগীর সংখ্যা অনেক। এই সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বিভিন্ন ধরনের কিডনী রোগের অনেকগুলোকে প্রতিরোধ করা কিংবা চিকিৎসা করে নিরাময় করা সম্ভব। অন্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। দু'টো বৃক্ক (কিডনী) যদি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ডায়ালাইসিস এবং কিডনী সংযোজন করে রোগীকে বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। অতএব, এককালে বৃক্কে রোগ ধরা পড়লে যে রকম ভয়ভীতির সঞ্চার হত এখন তা হবার তেমন যুক্তি নেই।

প্রতিরোধ অথবা চিকিৎসা করে নিরামবয় করা সম্ভব এমন রোগগুলো হচ্ছে :

(১) খুব অল্প সময়ে বৃক্কের কার্যকারিতা লোপ পাওয়া (একিউট কিডনী ফেইলিওর)

(২) বৃক্কের (কিডনীর) ছাঁকনির প্রদাহ

(৩) প্রস্রাবে প্রদাহ

(৪) বৃক্ক, মূত্রনালী, মূত্রাশয়ে পাথর

(৫) বৃক্কে টিবি

(৬) ক্রনিক কিডনী ফেইলিওর।

কোন কারণবশতঃ হঠাৎ করে কয়েক ঘণ্টা থেকে শুরু করে কয়েকদিনের ভেতর বৃক্কের কার্যকারিতা লোপ পেতে পারে। এই অবস্থার নাম একিউট রেনাল ফেইলিওর (তাৎক্ষণিক বৃক্কের কার্যকারিতা লোপ)। এর উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল :

— ডায়রিয়া বা ঘন ঘন পাতলা পায়খানা

— রক্ত আমাশয়

— প্রস্রাবকালীন জটিলতা

— মাত্রাতিরিক্ত ওষুধের ব্যবহার

— বৃক্কের (কিডনীর) ছাঁকনির প্রদাহ।

প্রতিবৎসর ডায়রিয়ার ফলে বাংলাদেশে বহুলোক মৃত্যুবরণ করেন। বৃক্কের কার্যকারিতার বিলুপ্তি এঁদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর কারণ। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হলে শরীরে পানি এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় লবণ, পটাশিয়াম এবং ক্ষার জাতীয় পদার্থের অভাব দেখা দেয়। সময়মতো এগুলোর অভাব পূরণ না হলে বৃক্কের কর্মক্ষমতা লোপ পেতে পারে। কালবিলম্ব না করে উপযুক্ত চিকিৎসা এখানে অপরিহার্য। তা না হলে প্রাণনাশ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। খাবার স্যালাইন অর্থাৎ লবণ–গুড় সরবত এখন একটা পরিচিত নাম। বাজারে প্যাকেট করা খাবার স্যালাইন পাওয়া না গেলেও কিছু যায় আসে না। ঘরেই এটা তৈরি করা সহজ। সময়মতো সঠিক পরিমাণ খাবার স্যালাইন ব্যবহারের ফলে বৃক্ককে (কিডনীকে) টিকিয়ে রাখা সম্ভব। এর ফলে এখন আর কলেরা মহামারী রূপ নিতে পারে না। ডায়রিয়া হলেও মৃত্যুর আশংকা নগণ্য।

সুচিকিৎসার ফলে আশানুরূপ সুফল পাওয়া গেলেও ডায়রিয়া কিংবা আমাশয় জাতীয় রোগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করলে প্রতিরোধ অনেকখানি সম্ভব।

— সিদ্ধ পানি পান করা।

— বাসি, পচা খাবার বর্জন করা।

— খাবার আগে হাত পরিষ্কার করা।

— যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা।

ডায়রিয়া ছাড়াও অন্যান্য কারণে একিউট কিডনী ফেইলিওর (আকস্মিকভাবে বৃক্ক আক্রান্ত) হতে পারে। এ কারণগুলো হল —

— বাচ্চা প্রসবের সময় যদি বিলম্বিত হয়।

— গাছগাছড়া ইত্যাদি যদি প্রসব কিংবা গর্ভপাতের জন্য ব্যবহার করা হয়।

— গর্ভপাত কিংবা প্রসবের পর যদি অধিক রক্তক্ষরণ হয়।

— গর্ভপাতের পরে যদি ইনফেক্‌শন (জীবাণু সংক্রমণ) হয়।

— গর্ভপাত কিংবা প্রসবের পর অধিক রক্তক্ষরণ হয়।

এই অবস্থায় প্রথমে রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়, তলপেটে ব্যথা এবং জ্বর হয়, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যেতে পারে। অতিমাত্রায় বৃক্কের (কিডনীর) কার্যকারিতা কমে গেলে ডায়ালাইসিস নামে এক বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। এইসমস্ত কারণে প্রসব কিংবা গর্ভপাত যাই হোক না কেন পরিবেশ পরিচ্ছন্ন

হতে হবে। অভিজ্ঞ নার্স অথবা ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে হতে হবে। প্রসব বিলম্বিত হলে হাসপাতালে ভর্তি করাই উত্তম।

বৃক্কের (কিডনীর) ছাঁকনিতে প্রদাহ

চুলকানি, খোস-পাঁচড়া যেমন সময়মতো চিকিৎসা করা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন টনসিলের সংক্রমণ (সোর থ্রোট)-এর সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা করা। তা না হলে এ দু'টো অবস্থা থেকে বৃক্কে (কিডনীতে) রোগ সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণতঃ এই দু'টো রোগ হওয়ার ২-৩ সপ্তাহ পর বৃক্ক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সেগুলো হল —

— প্রস্রাবের পরিমাণ কম হওয়া।
— প্রস্রাবের রং গাঢ় কিংবা রক্তবর্ণ হওয়া।
— পায়ে এমনকি শরীরে ফুলা দেখা দেয়া।

বৃক্কের (কিডনীর) এই প্রদাহজনিত রোগকে সাধারণভাবে নেফ্রাইটিস বলা হয়। রোগীর রক্তচাপ এমন অবস্থায় বেড়ে যেতে পারে। দুই-তৃতীয়াংশ রোগীর বেলায় নেফ্রাইটিসের কারণ জানা যায় না। তবে মনে রাখতে হবে অস্বাভাবিক হলেও হেপাটাইটিস ভাইরাস, বিশেষ ধরনের ম্যালেরিয়া এবং কুষ্ঠরোগে নেফ্রাইটিস হতে পারে। যে কারণেই নেফ্রাইটিস হোক না কেন, খাবার এবং পানি নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। শরীর ফুলে গেলে দিনে এক সেরের বেশি পানি পান করা উচিত নয়। তা না হলে এই পানি শরীরে জমে জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

প্রস্রাবের প্রদাহ

প্রস্রাবে প্রদাহ হলে জ্বর, বমি বমি ভাব, ঘন ঘন প্রস্রাব করার প্রবণতা, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, বৃক্কের (কিডনীর) দু'পাশে ব্যথা, খাবারে অরুচি ইত্যাদি হতে পারে। এ সমস্ত লক্ষণ বড়-ছোট সকলের হতে পারে। তবে শিশুরা কান্নাকাটি করে।

প্রস্রাব পরীক্ষা করে এন্টিবায়োটিক সেবন করলে এটা সেরে যায়। খুব বেশি করে পানি পান করলে অনেক সময় প্রস্রাবের প্রদাহজনিত রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শিশুদের প্রস্রাবে প্রদাহ হলে এর কারণ বের করে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। বৃদ্ধ বয়সে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের প্রদাহজনিত কারণে

রোগী অনেক কষ্ট পেতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় এক থেকে তিন মাস এন্টিবায়োটিক খাওয়া প্রয়োজন।

এগুলো ছাড়াও অনেকদিন ধরে যাঁদের ডায়াবেটিস রয়েছে এবং যাঁরা উচ্চ রক্তচাপ-এ ভুগছেন তাঁদেরও বৃক্ক (কিডনী) আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। এ ধরনের রোগীদের বৃক্ক সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বছরে অন্ততঃ দু'তিনবার করিয়ে নেয়া ভাল। বৃক্ককে (কিডনীকে) সুস্থ রাখতে হলে শরীর সুস্থ রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিছুর ব্যবস্থা থাকতে হবে। পানি বেশি খাওয়া ভাল, তবে সে পানি বিশুদ্ধ না হলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি।

বৃক্কে (কিডনীতে) পাথর

বৃক্কে পাথর একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। শতকরা [illegible] ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বৃক্কে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর কারণ অজানা। পাথর বৃক্কে তৈরি হয়ে তা বৃক্কে থেকে যেতে পারে অথবা মূত্রনালী বা মূত্রথলিতে আটকে যেতে পারে। হঠাৎ করে যদি পেটের মধ্যভাগের ডান বা বামপাশে ব্যথা এবং তা ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এসময় —

— প্রস্রাবের সাথে রক্ত যেতে পারে।
— ঘন ঘন অল্প অল্প প্রস্রাব হতে পারে।
— বমি বমি ভাব লাগতে পারে।

পাথর মূত্রনালীতে আটকে গেলে পেটের ডান দিকে বা বামদিকে (কুঁচকির দিকে) ব্যথা নেমে আসে এবং পুরুষের অণ্ডকোষ এবং মেয়েদের যোনিদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ছোট পাথর হলে অনেক সময় ব্যথার সময় তা প্রস্রাব দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। ছোট পাথর বৃক্কের (কিডনীর) ভিতরে অবস্থান করলে তাতে সাধারণতঃ শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না। কেবলমাত্র প্রস্রাবের রাস্তায় পাথর আটকে গিয়ে প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হলে বৃক্কের উপরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং ঘন ঘন সংক্রমণ হলে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। আজকাল অবশ্য লিথোট্রিপসি (পাথর চূর্ণকারী) মেশিন দ্বারা বেশির ভাগ পাথরকে বিনা শল্যচিকিৎসায় চিকিৎসা করা সম্ভব। পাথর বের করে দেবার পরও আবার যাতে পাথর সৃষ্টি হতে না পারে তাঁর জন্য ওষুধের চিকিৎসা অবশ্যই করতে হবে।

ক্রনিক কিডনী ফেইলিওর

ধীরে ধীরে যদি কোন বৃক্ক (কিডনী) রোগের কারণবশতঃ দু'টো বৃক্কের কার্যকারিতা আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় তখন সেটাকে ক্রনিক কিডনী ফেইলিওর বলা হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর বহু লোক এই ক্রনিক কিডনী ফেইলিওর রোগে মৃত্যুবরণ করেন। ক্রনিক কিডনী ফেইলিওর হবার প্রধান কারণ হচ্ছে — নেফ্রাইটিস বা বৃক্কের (কিডনীর) ছাঁকনিতে প্রদাহজনিত বৃক্ক রোগ এবং প্রস্রাবে প্রদাহজনিত বৃক্ক রোগ। এছাড়াও রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ জনিত বৃক্ক রোগ, ডায়াবেটিস জনিত বৃক্ক রোগ, বৃক্কে পাথর এবং অন্যান্য বৃক্ক রোগ। দু'টো বৃক্ক আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে —

— ক্ষুধামান্দ্য
— বমি বমি ভাব
— বমি হওয়া, শরীর ফ্যাকাসে হওয়া
— রাতে প্রস্রাব করার প্রবণতা
— চর্মরোগ ছাড়াই শরীর চুলকান
— কর্মে অনীহা, নিস্তেজ ভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।
— ক্রমান্বয়ে শরীর দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়।
— শরীর শুকিয়ে যায়, রক্তশূন্যতা বৃদ্ধি পায়।
— খিচুনি, হেঁচকি এবং জ্ঞান লোপ পেতে পারে।

প্রাথমিকভাবে সঠিক কারণ নির্ণয় করে উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করে খাবারে আমিষ, লবণ, পটাশিয়াম ও পানি নিয়ন্ত্রণ করে এগুলোর চিকিৎসা করা যায়। বৃক্ক (কিডনী) সম্পূর্ণরূপে অকেজো হলে ডায়ালাইসিস ও বৃক্ক সংযোজনের মাধ্যমে মানুষ বছরের পর বছর সুস্থ জীবন যাপন করতে সক্ষম হচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশেও এ ধরনের উন্নত চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

পেপ্‌টিক আলসার সমাচার

পাকস্থলী থেকে নিঃসরিত অম্লরস ও পেপ্‌সিনের ক্রিয়ার ফলে পরিপাকতন্ত্রে কোন স্থানে ক্ষত বা ঘা হলে তাকে পেপ্‌টিক আলসার বলা হয়। এই ঘা পাকস্থলীতে হলে গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রারম্ভিক স্থান বা প্রথম অংশ ডিওডেনামে হলে ডিওডেনাল আলসার বলা হয়। ডিওডেনামের অংশ জেজুনাম। এখানে আলসার সারাধণতঃ হয় না। তবে পাকস্থলীতে আলসার কিংবা অন্য কোন কারণের জন্য অস্ত্রোপচার (অপারেশন) করে যদি জেজুনামের সঙ্গে খাদ্যথলির সংযোগ করা হয় তা হলে এই সংযোগস্থলেও আলসার হতে পারে।

খাদ্যনালীর নিচের অংশ ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ ইলিয়ামেও আলসার দেখা দিতে পারে, তবে সাধারণতঃ এখানে হয় না।

পৃথিবীর সবদেশেই অনেক আলসার রোগী আছেন। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ডিওডেনাল আলসার, তারপর গ্যাস্ট্রিক আলসার বা পাকস্থলীর আলসার। উন্নত দেশসমূহে শতকরা এক থেকে দু'জন মানুষের ডিওডেনাল আলসার দেখা যায়। বাংলাদেশে এই হার শতকরা ১২ জন অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১২ জন এই রোগে আক্রান্ত হন।

আলসারের কারণ

পেপ্‌টিক আলসারের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে ধূমপায়ীদের এই রোগ বেশি দেখা যায়। বংশগত প্রভাবও রয়েছে । পুরুষদের এই রোগ বেশি হয়। ডিওডেনাল আলসার সাধারণতঃ যৌবনে বেশি হয়। গ্যাস্ট্রিক আলসার বেশি হয় মধ্য বয়সে। পেপ্‌টিক আলসার হওয়ার পিছনে বা তা সেরে উঠার ব্যাপারে ঝাল, মশলা বা বিশেষ খাদ্যের তেমন কোন ভূমিকা আছে বলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। সাম্প্রতিককালে 'হেলিকোব্যাকটার পাইলোরী' নামে একটি জীবাণু দ্বারা পাকস্থলীর সংক্রমণ আলসার হওয়ার একটি কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

লক্ষণ

আলসারের প্রধান লক্ষণ পেটে ব্যথা। ব্যথা সাধারণতঃ পেটের উপরিভাগে হয়। বেশির ভাগ রোগীর খালি পেটে ব্যথা হয়। খাবার খেলে চলে যায়। অনেকের মধ্যরাতে ব্যথার জন্য ঘুম ভেঙে যায়। কিছু খাবার পর ব্যথা কমে গেলে তাঁরা আবার ঘুমাতে পারেন। ক্ষার জাতীয় কিছু খেলেও ব্যথা কমে যায়। আমাদের দেশে অনেকেই আবার ব্যথা কমানর জন্য সোডা খেয়ে থাকেন।

দীর্ঘকাল এই রোগে ভুগতে থাকলে খাবার খেলেও অনেকের এ ব্যথা কমে না। বারবার ব্যথা, সেই সঙ্গে বমি, আর বমির পরপরই কিছুটা স্বস্তিবোধ — এসবই দীর্ঘস্থায়ী পেপটিক আলসারের লক্ষণ। পেপটিক আলসারের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল মাঝে মাঝে রোগমুক্ত থাকা। চিকিৎসা বা চিকিৎসা ছাড়াই কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস লক্ষণ থাকে না। তারপর কিছুদিনের জন্য আবার তা দেখা দেয়। কিন্তু রোগের বয়স যত বাড়তে থাকে, লক্ষণ ততই ঘন ঘন দেখা দেয়।

উপসর্গ

কিছু কিছু পেপটিক আলসার রোগীর ব্যথা না–ও থাকতে পারে। কিংবা একটু আধটু ব্যথায় ভুগলেও তাঁরা আমল দেন না। এদিকে আলসার কিন্তু চুপ করে থাকে না, তা বেড়ে গিয়ে জটিল আকারে হঠাৎ করে প্রকাশ পায়। যেমন, রক্তক্ষরণের কারণে রক্তবমি বা কালো পায়খানা হয়ে আলসার প্রথম প্রকাশ পেতে পারে। এটা একটা জরুরি অবস্থা। কারণ রক্তক্ষরণের পরিমাণ বেশি হলে অতি দ্রুত রক্ত ভরণের ব্যবস্থা নিয়ে তা পূরণ না করলে জীবনহানির আশংকা দেখা দেয়। ক্ষত ক্রমশঃ গভীর হয়ে এক সময় পাকস্থলী বা ডিওডেনামের দেয়াল পুরোটাই ফুটো করে দিতে পারে। এ অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এর প্রতিবিধান না হলে রোগীর মৃত্যুর আশংকা দেখা দিতে পারে।

আলসারের ফলে পাকস্থলীর দ্বারিকা অর্থাৎ খাদ্যথলি থেকে ডিওডেনামে যাবার রাস্তা ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারে। দ্বারিকার এই সংকীর্ণতার ফলে রোগীর পেট ফেঁপে থাকে। ফলে খাবারের চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় ; খাদ্যথলিতে খাবার জমা হয়ে থাকে, অল্প পরিমাণ খেলেই পেট ফুলে যায়, পানি ঢক ঢক করে। অনেক সময়

দু'একদিনের জমা খাবার বমির সাথে বেরিয়ে আসে। অনেক রোগী আবার নিজেই গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করে সাময়িকভাবে কিছুটা আরাম পান।

রোগ নির্ণয়

যাঁদের উপরের পেটে ব্যথা বা জ্বালা তাঁদের সবাই পেপ্‌টিক আলসারের রোগী নন। এঁদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ লোকের পেপ্‌টিক আলসার থাকে। বাকি সবাই অন্য রোগী। কাজেই সঠিক চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

পেপ্‌টিক আলসার নির্ণয়ের জন্য প্রধানতঃ দু'টি উপায় রয়েছে — এক্স-রে ও এনডোস্‌কোপী। এক্স-রে পদ্ধতিতে বেরিয়াম সালফেট নামক একটি পদার্থ পানিতে মিশিয়ে খাওয়ানর পর পাকস্থলী ও ডিওডেনামের এক্স-রে ছবি নেয়া হয়। এতে পাকস্থলী ও ডিওডেনামের শ্লেষ্মাঝিল্লীর একটা ছবি পাওয়া যায় এবং ঘা থাকলে তাও দেখা যায়। তবে এই পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা কম। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীর ঘা ধরা পড়ে না। আবার অনেক সময় ঘা না থাকলেও তা আছে বলে প্রতীয়মান হতে পারে। বেরিয়াম এবং বাতাস খাইয়ে ডাবল কনট্রাস্ট এক্স-রে করলে নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে। কিন্তু এর জন্য উন্নত ধরনের এক্স-রে মেশিন লাগে। ব্যয়বহুল বলে এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশের সর্বত্র এ ধরনের এক্স-রে করা সম্ভব নয়।

রোগ নির্ণয়ের সবচেয়ে উন্নত ও নতুন পদ্ধতিটি হচ্ছে এনডোস্‌কোপী। এতে একটি সরু নলের মাধ্যমে পাকস্থলী বা ডিওডেনামের ভেতরের অবস্থা সরাসরি চোখে দেখা যায়। পেপ্‌টিক আলসার নির্ণয়ে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা এটি। এসব পরীক্ষার সুযোগ দেশের সর্বত্র নেই — কাজেই লক্ষণ এবং উপসর্গের ভিত্তিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে হয়।

আলসার রোগীর খাবার-দাবার

পেপ্‌টিক আলসার রোগীর খাদ্য বিষয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে ঝাল, মশলা বা বিশেষ কোন খাদ্যের পেপ্‌টিক আলসার হওয়া বা তা সেরে উঠার ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই। কাজেই ঝাল-মশলাবিহীন নরম খাদ্য ও ঘন ঘন দুধ খাবার কোন প্রয়োজন নেই। ঘন ঘন খাবার খাওয়া উপকারে তো লাগেই না বরং

তা ক্ষতিকর হতে পারে। পেপ্‌টিক আলসার রোগী স্বাভাবিক খাদ্যই খেতে পারেন। শুধু যেসব খাবার খেলে রোগী অসুবিধা অনুভব করেন তা এড়িয়ে চললেই হয়। এটা সবার বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কোন বিশেষ খাবার কোন একটি রোগীর ক্ষতি করতে পারে অথচ ঐ খাবার অন্য একটি রোগীর ক্ষতি না-ও করতে পারে। যে খাবার খেলে কোন রোগীর অসুবিধা হয় সেই খাবার সেই রোগীর বাদ দেয়া উচিত। তবে খাবার সময়মতো খেতে হবে। পেপ্‌টিক আলসারের জন্য ধূমপান ক্ষতিকর। নিঃসন্দেহে এ বদভ্যাস সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। অধিকমাত্রায় চা বা কফি খাওয়া কমিয়ে ফেলা দরকার। না খাওয়াই ভাল। তবে খেতে চাইলে দুধ দিয়ে খাওয়া উচিত। দুধ ছাড়া কড়া চা বা কফি পেপ্‌টিক আলসার রোগীর জন্য ক্ষতিকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বাতের বা ব্যথার ওষুধ যেমন এসপিরিন, প্যারাসিটামল, ইনডোমেথাসিন ইত্যাদি আলসারের ভীষণ ক্ষতি করে। তাই এগুলো বর্জন করা প্রয়োজন। কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ আলসার রোগীকে দেয়া বিপদজনক। প্রয়োজনে চিকিৎসক এসব ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিলে রোগীর যেমন উচিত আলসারের কথা চিকিৎসককে জানিয়ে দেয়া তেমনি প্রতিটি চিকিৎসকেরও উচিত প্রশ্ন করে জেনে নেয়া — এ রোগের লক্ষণ বা পূর্ব ইতিহাস। যদি আলসারের পূর্ব ইতিহাস থাকে এবং ব্যথার ওষুধ দেয়া অপরিহার্য হয় তাহলে ব্যথার ওষুধ খাওয়ার অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্বে আলসারের ওষুধ খেলে বিপদের আশংকা অনেকটা কমে যায় কিংবা থাকে না। এ সমস্ত ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে।

আলসারে রোজা

রমজান মাসে অনেকেই প্রশ্ন রাখেন রোজা রাখা যাবে কিনা। সহজ কথায় বলা যায় যাঁদের ইচ্ছা প্রবল, রোজা না রাখলে মনে অশান্তি জন্মে, আগের অভিজ্ঞতা থেকে রোজা রাখলে ভাল থাকেন, কিংবা খারাপ লাগে না তাঁদের রোজা রাখাতে আপত্তি নেই বরং রোজা রাখা ভাল। যাঁরা ওষুধ খান তাঁদের বেলায়ও কোন সমস্যা দেখা দেয় না ; কারণ আজকাল যেসব ওষুধ পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু ওষুধ প্রথম এক মাস পর শুধু একবার করে খেলেই চলে। অতএব যাঁরা রোজা রাখতে আগ্রহী, অন্ততঃ এক মাস আগে তাঁদের চিকিৎসা শুরু হলে রমজান মাসে শুধু একবার শেষরাতে ওষুধ খেলেই যথেষ্ট, চিকিৎসায় ব্যাঘাত হয় না।

আলসারের ওষুধ

পেপ্‌টিক আলসার একেবারে সারিয়ে দিতে পারে এমন ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে এ পর্যন্ত যে ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার হলে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ম ও শৃঙ্খলার সাথে জীবন যাপন করলে আলসার রোগীর নিরাশ হবার কিছুই নেই। পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি অনেক সরলপ্রাণ রোগীকে ভুল পথে পরিচালিত করে। অর্থের অপচয় হয়। শেষ পর্যন্ত উপসর্গ দেখা দিলে অস্ত্রোপচার (অপারেশন) ছাড়া উপায় থাকে না। ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, কার্যকরী ওষুধের মধ্যে রয়েছে সিমেটিডিন, র‍্যানিটিডিন, সুক্রালফেট ও এন্টাসিড ইত্যাদি। কার্যকারিতার দিক থেকে এদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। একজন রোগীর লক্ষণাদির তীব্রতা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে এগুলোর মধ্যে একটি ওষুধ বেছে নেয়া উচিত। রোগীর এলাকায় কিংবা নিকটবর্তী জায়গায় যে ওষুধ সহজে পাওয়া যায় সেটা নেয়াই ভাল যাতে ওষুধের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ রাখতে না হয়। অধিকাংশ পেপ্‌টিক আলসার রোগীর ক্ষেত্রে আলসার সবসময় থাকে না এবং উপসর্গও সবসময় রোগীকে কষ্ট দেয় না। বৎসরে একবার-দু'বার এমনকি আরও দীর্ঘ সময় অন্তর অন্তর আলসার ও তার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আলসার ও তার উপসর্গ উপশম করার জন্য যে সমস্ত ওষুধ রয়েছে সেগুলো প্রতিবার উপসর্গ দেখা দিলে ছ' থেকে আট সপ্তাহ খাওয়ান উচিত।

অস্ত্রোপচার বা অপারেশন যেখানে প্রয়োজন

ক. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ওষুধের মাধ্যমে আলসারের উপসর্গ সন্তোষজনকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বা কারও ঘন ঘন উপসর্গ দেখা দিলে অপারেশনের কথা বিবেচনা করতে হয়।

খ. আলসার যদি পাকস্থলী বা ডিওডেনাম ছিদ্র করে দেয় তাহলে জরুরি ভিত্তিতে অপারেশনের দরকার হয়।

গ. আলসারের কারণে ডিওডেনাম সংকীর্ণ হয়ে খাদ্য চলাচল ব্যাহত হলে অপারেশন করতে হয়।

ঘ. বার বার রক্তক্ষরণ হলেও অপারেশন প্রয়োজন। বস্তুতঃ একবার যদি আলকাতরার মতো কালো পায়খানা কিংবা রক্তবমি বা উভয়ই হয়, যতটুকু সম্ভব, চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সজাগ থাকতে হবে। দ্বিতীয়বার এ রকম হলে অপারেশন করাই উত্তম। তা না হলে খুবই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন সময় দেখা গেছে প্রথম দু'বার প্রাথমিক চিকিৎসা এবং রক্ত দিয়ে বিপদ কেটে গেছে। তৃতীয়বার এমন জায়গায় কিংবা অবস্থায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি বলে জীবন দিতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে এ সকল উপসর্গ বলে-কয়ে আসে না।

ঙ. কোন কোন ক্ষেত্রে আলসার না-কি ক্যান্সার — এ দু'টোর কোনটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা মুশকিল। এ অবস্থায় রোগীকে ওষুধ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলে লক্ষণের কিছুটা উপশম হলেও ক্যান্সার চুপ করে থাকবে না। নিজ গতিতে ভেতরে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত অপারেশনের প্রয়োজনীয়তাও আর থাকবে না অর্থাৎ অপারেশন করেও লাভ হবে না। সময় নষ্ট না করে যেখানে চিকিৎসকের সন্দেহ থেকে যায় সেখানে অপারেশন বিলম্বিত করা বিপদজনক হতে পারে।

বহুমূত্রের কয়েক দিক

বেঁচে থাকার তাগিদে আমাদের নিয়মিত খাবার প্রয়োজন। এই খাবার প্রধানত তিন প্রকার — শ্বেতসার বা শর্করা, আমিষ বা প্রোটিন এবং চর্বি বা তৈল। খাবার শুধু খেলেই হয় না, এর সঠিক ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন।

খাদ্য শরীরে প্রবেশ করার পর নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। এর জন্য প্রয়োজন শরীর থেকে নির্গত নানা হরমোন-এর। শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের জন্য ইনসুলিন নামক হরমোন আবশ্যক। কোন কারণে এ ইনসুলিনের অভাব হলে বা ইনসুলিনের কার্যকারিতা ব্যাহত হলে শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমন, চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি শরীরে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না। ফলে এই গ্লুকোজের পরিমাণ রক্তে বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে প্রস্রাবের সাথে নির্গত হয়। এ অবস্থার নাম ডায়াবেটিস। এ রোগে ঘন ঘন প্রস্রাব হয় বলে এর অপর নাম বহুমূত্র রোগ।

রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ধারণ করে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় করা হয়। প্রস্রাবে গ্লুকোজ ধরা না পড়লে ডায়াবেটিস নাই একথা বলা যায় না। কোন কোন রোগীর রক্তে গ্লুকোজ বেশি থাকলেও প্রস্রাবে ধরা পড়ে না। সুস্থ লোকের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অভুক্ত অবস্থায় ৬.৪ মিলি মোলের এবং খাবার ২ ঘণ্টা পরে ৭.৮ মিলি মোলের কম থাকে। এর বেশি হলে অথবা ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘণ্টা পরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ১১ মিলি মোল বা তার বেশি হলে ডায়াবেটিস ধরে নিতে হবে।

এখন ডায়াবেটিস-এর কয়েকটা বিশেষ দিক আলোচনা করা যাক।

কি ধরনের লোকের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি :

ক. যাঁদের বংশে ডায়াবেটিস আছে যেমন বাবা, মা বা নিকট আত্মীয়ের।
খ. যাঁদের ওজন অনেক বেশি।
গ. যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করেন না।
ঘ. মহিলাদের গর্ভকালীন সময়ে।

ডায়াবেটিসের লক্ষণ

ডায়াবেটিস হলেই লক্ষণ দেখা দেবে এমন কোন কথা নেই। অনেকের বিশেষ করে বয়স্ক রোগীদের ডায়াবেটিসের লক্ষণ না-ও থাকতে পারে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় রক্ত, প্রস্রাব পরীক্ষাতেও এ রোগ ধরা পড়তে পারে। তবে সাধারণতঃ যে সমস্ত লক্ষণ থাকে সেগুলো হল :

— ঘন ঘন প্রস্রাব
— বেশি পিপাসা
— বেশি খিদে
— যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া
— খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ দেখা দেয়া
— ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া
— পুরুষত্বহীনতা বা যৌনসঙ্গমে দুর্বলতা ইত্যাদি।

নানা ধরনের ডায়াবেটিস

মোটামুটিভাবে ডায়াবেটিসকে চার ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. ইনসুলিন-নির্ভরশীল ডায়াবেটিস

এই রোগীদের শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয় না। বেঁচে থাকতে হলে তাঁদের ইনসুলিন ইন্‌জেক্‌শন অবশ্যই নিতে হবে। সাধারণতঃ ত্রিশ বছরের নিচে এই ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। এঁদের ওজন সাধারণতঃ বেশি হয় না।

খ. ইনসুলিন-নির্ভরশীল নয়

এই রোগীদের শরীরে যে ইনসুলিন তৈরি হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এঁদের বয়স সাধারণতঃ ত্রিশ বছরের উপরে এবং অনেকেই বেশ মোটাসোটা।

গ. পুষ্টিহীনতা সম্পর্কিত ডায়াবেটিস

পুষ্টিহীন লোকদের মধ্যে তৃতীয় এক প্রকার ডায়াবেটিস দেখা যায়, এর নাম পুষ্টিহীনতা সম্পর্কিত ডায়াবেটিস। এঁরা ইনসুলিন-নির্ভরশীল নন। এই সকল রোগীর রোগ ধরা পড়ে ত্রিশ বছরের কম বয়সে। এঁরা ক্ষীণকায় এবং শরীরে অপুষ্টির লক্ষণ

থাকে। বেশির ভাগ রোগীর ইনসুলিনের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় তাঁদের পেটে অগ্ন্যাশয়ে (প্যানক্রিয়াসে) পাথর হয়ে থাকে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের ডায়াবেটিসের প্রকোপ বেশি। বাংলাদেশেও এঁদের সংখ্যা নগণ্য নয়।

ঘ. গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

অনেক সময় গর্ভকালীন সময়ে ডায়াবেটিস দেখা দেয়। আবার বাচ্চা প্রসব হয়ে গেলে থাকে না।

জটিলতা

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না রাখলে যেসব মারাত্মক উপসর্গ অথবা জটিলতা দেখা দিতে পারে তা হল :

— পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস
— হৃদ্‌রোগ
— পায়ে পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রীন
— চক্ষুরোগ, যেমন : ছানি পড়া অথবা দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া
— ফোঁড়া, খোস–পাঁচড়া, চুলকানি ইত্যাদি চর্মরোগ।

তাছাড়া ডায়াবেটিসের কারণে যৌনক্ষমতা কমে যাওয়া, মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি ওজনের শিশুর বা মৃত শিশুর জন্ম, অকালে সন্তানপ্রসব, জন্মের পরই শিশুর মৃত্যু এবং নানা ধরনের জন্মত্রুটি দেখা দিতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগীর উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিলে, এগুলোর সাথে যদি ধূমপান যুক্ত হয়, রোগের জটিলতা বহুগুণ বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

ডায়াবেটিসের জরুরি অবস্থা

হাইপোগ্লাইসিমিয়া

রক্তে শর্করার পরিমাণ কমানর জন্য বড়ি বা ইনসুলিন দেয়া হয়। ওষুধ খাওয়ার বা ইনসুলিন নেয়ার ফলে যদি শর্করার পরিমাণ খুব কমে যায় (৩ মিলি মোলের নিচে) তা হলে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর নাম হাইপোগ্লাইসিমিয়া। এর লক্ষণ:

— অসুস্থ বোধ হওয়া
— ঘাম দেখা দেয়া

— ক্ষুধা বৃদ্ধি পাওয়া
— বুক ধড়ফড় করা
— শরীর কাঁপতে থাকা
— অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

* কেন এবং কখন এসব লক্ষণ দেখা দেয় :
— ওষুধের (বড়ি বা ইনসুলিনের) পরিমাণ বেশি হলে
— খুব কম খেলে বা খেতে দেরি হলে
— ইনসুলিন নেয়ার পর খেতে দেরি করলে
— বেশি ব্যায়াম বা পরিশ্রম করলে।

* হাইপোগ্লাইসিমিয়া হলে কি করা উচিত :

লক্ষণ দেখা দিলে চা চামচের ৪ থকে ৮ চামচ চিনি এক গ্লাস পানিতে গুলিয়ে খেয়ে নিতে হবে বা খাইয়ে দিতে হবে। রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দিতে হয়। প্রয়োজনে তাঁকে হাসপাতালে পাঠান উচিত।

* ডায়াবেটিক কোমা :

অপর্যাপ্ত ইনসুলিন নিলে বা ইনসুলিন-নির্ভরশীল রোগী ইনসুলিন না নিলে বা বাদ দিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে শেষে এ বিপর্যয় দেখা দেয়। ইনসুলিনের অভাবে দেহে রক্তের শর্করা কাজে লাগতে না পেরে জ্বালানির জন্য চর্বি ব্যবহৃত হয়। ঠিকভাবে চর্বি না ভাঙার ফলে কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ (কিটোন) রক্তে বেড়ে গিয়ে মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। ফলে আস্তে আস্তে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। 'কিটোন' নামক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্রাবে দেখা দেয়। এ অবস্থাকেই ডায়াবেটিক কোমা বলা হয়।

* ডায়াবেটিক কোমার লক্ষণ :
— খুব বেশি পিপাসা লাগা
— ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
— শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়া
— দ্রুত শ্বাস নেয়া
— শ্বাসে মিষ্টি গন্ধ বের হওয়া
— বমি বমি ভাব হওয়া
— দুর্বল বোধ করা
— ঝিমান
— মাথা ধরা
— চোখে ঝাপসা দেখা।

* এ লক্ষণগুলো দেখা দিলে কি করতে হবে :
— অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরমার্শ নিতে হবে।

— নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠাতে হবে।
— ইনসুলিনের রোগী হলে পরিমাণ বাড়াতে হবে।

ডায়াবেটিস-এ জীবনধারা

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ এমন একটি অবস্থা যাকে শুধু রোগ হিসেবে ধরে নেয়া সঠিক হবে না বরং বলতে হবে এমন একটি অবস্থা যার সাথে খাপ খাইয়ে চললে হতাশার কারণ থাকে না। বস্তুতঃ রোগটিকে জীবনসঙ্গী হিসেবে মেনে নিয়ে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে সুখময় জীবন যাপন সম্ভব। এই শর্ত পূরণের চাহিদা তিনটি —

(১) শৃঙ্খলা
(২) নিয়ন্ত্রিত খাবার
(৩) প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার।

শৃঙ্খলা এবং নিয়মিত খাবার একই পর্যায়ে পড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম কিংবা শারীরিক পরিশ্রম, অধিক কিংবা অল্প আহার বর্জন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, শৃঙ্খলা এবং নিয়মের অপরিহার্য অঙ্গ। খাবার, বিশেষ করে, মিষ্টির প্রতি লোভ বিপদের ঝুঁকি আনে, রোগ নিয়ন্ত্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, উপসর্গ দেখা দেয়। ইনসুলিন, খাবার টেবলেট কিংবা উভয়ই যেটা যেখানে প্রযোজ্য সঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চালাতে হবে। যেহেতু ইনসুলিনের ইন্‌জেক্‌শন যেখানে সেখানে দেয়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে নিতে হয়, তাই প্রতিটি রোগীকে নিজের ইন্‌জেক্‌শন নিজে নেবার অভ্যাস করতেই হবে। শুধু তাঁদের বেলায় ব্যতিক্রম, যাঁরা —

(১) অন্ধ
(২) যাঁদের হাত নেই
(৩) যাঁরা বিকৃতমস্তিষ্ক।

খাবার নিয়ে ভুল ধারণা অনেক। সমস্যাও কম নয়। মধু নিয়ে এক মজার ব্যাপার। এর উপকারিতা অনেক রোগে প্রমাণিত। কাশি হলে মধুর ব্যবহার শুধু গ্রামে-গঞ্জে নয়, শহরেও। এমনকি শিক্ষিত চিকিৎসকের কাছ থেকেও উপদেশ পাওয়া যায়। ডায়াবেটিসে মধুর ব্যবহার অনেকে ভুলবশতঃ উপকারী মনে করেন

কিন্তু আসলে সেটা বিপদজনক।

যে সমস্ত খাবার একজন ডায়াবেটিস রোগী বিনা দ্বিধায় খেতে পারেন আর যেগুলো একেবারে নিষিদ্ধ এই দু'শ্রেণীর তালিকা সামনে রেখে খাবার নিয়ন্ত্রণ করলে ভুল করার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। সেই হিসেবে এই দু'টোর তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

ক. যেগুলো খাওয়ার নিষেধ নেই :

সব রকমের শাক, যেমন : পালং শাক, লাল শাক, পুঁই শাক, কলমি শাক ইত্যাদি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, ওলকপি, কাঁচা টমেটো, কাঁচা পেপে, কাঁচা মরিচ, বেগুন, শসা, খিরা, উচ্ছে, করলা, ঝিংগা, চিচিংগা, ধুন্দল, পটল, চালকুমড়া, ডাঁটা, সজিনা, পাকা টমেটো, কালোজাম, লেবু, জাম্বুরা, আমড়া, কামরাঙ্গা, বাঙ্গি, জামরুল, আমলকী, কচি ডাবের পানি, চা বা কফি (চিনি ছাড়া), মশলা (হলুদ মরিচ ধনে ইত্যাদি), আদা, রসুন, পিঁয়াজ ইত্যাদি, এসেন্স (ভ্যানিলা ইত্যাদি), ভিনেগার, জেলাটিন, আচার (মিষ্টি ছাড়া), সুইটেক্স, স্যাকারিন ইত্যাদি।

খ. যেগুলো খাওয়া নিষেধ :

চিনি, চিনি দিয়ে তৈরি খাবার, যেমন : কেক, পেস্ট্রি, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি। গ্লুকোজ, গুড়, খেজুরের রস, তালের রস, মধু, মিষ্টি, মিছরি, মিষ্টি দুধ, মিষ্টি বিস্কুট, মিষ্টি পিঠা ইত্যাদি। সফ্ট্ ড্রিংক যেমন : কোকাকোলা, সেভেন-আপ, ফান্টা, মিরিন্ডা, স্প্রাইট ইত্যাদি।

ইনসুলিন সম্বন্ধে দু'এক কথা

অনেক ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসার জন্য ইনসুলিন নেয়ার প্রয়োজন হয়। তাই ইনসুলিন সম্বন্ধে দু'এক কথা জেনে রাখা ভাল।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দু'ধরনের ইনসুলিন ব্যবহার করা হয় —

১. সল্যুবল বা দ্রবণীয় (রেগুলার, নিউট্রাল, একট্র্যাপিড ইত্যাদি)

২. ইনসল্যুবল বা অদ্রবণীয় (লেন্টি, এনপিএইচ, মনোটার্ড ইত্যাদি)।

প্রথমটি দেখতে পানির মতো স্বচ্ছ ; এর কাজ শুরু হয় ৩০ মিনিট পরে ; ২ থেকে ৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি কাজ করে এবং এর কাজের স্থিতিকাল ৬ থেকে ১০ ঘণ্টা।

দ্বিতীয়টি দেখতে ঘোলাটে ; এর কাজ শুরু হয় ১$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা পরে ; ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত এটি সবচেয়ে বেশি কাজ করে, আর এর কাজের স্থিতিকাল ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। ইনসুলিন ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা প্রয়োজন ; তা না হলে এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এক মাসের বেশি রাখতে হলে ফ্রিজে ৪° - ৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

প্রতিরোধে সমাধান

ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর' অর্থাৎ প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে শ্রেয়। রোগ হওয়ার আগে প্রতিরোধ করা যেমন সহজ, তেমনি কম ব্যয়বহুলও বটে। অধিকন্তু, রোগের ভোগান্তি ও জটিলতা থেকেও মুক্ত থাকা যায়।

প্রতিদিন সারা দুনিয়ায় প্রায় ৪১,০০০ শিশু মারা যাচ্ছে। এদের প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন বাংলাদেশী। প্রতি ঘণ্টায় নিঃশেষিত হয় প্রায় ১০০টি প্রাণ। প্রত্যেক বছর বাংলাদেশের ৮/৯ লাখ পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। আমাদের দেশে যত শিশু মারা যায় তার প্রায় প্রতি তিন ভাগের এক ভাগ মারা যায় ছয়টি সংক্রামক রোগে, যেগুলো সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। সময়মতো প্রতিষেধক টিকা না দেয়ার ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর এইসব রোগে পাঁচ বছরের কমবয়সী প্রায় ২,৫০,০০০ শিশু মারা যায়। আর প্রায় সমান সংখ্যক শিশু ঐসব রোগের কারণে প্রতিবন্ধীর জীবন যাপন করে। এই অকালমৃত্যু থেকে বেশির ভাগকেই বাঁচান যায় সামান্য খরচে। এ সত্ত্বেও যখন অসংখ্য অকালমৃত্যু ঘটছে তখন আমরা প্রত্যেকে প্রতিটি মৃত্যুর জন্য দায়ী।

প্রথমে আসে ধনুষ্টংকারের কথা। এ রোগেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়। জন্মের প্রথম সপ্তাহেই আঘাত হানে ধনুষ্টংকার। জন্মের পর বাঁশের কঞ্চি, পুরানো ব্লেড বা যে কোন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাচ্চার নাভি কাটলে সহজেই ধনুষ্টংকারের সংক্রমণ ঘটে। শিশু দুধ টানতে পারে না। ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। খিচুনি শুরু হয়। শিশু ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায়।

আক্রান্ত রোগীর দশদিনের মধ্যেই মৃত্যু হতে পারে। মা যদি শিশুর জন্মের কমপক্ষে দু'মাস আগে এক মাস অন্তর দু'টি টিকা নেন তাহলে তিনি এবং তাঁর অনাগত সন্তান উভয়েই নিরাপদ থাকবেন।

আর একটি রোগের নাম হাম যা অত্যন্ত সংক্রামক। যেখানে টিকা দেয়ার ব্যবস্থা নেই সেখানে এই রোগ প্রায় মহামারী আকারে দেখা দেয়।

প্রথমে জ্বর, সর্দি-কাশির মতো লক্ষণ দেখা দিবে। চার-পাঁচ দিন পর প্রথমে কানের পিছনে, মাথায় চুলের গোড়ার দিকে (**Border**) মুখমণ্ডলে ও পরে সারা শরীরে ছোট ছোট দানার মতো দেখা দেয়।

গায়ে দানা বেরুবার সময় বাচ্চার খিচুনি হতে পারে । মগজের প্রদাহের ফলে বাচ্চা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

এই রোগ শরীরে স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দিতে পারে। অপুষ্ট শিশুদের বেলায় নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। হাম থেকে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, মস্তিষ্কের ক্ষতি, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মাতৃপ্রাপ্ত এন্টিবডিই রোগপ্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। ৯ মাস থেকে ১০ বছর বয়সের মধ্যে হামের একমাত্রা টিকা নিয়ে এই মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

যক্ষ্মা আর একটি প্রতিরোধযোগ্য অসুখ। বাংলাদেশে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হন। ছোট-বড় সবার এ রোগ হতে পারে। শহর ও পল্লীর ঘিঞ্জি এলাকায় যক্ষ্মার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। শরীরের যে কোন জায়গায়, এমনকি মস্তিষ্কেও এ রোগের আক্রমণ হতে পারে।

এর ফলে রোগী ক্রমশঃ দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে পড়েন। কখনও কখনও রোগী বহু বছর ধরে ভুগতে থাকলে শরীরের অপূরণীয় ক্ষতি, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। জন্মের পরপরই একমাত্রা যক্ষ্মার টিকা নিলে সারাজীবন এ রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বলতে গেলে বিনা খরচে এ রোগ প্রতিরোধ সম্ভব, অথচ এর চিকিৎসা খুব ব্যয়বহুল, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্য-পীড়িত দেশের জন্য।

শিশুদের আর একটি প্রধান সমস্যা হুপিং কাশি। কাশির দমকে শিশু ছটফট করে। সহজে কাশি থামতে চায় না। কাশতে কাশতে বমিও হতে পারে। এ রোগের সৃষ্ট জটিলতার মধ্যে অপুষ্টি, নিউমোনিয়া ও মস্তিষ্কের ব্যাধি উল্লেখযোগ্য। হুপিং কাশিতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি।

পোলিও শিশুদের আর একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগে হাজার হাজার শিশু সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ সামান্য জ্বর, মাথাব্যথা ইত্যাদি। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে

যেতে পারে। এই অসাড়তা স্থায়ী হয়ে এবং হাত-পা শুকিয়ে গিয়ে শিশু চিরতরে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়ক মাংসপেশী অসাড় হয়ে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে যা থেকে মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয়। শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়স থেকে ১ বছরের মধ্যে ১ মাস অন্তর ৩ মাত্রায় পোলিওর টিকা খাইয়ে সহজেই এই রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

ডিপথেরিয়ায় প্রথমে গলার সামান্য সংক্রমণ, যেমন জ্বর, গলাব্যথা ইত্যাদি দেখা দেয়। পরে মুখ থেকে লালা পড়া, ঘাড়ের গ্রন্থির বৃদ্ধি, টনসিলের উপর পাতলা আবরণ পড়া ইত্যাদি দেখা দেয়। খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করলে রোগীর গলা বসে যাওয়া, নাকী সুরে কথা বলা, নাক দিয়ে খাবার বের হয়ে আসা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে শিশু মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এতে শিশুর হৃদ্‌যন্ত্র আক্রমণ করতে পারে। হুপিং কাশি ও ধনুষ্টংকারের টিকার সাথে একত্রে তৈরি ডিপিটি নামক টিকা দিয়ে অতি সহজেই এই রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

ভ্যাকসিন বা রোগপ্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে অথবা কয়েক ফোঁটা ভ্যাকসিন খাইয়ে একটি শিশুকে ছয়টি রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। উন্নত দেশসমূহ টিকা দিয়ে শিশুমৃত্যুর হার বহুলাংশে কমিয়ে এনেছে।

জন্মের মুহূর্তটি হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বিপদজনক সময়। আর এই সময়টাতেই আক্রমণ করে টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার। মা যদি শিশুর জন্মের আগেই দু'টি টিটেনাস ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে নেন — তাহলে তিনি এবং তাঁর অনাগত সন্তান উভয়েই নিরাপদ থাকবেন। তাছাড়া সকল গর্ভবতী ও সন্তানধারণে সক্ষম ১৫ থেকে ৪৫ বছরের মহিলারাও টিটেনাসের টিকা নিতে পারেন। টিকা দেয়া ছাড়াও সাবধানতা ও নিয়মকানুন মেনে চললে অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। যেমন — ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পায়খানা ব্যবহার করা, খাওয়ার আগে সাবান বা ছাই দিয়ে ভাল করে হাত ধৌত করলে আমাশয়, ডায়রিয়া, কৃমির সংক্রমণ, সালমোনেলাজনিত খাদ্যের বিষক্রিয়া ও অন্যান্য অনেক পেটের পীড়া থেকে সহজেই মুক্ত থাকা যায়।

ভাইরাস-সংক্রমিত লিভারের ত্রুটির মারাত্মক রোগের নাম 'হেপাটাইটিস বি', যার প্রকোপ বাংলাদেশে কম নয়। এই রোগের ওষুধের চিকিৎসা নেই বললেই চলে অথচ টিকা দিয়ে অতি সহজেই এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

'এইডস' বর্তমান বিশ্বে একটি আতংক। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোক এই ঘাতক ব্যাধির শিকার। নিরাময়ের জন্য কোন ওষুধ নেই। শালীন জীবনযাপন করা,

সাবধানতা অবলম্বন ও সামাজিক আন্দোলনই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।

অন্ধত্ব মানুষের জীবনে একটি করুণ অধ্যায় এবং বাংলাদেশের মতো একটি দারিদ্র্য–পীড়িত দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক। বাংলাদেশে অন্ধ লোকের সংখ্যা ৫ লক্ষেরও বেশি। এঁদের মধ্যে স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা অনেক। ভিটামিন 'এ'–এর অভাবে শিশুদের 'কেরাটোম্যালাসিয়া' নামক চক্ষুরোগ হয়ে শিশু অন্ধ হয়ে যায়। ৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত ৬ মাস পর পর ২ লাখ ইউনিটের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভিটামিন 'এ' কেপসুল খাইয়ে অকালীন অন্ধত্ব থেকে শিশুদের রক্ষা করা যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন শিশু তার ৫ম জন্মদিনে পৌঁছুতে পারে না। প্রতি পাঁচ মিনিটে ৩৬টি শিশু জন্ম নেয়, এবং একই সময়ে মারা যায় ৮টি শিশু। জীবনের প্রথম বছরটিতে সকল শিশুকে প্রাণনাশকারী ছয়টি রোগের হাত থেকে বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে মা হবার মতো বয়সের সব মহিলাকেও। আর এজন্য আমাদের সকলের একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা মানুষ হিসেবে আমরা শিশুদের কাছে দায়ী থাকব। অন্য কথায়, প্রতিরোধযোগ্য রোগে লাখ লাখ শিশুর মৃত্যুর জন্য আমরাই দায়ী থাকব।

নেশা সর্বনাশা

নিঃসন্দেহে রোগ সৃষ্টির আগে রোগ নিরাময় কিংবা প্রতিরোধের কথা কেউ ভাবতে পারেনি। বলা যেতে পারে, আদি যুগে প্রথমে রোগের সৃষ্টি হয়। স্বভাবতঃই বাঁচবার তাগিদে রোগ নিরাময়ের প্রচেষ্টা এখান থেকেই শুরু। নানা প্রাকৃতিক উপায়ে গাছগাছড়া, ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে এবং অনেক সময় ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে চিকিৎসাপদ্ধতি বহুকাল আগে শুরু হয়েছিল কালের গতিতে তার বিলুপ্তি হয়নি।

আধুনিক ওষুধের আবির্ভাবের ফলে নতুন নতুন রাসায়নিক পদার্থ ওষুধের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এন্টিবায়োটিকের আবির্ভাব এবং বিস্তৃতি আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে নতুন ওষুধের আবির্ভাবে পুরাতন চিকিৎসাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটবে, রোগ সমস্যার সমাধান সহজতর হবে, জীবনযাত্রা অনেকটা নিরাপদ হবে। কিন্তু আসলে কি তাই? নতুন পদ্ধতির আবির্ভাবে পুরাতনের বিলুপ্তি ঘটেনি বরং বলতে গেলে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় এটা বিকশিত হয়েছে। কবিরাজি, ইউনানী, আয়ুবেদী এখন আর নিন্দিত কিংবা অবহেলিত নয়, পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ পদ্ধতির নতুন নামকরণ করেছে **Alternative Medicine** বা বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা।

অপরদিকে নতুন নতুন ওষুধের আবির্ভাবের ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে অনেক। বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কোন কোন সময় অকালমৃত্যুর কারণ হতে পারে। আবার অন্যদিকে শুধু কয়েকজনের জীবনকে নয়, পারিবারিক এবং গোটা সামাজিক জীবনকে একটা দুর্বিষহ অবস্থায় ফেলতে পারে। নির্ভরশীলতা কিংবা আসক্তি , ইংরেজিতে যাকে **Addiction** বলা হয় বর্তমান দুনিয়ায় একটা ব্যাপকতর সামাজিক সমস্যা।

এই আসক্তি এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে ব্যবহারকারী বিশেষ ওষুধ ব্যবহারে

বাধ্য হয়। যেমন করেই হোক এটা সংগ্রহ করে। ব্যবহারে ব্যাঘাত ঘটলে ওষুধের দুষ্প্রাপ্যতা কিংবা অন্য কারণে নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যেসব নেশাসৃষ্টিকারী দ্রব্য নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে বলে আমরা সর্বনাশা বলে অভিহিত করেছি সেগুলো হল প্রধানতঃ মরফিন, হিরোইন, প্যাথেডিন, কোকেন, মারিজুয়ানা, গাঁজা, ভাং ইত্যাদি। সম্প্রতি কোকেনের সাথে তামাক মিশিয়ে এক নতুন ধরনের মাদকদ্রব্য তৈরি হচ্ছে। তার নাম ভাজুকো। পশ্চিমা দেশগুলোতে এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। এছাড়া অনেক ধরনের ঘুমের ওষুধ নেশা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এককালীন প্রচলিত কফ্ সিরাপ (বর্তমানে নিষিদ্ধ ফেনসিডিল), ডায়াজিপাম, ডায়াজিপামের বিভিন্ন বাজারজাত ঘুমের ওষুধ নেশা সৃষ্টি করে। নেশাসৃষ্টিকারী ওষুধের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে তুলে ধরা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হল যাতে পাঠকগণ কিছুটা ধারণা করতে পারেন।

১। স্নায়ু-উত্তেজক : গাঁজা, ভাং, চরস, সিদ্ধি, ডেক্সিড্রিন, ম্যাথেড্রিন, বিটালিন, কোকেন।

২। স্নায়ু-নিস্তেজক (প্রশান্তিদায়ক/ নিদ্রা-আকর্ষক) : আফিম, মরফিন, প্যাথেডিন, হিরোইন, কোডিন, ডায়াজিপাম, বার্বিচুরিড, নানা ধরনের মদ, জিন, হুইস্কি, ভদকা।

৩। মায়াবিভ্রম-সৃষ্টিকারী : এলএসডি, মাসকোলিন ইত্যাদি।

এতদঞ্চলে গাঁজা এবং আফিম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। চীন এবং ভারতবর্ষে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো বরং গ্রহণযোগ্য ছিল, নিন্দনীয় ছিল না। মুসলিম সমাজে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো গ্রহণযোগ্য ছিল না, তবুও নানা কারণে সাম্প্রতিককালে নেশার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গাঁজা এবং হিরোইন প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়। হিরোইন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলেও এর অপব্যবহারের শিকার সমাজের প্রতিস্তর।

এশিয়ায় মাদকদ্রব্যের প্রধান উৎস হিসেবে তিনটি এলাকা চিহ্নিত।

১। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল

২। গোল্ডেন ক্রিসেন্ট

৩। গোল্ডেন ওয়েজ।

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মায়ানমার, থাইল্যান্ড এবং লাওসের পাহাড়িয়া অঞ্চল। এখানে পপি উৎপন্ন হয়। আর এই পপি থেকে পাওয়া যায় আফিম। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান এবং তুরস্কের সীমানা জুড়ে গোল্ডেন

ক্রিসেন্ট । এ এলাকাও পপির উৎস, তবে সিংহভাগ তৈরি হয় পাকিস্তানে। গোল্ডেন ওয়েজ অবস্থিত নেপাল এবং ভারত সীমান্তে। মারিজুয়ানা উৎপন্ন হয় থাইল্যান্ড, কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, ঘানা, ব্রাজিল, জামাইকা, গুয়েতেমালা, কলাম্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে। কোকেনের উৎপত্তিস্থল বিশেষভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা, কলাম্বিয়া, পেরু, ব্রাজিল ও বলিভিয়া। ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মরক্কো, জর্ডান ও জামাইকা হাসিস উৎপাদনে অগ্রণী। উৎসস্থল যাই হোক না কেন উৎপাদন এবং সরবরাহ নির্ভর করে চাহিদার উপর। আবার উৎপাদন এবং সরবরাহ থাকলে চাহিদার সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বে নেশার অভূতপূর্ব অগ্রগতির অন্যতম প্রধান কারণগুলো হল ধর্মহীনতা, সঙ্গদোষ, হতাশা, নৈতিক অবক্ষয়, দুর্বল পারিবারিক বন্ধন, কৌতূহল, অজ্ঞতা, মানসিক ব্যাধি, পারিবারিক প্রভাব, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, যৌবনের বিদ্রোহী মনোভাব, ব্যবসায়ীদের প্রচারণা।

আর্থিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রদেশ বাংলাদেশে নেশা কত সর্বনাশা হতে পারে তা কল্পনাতীত। নেশা অনুসারে খরচের পরিমাণ নির্ভর করলেও দু'–একটা উদাহরণ দিলে এর পরিমাণ বুঝা যাবে। একজন হিরোইন–আসক্ত যদি নিম্নমানের $\frac{১}{৮}$ মি. গ্রাম হিরোইন দৈনিক ব্যবহার করে তবে তার পেছনে খরচ হবে বছরে বিশ হাজার টাকা। বাংলাদেশে আনুমানিক এক লক্ষ হিরোইন আসক্তের জন্য বাৎসরিক ব্যয় হয় দু'শ কোটি টাকা। অনেকের হয়ত জানা নেই — ঢাকায় ১ গ্রাম হিরোইনের দাম চারশ থেকে পাঁচশ টাকা। একটি হিসেবে মদ্যপানের পিছনে খরচ হয় বছরে একশ কোটি টাকা। আর আফিম, মরফিন, প্যাথেডিন, এলএসডি, গাঁজা, চরস ইত্যাদির পিছনে খরচ হয় বছরে দু'শ কোটি টাকা। নেশার পিছনে তাহলে আমাদের সর্বমোট খরচ এসে দাঁড়ায় কমপক্ষে বছরে পাঁচশ কোটি টাকা। বাংলাদেশের মতো একটা দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে এই হিসেবে বুঝা যায় নেশার ব্যবসা কতটা লাভজনক ও দেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য কত মারাত্মক ক্ষতিকর।

এ বদভ্যাসের কুফল শুধু আর্থিক নয়, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক এবং সামাজিক বটে এবং প্রত্যেকটাই নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু আসক্ত ব্যক্তি অনেক সময় তার বিচার–বিবেচনা হারিয়ে ফেলে, সেহেতু যে–কোন অপকর্ম তাকে দিয়ে সম্ভব। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি থেকে রাজপথে দুর্ঘটনা যে–কোন কিছু সে করতে কিংবা ঘটাতে পারে। দৈনিক খবরের কাগজ উল্টালে এমন সব ঘটনা প্রায়ই

চোখে পড়ে। সমাজের অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে সাম্প্রতিককালে কয়েকটি মারাত্মক দুর্ঘটনা মাদক–আসক্তির পরিণতি।

মাদকদ্রব্যের উৎপাদন এবং সরবরাহের সাথে জড়িত বিশ্বের অন্যতম প্রধান এলাকা গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্টের কাছাকাছি বাংলাদেশের অবস্থান। স্বভাবতঃই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট। এ ব্যবসা কত লাভজনক তা কল্পনা করা যায় না। বিশ্ব জুড়ে এ ব্যবসা থেকে নানা উপায়ে উপার্জিত হয় হাজার হাজার কোটি টাকা। এর পিছনে জড়িত ব্যবসায়ীমহল এবং পাচারকারীরা সুনিপুণ এবং শক্তিশালী। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতার কাছাকাছি। ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভাবনাও কোন–না–কোন দেশে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এমন একটা সুনিপুণ শক্তিশালী বেড়াজালের মোকাবেলা করতে হলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সহযোগিতার সাথে শক্তিশালী করা নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এর চাহিদা কমান।

সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি করে সরকার এবং সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এমনকি মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান আছে। তবে মনে রাখতে হবে আইন প্রণয়ন করা সহজ হলেও এর সঠিক প্রয়োগ যদি না হয় সুফল আসবে কোথা থেকে? বরং আইনের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। একটা নৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন নেশাসৃষ্টিকারী বস্তু থেকে রেহাই পেতে হলে, সমাজকে নেশার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে কয়েকটি আশু পদক্ষেপ অপরিহার্য। যেমন :

১। নেশাসৃষ্টিকারী অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিষিদ্ধ ঘোষিত করতে হবে। যেমন : গাঁজা, হিরোইন, মাদকদ্রব্য।

২। নেশাসৃষ্টিকারী প্রয়োজনীয় ওষুধ বাজারজাতকরণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। এসমস্ত ওষুধ শুধু সরকারী এবং বেসরকারী হাসপাতালে উপযুক্ত প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে বিক্রি হবে এবং তাও সীমিত পরিমাণে।

৩। শিক্ষামূলক প্রচারণা দেশব্যাপী জোরদার করতে হবে। বিভিন্ন প্রচারপত্রের মাধ্যমে নেশাকে সর্বনাশা হিসেবে প্রতিফলিত করতে হবে।

৪। মসজিদ, মন্দির, গির্জা তথা বিভিন্ন উপাসনালয়ে আলোচনার মাধ্যমে সকলকে নেশা প্রতিরোধে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

৫। নেশাগ্রস্তদের অবহেলিত অধম হিসেবে দূরে ফেলে না রেখে সমাজে

বসবাসের উপযুক্ত উপার্জনক্ষম বাসিন্দা হিসেবে পুনর্বাসন করতে হবে। তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে।

৬। সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। বিনিময়ে এমন কিছু করতে হবে যাতে তারা উৎসাহিত হয়। নিজেদের অপদার্থ মনে না করে।

৭। নেশাসৃষ্টিকারী বস্তুর সাথে যারা বেআইনীভাবে জড়িত, যেমন বেআইনীভাবে আমদানি, সরবরাহ এবং বিক্রয় — তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

উপসংহারে বলব, নেশা সর্বনাশা — এ মহাসত্যকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বাংলাদেশে আইনের পাশাপাশি নৈতিকতাকে আমরা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। নেশা সম্বন্ধে ধর্মীয় নির্দেশ সুস্পষ্ট। এ নির্দেশ যদি যথাযথভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া যায়, ধর্মীয় নেতা, সমাজকর্মী এবং শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আচরণে এ নৈতিকতাকে সফলতার সাথে প্রতিফলিত করেন তাহলে এ সর্বনাশা বদভ্যাস এদেশ থেকে বিতাড়িত করা বিলম্বে হলেও একদিন না একদিন সম্ভব হবেই।

শতাব্দীর অভিশাপ এইডস্

এইডস্ প্রথম ধরা পড়ে ১৯৮১ সালে এবং এর ভাইরাসটি সনাক্ত করা হয় ১৯৮৪ সালে। শুরুতে কেউ ভাবতে পারেননি পরিস্থিতি এত দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বদলে যাবে। এই বিশ্বমহামারীটি এখন প্রতিদিন ৫ হাজার নতুন সংক্রমণের মধ্য দিয়ে বেড়ে চলেছে। ২০০০ সাল নাগাদ এইচ.আই.ভি.–আক্রান্ত পুরুষ–মহিলা–শিশুর সংখ্যা হবে ৩ থেকে ৪ কোটি এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু এইডস্ রোগীর সংখ্যা হবে ১ থেকে ১/২ কোটি। ধারণা করা হচ্ছে, বর্তমান বছরে সারা বিশ্বে প্রায় ১/২ কোটি শিশু এইডস্–এর কারণে মা হারাবে।

এইডস্-এর বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৯৩–তে প্রকাশিত 'উইক্‌লি এপিডেমিওলজিকেল রেকর্ড' অনুসারে এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু এইচ.আই.ভি.–আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ শিশু। জানুয়ারীর শুরু পর্যন্ত সংক্রমণ বেড়েছে প্রায় ১০ লক্ষ। অধিকাংশ নতুন সংক্রমণ ঘটেছে উপ–সাহারীয় আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায়।

বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে এইচ.আই.ভি.র অঞ্চলভিত্তিক সংক্রমণ নিম্নরূপ :

উপ–সাহারীয় আফ্রিকা	> ৭৫ লক্ষ
এমেরিকা	> ২০ "
দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া	> ১৫ "
পশ্চিম ইউরোপ	৫ "
উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য	৭৫ হাজার
পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য–এশিয়া	৫০ "
পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত–মহাসাগীরর অঞ্চল	> ২৫ "
অস্ট্রেলিয়া	> ২৫ "

কাজেই এই মহামারীটির প্রভাব গরিব দেশগুলোর উপর মারাত্মকভাবে পড়ে। এইচ.আই.ভি.-আক্রান্ত জনতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিকাশশীল দেশগুলোর অধিবাসী।

ধর্ম-বর্ণ-বয়স-লিঙ্গ নির্বিশেষে আক্রান্তের সংখ্যা যেহেতু বিপুল অনুপাতে বেড়ে চলেছে, তাই অনুমান করা যায় সমাজের এমন অনেক লোক অপমৃত্যুর শিকার হন যাঁরা অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম। এঁদের মধ্যে আছেন শিক্ষক, শ্রমিক, চিকিৎসক, সেবিকা, নির্মাতা, রাজনীতিবিদ প্রমুখ। অতএব এমন একটি স্বাস্থ্য-সমস্যা সম্বন্ধে সকলেরই জানা উচিত যেন তাঁরা এর মরণকামড় থেকে রক্ষা পান।

এইডস্ কি?

এইডস্ একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এই ভাইরাসের নাম হিউমেন ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, সংক্ষেপে এইচ.আই.ভি.। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সর্দি বা ফ্লু ভাইরাস যেমন কাশি-হাঁচির সাথে অন্যকে সংক্রমণ করতে পারে এইডস্ তেমনি বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না। যদিও এইডস্-এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চলছে, তবু এর সংক্রমণের প্রকৃতি নিয়ে রয়েছে কিছু কিছু বিভ্রান্তি। এটা এখন সর্বসম্মত যে, এইডস্ সংক্রমণের কেবল তিন পথ রয়েছে :

১. সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে সঙ্গমের ফলে সঙ্গমস্থানে ক্ষত হয়ে থাকলে কিংবা আগে থেকে ক্ষত থাকলে রক্তের মাধ্যমে এ ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
২. সংক্রমিত রক্ত অথবা রক্তজাত পদার্থ কাউকে দেয়া হলে, তার মাধ্যমে।
৩. সংক্রমিত মা থেকে শিশুতে।

দৈনন্দিন সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে কোন বিস্তার নয়

এটা অবশ্যই বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার, এ ভাইরাস যে যে প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করতে পারে না তার বিবরণ নিচে দেয়া হল :

১. নৈমিত্তিক সংস্পর্শ, যেমন করমর্দন, ছোঁয়া অথবা আলিঙ্গন,
২. শক্ত খাবার বা তরল খাবার, একই কাপ বা গ্লাস অনেকের ব্যবহার,

৩. কাশি ও হাঁচি,
৪. একই সাঁতার-জলাশয় অথবা শৌচাগার অনেকের ব্যবহার,
৫. মশা বা অন্যান্য কীটপতঙ্গের কামড়।

রক্ত ও রক্তজাত পদার্থের ভরণ (ট্রান্সফিউশন)

রক্ত বা রক্তজাত পদার্থের শরীরে ভরণ নিঃসন্দেহে কোন-কোন অবস্থায় আবশ্যক। রক্তক্ষরণ ও অন্যান্য কারণে রক্তাল্পতা নিঃসন্দেহে এমন একটি সচরাচর অবস্থা। রক্তভরণ অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই জীবনরক্ষাকারী। যথেষ্ট সাবধানতার অভাবে এ প্রক্রিয়াটি অবশ্য মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে।

রক্তভরণ ও সিরিঞ্জের মধ্য দিয়ে ভাইরাস হেপাটাইটিসের সংক্রমণ সম্বন্ধে আমরা বারবার সাবধান করেছি। কিন্তু রক্ত সরবরাহের বাণিজ্যিকীকরণ ঘটার সাথে সরবরাহ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়লেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা-ব্যবস্থা না থাকায় ভাইরাস হেপাটাইটিসের প্রকোপ বেড়ে গেছে। কখনও কখনও এর পরিণাম যকৃতের কর্মক্ষমতা লোপ (একিউট হেপাটিক ফেইলিওর), ক্রনিক হেপাটাইটিস এবং যকৃৎ-কোষের কর্কটরোগের (হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা) মতো দুর্ভাগ্যজনক হতে পারে। এ শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য পেশাদার রক্তদাতারা কোন অংশে কম দায়ী নন।

রক্ত ও রক্তজাত পদার্থ বেয়ে এইডস্ ভাইরাসের সংক্রমণের সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এর বর্ণনা দেয়া দরকার। সংক্রমিত সুই ও সিরিঞ্জের মধ্য দিয়ে এর সংক্রমণ ঘটতে পারে। মাদকাসক্তদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা বিকশিত দেশে দেশে এইডস্ সংক্রমণের প্রচ্ছন্ন উৎস হিসেবে কাজ করে। কোন ব্যক্তি যত বেশিবার সুই ফোঁড়ে অথবা অন্যদের মাদকসেবন-সরঞ্জাম ব্যবহার করে, সুই-সিরিঞ্জ পথে সংক্রমণের ঝুঁকি তত বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক নিরীক্ষায় ধরা পড়েছে, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি দ্রুত বেড়ে চলেছে ; পরিণত হয়েছে এক হুমকিতে।

এইচ.আই.ভি. রোগ বিস্তারের বিভিন্ন স্তর

মানবদেহে এইচ.আই.ভি. বা এইডস্ রোগ বিভিন্ন স্তরে বিস্তার লাভ করে, ব্যক্তিবিশেষে যার তারতম্য হতে পারে।

প্রথম স্তর : এইচ.আই.ভি. ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকে। এ স্তরে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ থাকেন কিন্তু তিনি রোগ সংক্রমণ করতে পারেন।

দ্বিতীয় স্তর : এই স্তরে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে এক বিশেষ রক্ত পরীক্ষায় উক্ত ভাইরাসের এন্টিবডি পাওয়া যায়। আক্রান্ত ব্যক্তি দশ বছর বা তারও অধিককাল সুস্থ থাকলেও এ সময়ে তিন রোগ সংক্রমণ করতে পারেন।

তৃতীয় স্তর : এ সময়ে প্রাথমিক লক্ষণসমূহ দেখা দেবে, যেমন — শরীরের ওজন খুবই কমে যাওয়া, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, রাতের বেলা শরীর প্রচুর ঘামা, চর্মরোগ এবং দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া ইত্যাদি।

আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কোন প্রকার লক্ষণ না থাকলেও যে-কোন স্তরে যৌনকর্ম, তার ব্যবহৃত সিরিন্জ বা সুইয়ের মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে।

চতুর্থ স্তর : এইডস্ ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের রোগপ্রতিরোধ-শক্তিকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দেয়। ফলে ঐ ব্যক্তির নিমোনিয়া, অন্যান্য ইনফেক্শন, ক্যান্সার এমনকি মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই স্তরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এইডস্-এর রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এ রোগের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন ব্যক্তির দেহে বিভিন্ন রকমে হতে পারে। কোন কোন আক্রান্ত ব্যক্তি অতি তাড়াতাড়ি মারা যান। কিন্তু আজকাল এইডস্-এ আক্রান্ত ব্যক্তির বিভিন্ন লক্ষণ চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। কিছু রোগসংক্রমণ এখন প্রতিরোধ করাও সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ এইডস্-এ আক্রান্ত ব্যক্তি এখন পূর্বের তুলনায় বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেন।

এইডস্ রোগ নিরাময় হয় না কিন্তু কিছু কিছু ওষুধ এইডস্ ভাইরাস বহনকারী ব্যক্তিকে এ রোগের লক্ষণ থেকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

এইডস্ দুরারোগ্য

মাঝে মাঝে দাবি করা হয়, এ রোগের নিরাময় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কার্যকর টিকা বের হতে দেরি নেই। এসব সত্ত্বেও সবিনয়ে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে — এইডস্ দুরারোগ্য। এইডস্ ভাইরাস যাদের দেহে একবার সংক্রমিত হয়েছে তাঁদের

প্রত্যেকের জন্য প্রচ্ছন্নভাবে মারাত্মক। এ রোগে মৃত্যু অবধারিত। শুধু সময়ের ব্যাপার। তাও কয়েক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রতিরোধ

এ ধরনের বিস্তার রোধের জন্য সরল নির্দেশ বা উপদেশ হল :
যদি আপনি মাদকাসক্ত না হন তবে তা থেকে দূরে থাকুন। এর শিকার হবেন না।
যদি আপনি মাদকাসক্ত হন তবে সুই ব্যবহার করবেন না।

যদি আপনি সুই ফোঁড়েন তবে জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন, কখনও অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করবেন না।

মাদকাসক্তিকে কখনই উৎসাহিত করা উচিত নয়। এ কদভ্যাস নির্মূল করার সমস্ত উপায় অবলম্বন করতে হবে।

শুধু অন্য কোন উপায় না থাকলেই সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র সেখানেই ইন্‌জেক্‌শন ব্যবহার করতে হবে যেখানে :

১. মুখে খাওয়ার ওষুধ নেই।
২. মুখে খাওয়ান সম্ভব নয়, যেমন রোগী অজ্ঞান কিম্বা মুখ খুলতে পারেন না বা গিলতে পারেন না, কিম্বা বারবার বমি করেন।
৩. ওষুধের তাৎক্ষণিক সুফল দরকার, নইলে বিপদ হতে পারে।
৪. মুখে খাওয়ার ওষুধ সুলভ নয় কিম্বা বাজারে নেই।

আমাদের দেশে ইন্‌জেক্‌শনের অনাবশ্যক প্রয়োগ ও জীবাণু–অমুক্ত সিরিঞ্জের ব্যবহার নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাণিজ্যিক বিবেচনা বা ভুল ধারণাবশে প্রায়শঃ এমনটা করা হয়। যে বিপদ ঘটতে পারে, তার সম্পূর্ণ জ্ঞান এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এটা দুঃখজনক।

যেসব মাদকাসক্ত ইন্‌জেক্‌শন নেয়া থামাতে পারে না বা থামাবে না, তাদের জন্য কোন কোন দেশে জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমাদের আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষায় অনেক পাশ্চাত্য পদ্ধতি চালু করা যায় না কিম্বা করা আদৌ উচিত নয়।

যেসব পদ্ধতিতে চামড়া বিদ্ধ করতে হয়, যেমন আকুপাংচার ও উল্কিকরণ, তাতে জীবাণুমুক্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। নয়ত ঝুঁকি থেকে যাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে আকুপাংচারের অপপ্রয়োগ বেড়েছে। যেখানে–সেখানে যার–

তার হাতে এর অপব্যবহার। এতে এই সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসাপদ্ধতির অপযশ ঘটার পাশাপশি আলোচ্য রোগের বিস্তারও ঘটছে।

রক্তবাহিত সংক্রমণ অনেক বিকাশশীল দেশে প্রকটাকারে বিদ্যমান। বাংলাদেশে ভাইরাল হেপাটাইটিস ও এইচ.আই.ভি. দু'টোর বেলাতেই তা প্রাসঙ্গিক।

এ প্রকৃতির সংক্রমণ রোধ করার কয়েকটি বিশেষ উপায় হল :

১. অনাবশ্যক রক্তভরণ বর্জন,

২. এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ ও হেপাটাইটিস এন্টিজেন (HB_S A_g) আছে কিনা দেখার জন্য রক্তদাতাদের পরীক্ষা,

৩. তাপ–পরিচর্যিত **(Heat-Treated)** রক্তজাত পদার্থের ব্যবহার।

রক্তদাতাদের নাম থেকে পেশাদার দাতাদের নাম আদর্শগতভাবে বাদ দেয়া উচিত। কিন্তু বিরাজমান পরিস্থিতিতে এ দেশে তা করা সম্ভব না। যত বেশি সংখ্যায় জনসাধারণ রক্ত দিতে এগিয়ে আসবেন, পেশাদার দাতাবর্গ ততই সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে পড়তে অবশেষে হারিয়ে যাবেন। স্বেচ্ছাদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর শক্তিশালী উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম খুবই বাঞ্ছনীয়। 'সন্ধানী' তার প্রভূত প্রমাণ রেখেছে। এ সংগঠনের রক্তদান কর্মসূচী অনেক।

আদর্শ পরিস্থিতি সৃষ্টি সময়সাপেক্ষ। তবুও চিকিৎসকদের বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে এইডস্ ও ভাইরাল হেপাটাইটিস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের। রক্তভরণের ব্যবস্থা দেবার সময় নৈতিক বিধিলঙ্ঘন যেন কিছুতেই না হয়। আমরা এ উপকারী চিকিৎসাপদ্ধতি নির্মূল করতে পারি না, তেমনি একে মারাত্মক ক'রে তুলতে পারি না চিকিৎসাধীন রোগীর জন্য।

রক্তভরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি নীতি মানতে হবে :

১. প্রয়োজন না থাকলে শরীরে রক্ত দেবেন না।

২. শরীরে রক্ত দেবেন যখন তা জীবনরক্ষাকর।

৩. পেশাদার রক্তদাতাদের এড়িয়ে যাবেন। এদের রক্ত নিরাপদ নয়।

৪. এইচ.আই.ভি. ও এইচ.বি.এস.এজি. সংক্রমণের জন্য সবসময় দাতাদের পরীক্ষা করুন। এ সংক্রমণমুক্ত না হলে রক্ত বিপদজনক। আপনার সংক্রমণ হবে।

এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের ব্যাপারে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে রক্ত ও রক্তজাত পদার্থ ভরণের চেয়ে যৌনসঙ্গম খুবই অল্প গুরুত্ব বহন

করে। বিদেশ থেকে ফেরা এদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। কেননা এঁরা সংক্রমিত থাকলে তা প্রথমে স্ত্রীর ও পরে শিশুর মধ্যে ছড়াবে। কাজেই যেসব দেশে বিপুল সংখ্যায় এইডস্ রোগী পাওয়া গেছে সেসব দেশে কাজ-করা ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষা করা সুসঙ্গত।

এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত মায়েদের প্রায় অর্ধেক শিশুর রক্তে এ জীবাণু থাকে। তারা সংক্রমিত হতে পারে প্রসবের আগে, ঠিক পরে, অথবা প্রসবের সময়। মায়েরা যৌনসঙ্গী বা অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালে দেয়া রক্ত থেকে সংক্রমিত হতে পারেন। গর্ভধারণের প্রথমদিকেই যেসব মহিলা এইচ.আই.ভি.র লক্ষণ দেখাতে শুরু করেন, তাঁদেরকে গর্ভপাতের সুযোগ দেয়া উচিত।

বাংলাদেশ এখন আর এইডস্-মুক্ত নয়। একজন বাংলাদেশীর রোগ নথিবদ্ধ করা হয়েছে। আরো আটজনের এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের তথ্য পাওয়া গেছে। সঠিক সংখ্যা আসন্ন ভবিষ্যতেও প্রকাশ পাবে বলে মনে হয় না। পেশাদার রক্তদাতা, পতিতা এবং বিদেশে কাজ-করা শ্রমিকরা সংক্রমণের প্রচ্ছন্ন উৎস।

বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যেই এ পর্যন্ত সংক্রমণ ধরা পড়েছে।

কার্যকর ওষুধ বা টিকার অভাবের মধ্যে প্রতিরোধই হল এইডস্-এর বিরুদ্ধে একমাত্র হাতিয়ার। এটা আমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে। প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব প্রধানতম। স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য বাংলাদেশে ধর্মীয় নেতাদের, যেমন মসজিদের ইমামবর্গকে, ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশ হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এর জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মুসলিম।

এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে একটি মসজিদও নেই। এমন মসজিদও নেই যেখানে নেই ইমাম। স্থানীয়ভাবে একজন ইমাম খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। এ ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম সম্পূর্ণ সচেতন।

ইসলামিক মেডিকেল মিশন এ পর্যন্ত অনেক ইমামকে জনস্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের বাস্তবায়নে ইমামবর্গ ন্যূনতম ব্যয়ে কত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেন এ অভিজ্ঞতা তা বিশদভাবে ইঙ্গিত করে।

ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা এইডস্-এর অভিশাপ প্রতিরোধের ও নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে শক্তিধর অস্ত্র।

সারাদেশে ইমামগণ সুবিস্তৃত জালের মতো ছড়িয়ে আছেন। প্রতিটি এলাকায় তাঁদের প্রভাব, জনগণের সাথে তাঁদের মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান এক বলিষ্ঠ সংযোগ। যান্ত্রিক যুগের সুবিধে, যেমন রেডিও, টেলিভিশন যেখানে পৌঁছতে পারে না, খবরের কাগজ ইত্যাদি যাঁদের নাগালের বাইরে কিংবা যাঁরা পড়ালেখা জানেন না কিংবা যাঁদের বুঝবার শক্তি কম তাঁদের সংখ্যা নগণ্য নয়। বরং এ পর্যন্ত যাঁদের শরীরে এ রোগজীবাণু ধরা পড়েছে তাঁদের সংক্রমণ বিদেশে হলেও তাঁরাও আমাদের অবহেলিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের।

এককথায় যেখানে এইডস্ বিস্তারের সম্ভাবনা বেশি সেখানে আধুনিক গণমাধ্যম পৌঁছয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে পৌঁছলেও অনেকের বুঝবার বা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা নেই।

মোটামুটিভাবে এ সকল লোক সরলপ্রাণ, ধর্মের প্রতি অনীহা নেই ; অনুরাগ আছে। একটুখানি দিকনির্দেশনা পেলে তাঁরা সৎপথে চলতে আগ্রহী। ধর্মীয় অনুশাসন তাঁদের উপর প্রভাব ফেলে। আগেই বলা হয়েছে, ইমামদের তাঁরা শ্রদ্ধা করেন।

এ সকল কারণে যদি ইমামগণ এইডস্-এর বিপদ, পরিণতি এবং ধর্মীয় নির্দেশ সম্বন্ধে তাঁদের ওয়াকেবহাল করে সাবধান করে দেন তবে এর সুফল হতে বাধ্য।

সবশেষে জোর দিয়ে বলতেই হবে, এইডস্ হল মানবাচরণের একটি রোগ। এর মধ্যে যৌন, পেশাদারী, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সব রকম আচরণ পড়ে। এসব ক্ষেত্রেই যদি আমরা আমাদের আচরণ না বদলাই, তবে সমস্যাটা থেকে যাবে অপরাভূত। এদেশের চিকিৎসকসমাজের মুখ্য দায়িত্ব রয়েছে। ধর্মনেতাদেরও। যদি এঁদের একপক্ষ অবহেলা ও অজ্ঞতায় দোষী হতে পারেন, অন্যপক্ষও অব্যাহতি পাবেন না।

প্রশান্তিতে মুক্তি

প্রতিটি চিকিৎসকই প্রতিনিয়ত এমন সব রোগীর বা সমস্যার সংস্পর্শে আসেন যার সাথে টেনশন কোনও–না–কোনভাবে জড়িত। দেখা গেছে হাসপাতালের বহির্বিভাগে যাঁরা যান তাঁদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ রোগীর কোনও ওষুধের প্রয়োজন হয় না। এমন অনেকেই আছেন যাঁদের ওষুধের তালিকা হিসেব করলে বেশ কিছুক্ষণ লাগবে। ওগুলোর নাম লিখতে গেলে আরও বেশি সময় লাগবে। আর খরচের হিসেব দেখতে গেলে নিশ্চয়ই টেনশনের উদ্রেক হবে। এর কারণ কি?

কারণ হল আমরা যেগুলোকে রোগ বলি সেগুলো আসলে কিন্তু এক ধরনের টেনশন অর্থাৎ মনের অস্থিরতা। কিংবা মনের সুস্থতার অভাব অর্থাৎ অসুখ। সহজ কথাতেই বলি। অসুখ মানে অ–সুখ। যেখানে সুখের অভাব, সেটাই অসুখ।

অসুখের এ নতুন সংজ্ঞা ধরে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে চিকিৎসা শুধু ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে সম্পূর্ণ হয় না। দোকানের ওষুধ ছাড়াও রোগীর পরিবার পরিপার্শ্ব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে আমরা অনেককে অতি সহজেই সুস্থ করে তুলতে পারি। অনেকেই বলে থাকেন, আমার শ্রদ্ধেয় একজন শিক্ষকও বলতেন, কেউ যদি বলে জীবনে সে একবারও আমাশয়ে ভুগেনি তাহলে হয় সে বেকুব, নয় মিথ্যাবাদী, দু'টোর একটা হবেই । আপনাদের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আমাশয়ে ভুগছেন। শেষ পর্যন্ত কোনও ওষুধেই কাজ হয় না। বড় বড় ডাক্তারের কাছে গেলে নতুন ওষুধ দেখে নতুন বিশ্বাসও তৈরি হয় এবং ১০/১২ দিন বেশ ভালই লাগে। টেনশনও তখন থাকে না। পরে আবার ধীরে ধীরে কোনও–না–কোনভাবে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এমনিভাবে রোগ—ডাক্তার—ওষুধ—বিশ্বাস—রোগমুক্তি—আবার–রোগ–এরএকটি বিষচক্র চল–তে থাকে ।

মাথা ব্যথার বেলায়ও এটি হতে পারে। আসলে শুধু মাথা কেন, শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেকোন জায়গায় এ ধরনের ব্যথা হতে পারে। এই মুহূর্তে যদি

চিন্তা করেন শরীরের যেকোন জায়গায় কিংবা আপনার মাথায় ব্যথা হচ্ছে তাহলে নিশ্চিত করে বলতে পারি অনেকেই মাথার ব্যথায় ভুগতে শুরু করবেন। কেউ যদি ভাবেন 'এখন যে অবস্থায় আছি তাতে বাইরে যাওয়া ভয়ের ব্যাপার, যদি হঠাৎ প্রকৃতির ডাক আসে অর্থাৎ সোজা কথায় প্রস্রাবের উদ্রেক হয়?' — তাহলে হবেও তাই। আসলে এর প্রয়োজনীয়তা মনেই সৃষ্টি হল।

আসলে শরীরের চেয়ে মন অনেক বেশি শক্তিশালী। একটু আগেই জেনেছেন মনের প্রভাবে শরীরের কি অবস্থা হতে পারে। আমি দেখেছি যারা বেকুব তারা ভুগে কম, তাদের চিন্তাশক্তি কম। হয়ত রাস্তায় একটা পাগলকে হাঁটতে দেখলেন। তার একটা হাত নেই, তবু সে দিব্যি আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের কেউ হাঁটছে, কেউ হাসছে, কেউ গান গাচ্ছে। তাদের চিন্তাশক্তি নেই বলে তারা চিন্তামুক্ত। চিন্তামুক্ত বলেই তারা কাজ করতে পারে।

অন্যদিক থেকে বিবেচনা করুন। যে জিনিসটাকে আপনি ধরতে পারেন না, দেখতে পারেন না, নাড়তে পারেন না সেটা হচ্ছে চিন্তা — মনের দুশ্চিন্তা। সেই চিন্তা এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করে যার স্বাদ আছে, যা দেখা যায়, পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা যায়। সেটা হচ্ছে চোখের পানি, যা মনের কষ্ট থেকে উৎপন্ন হয়। চিন্তা বা কষ্ট দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু এর থেকে জন্ম নেয়া চোখের পানি দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়। সম্প্রতি আরেকটি তথ্য পাওয়া গেছে যে চিন্তার মতো মনের দুর্দমনীয় বলের প্রভাবে শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে এমন একটি পদার্থ তৈরি হয় যা রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ায়, এমনকি রোগ নিমূর্লেও সাহায্য করে। মনোকষ্ট থেকে যদি রাসায়নিক পদার্থ রূপে চোখের পানি আসতে পারে তাহলে মনের অবস্থা থেকে অন্য রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টিও সম্ভব।

এখন আমার জীবন থেকে দু'টো তথ্য তুলে ধরতে চাই। প্রথমটি আমাকে নিয়ে। দ্বিতীয়টি আমার মাকে ঘিরে।

প্রতিটি ছাত্রের সামনে পরীক্ষা একটা বিকট চ্যালেঞ্জ। সবাই কিছু না কিছু ভয় করবেই। যে স্তরেরই ছাত্র হোক না কেন। সে ভয় থেকে আমিও মুক্ত ছিলাম না। এর মোকাবেলা করতে গিয়ে যে দু'টি শক্তির উপর নির্ভর করতাম সেগুলো ছিল আত্মবিশ্বাস এবং মায়ের দোয়া। বলতে গেলে ডিগ্রী লাভের পর্যায়ে জীবনের শেষ পরীক্ষা ছিল এম.আর.সি.পি.। প্রথমবারে পাস করা স্বপ্নের মতো, অনেকটা অবাস্তব। ভেবেছিলাম পরীক্ষা দিয়ে ফেল করার দুঃসংবাদ আমার ভাগ্যে হয়ত জুটবে। সে ভয়ে ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম। মাকে যদি না বলি দ্বিতীয় সম্বল অর্থাৎ তাঁর দোয়া থেকে বঞ্চিত হব বলে পরীক্ষার তারিখ এবং সময় জানিয়ে তাঁর কাছে চিঠি লিখলাম দোয়া করতে। এতে আমার মনের সাহস বাড়ল বহুগুণ। পরীক্ষা

শান্ত মন নিয়ে নির্ভয়ে দিলাম। আমার সফলতায় অনেকেই হতবাক্ হয়েছিলেন। এমনকি তারবার্তায় এ সুখবর যখন দেশে পৌঁছে কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলেন আমাকে অপদস্থ করবার জন্য কেউ একটা বানোয়াট খবর পাঠিয়েছে। ব্যাপারটা মায়ের জানা ছিল বলে তিনি অবাক হননি। পরে সকলে জানতে পারলেন। ভয় এবং মনের অশান্তি জীবনের প্রতি স্তরে মানুষকে কত দুর্বল করে দেয় তার সীমা নেই।

সম্মেলন এবং অন্যান্য নানা কাজে বহুবার আমাকে বিদেশ যেতে হয়েছে। এমন সময়ে কয়েকবারই মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসা করতে আমার বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না। বস্তুতঃ তাঁর স্নেহধন্য চিকিৎসক অনেকেই তাঁকে দেখতে আসতেন, হয় বাড়িতে নাহয় হাসপাতালে যেখানে তিনি থাকুন না কেন। ফলে অধিকাংশক্ষেত্রে ওষুধের সংখ্যা বেড়ে যেত। তিনি ওষুধ খাবেন না। বলতেন, 'তোমরা ভেব না। আমি ইনশাল্লাহ্ ভাল হয়ে যাব।' স্ত্রী বিদেশে ফোন করলে আমি নির্দেশ দিতাম হয় সব ওষুধ বন্ধ করে দিতে নাহয় অত্যাবশ্যকীয় একটি কিংবা দু'টো ওষুধ রাখতে। এমনি করে বহুবার তাঁকে ভাল হয়ে উঠতে দেখেছি। মনোবল রোগমুক্তির কত সহায়ক হতে পারে আমার মা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

এছাড়া আমার মায়ের অদ্ভুত সাহসের দৃষ্টান্ত মেলে ১৯৭১ সালের কোন এক রাতের গভীরে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। যেকোন সময় উপরে এসে আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। আমি আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে এবং নিকট আত্মীয় ডা: আবদুল ওয়াদুদ সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। আমরা সবাই দোতলায়। সবাইকে অভয় দিয়ে মা সিঁড়ির পাশে প্রথম কামরায় বসে রইলেন। যদি হানাদার বাহিনী উপরে আসে তাদের মোকাবেলা করতে। শেষ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটেনি। মায়ের অসীম সাহস সে সময়ে আমাদের কত প্রয়োজন ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা অনুভব করা কঠিন। পরম করুণাময়ের উপর আত্মসমর্পণ এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে চিন্তাযুক্ত কিংবা ভয় পেতে দেখিনি।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের পেশাজীবনে আমরা ওষুধ ও চিকিৎসার সাহায্যে যেসব সমস্যার সমাধান করি, সেসব সমস্যার অনেকগুলো রোগীর মানসিক প্রশান্তি বিধান করে এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েও সমাধান করতে পারি। আত্মবিশ্বাস মানুষের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে। আর শক্তি যেকোন সমস্যা মোকাবেলার জন্য অপরিহার্য। যেমন ধূমপান বর্জন করার অন্যতম হাতিয়ার ইচ্ছা। তেমনি টেনশন থেকে মুক্তি পাবার জন্যও প্রথমেই দরকার টেনশনমুক্ত হবার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা থাকে এবং এটাকে যদি সৎপথে পরিচালিত করা হয় আর বাইরে থেকেও একে সহযোগিতা করা হয় তবে শুধু ইচ্ছার মাধ্যমেই অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

শেষে কয়েকটা রোগের নাম উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করা যুক্তিসঙ্গত হবে। মাথা ধরার কথা আগেই বলেছি। অনেকে আছেন যাঁদের নাক দিয়ে পানি পড়ে। গলা–বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েও কোনও কাজ হয় না। বারবার পানি পড়ে। হয়ত কোথাও যাচ্ছেন। সাথে রুমাল নেই। হাত দিয়ে মোছা একটি অস্বস্তিকর ব্যাপার। সে সময় দেখবেন নাকের পানি বেশি করে পড়ে। এটা এক ধরনের এলার্জি। আসল কথা হচ্ছে এলার্জির চাইতে মনের দুর্বলতার জন্য এসব পরিস্থিতিতে এসব আরও বেশি হয়। আর হাঁচি আরেকটা সমস্যা। আপনি একটু চিন্তাভাবনা করলে বুঝতে পারবেন ভয়ের কারণে নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে কিংবা জটিলতা বাড়তে পারে। হেঁচকি এমন একটি উদাহরণ। যদি কোন কারণে কারও হেঁচকি উঠে এবং সে যদি চিন্তাগ্রস্ত হয় কিংবা ভয় করে তাহলে সেটা বাড়তেই থাকবে। চিন্তা থেকে যদি এমন অবস্থায় কাউকে মুক্ত করা যায় কিংবা অন্যদিকে তার মন ফিরিয়ে নেয়া যায় তাহলে সে অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে।

আমাদের গ্রাম এলাকায় যখন ছোট বাচ্চাদের হেঁচকি উঠে তখন বাবা–মা বা মুরুব্বীরা তাদের বলেন, 'তুমি চুরি করেছ।' বাচ্চারা সাথে সাথে রেগে যায়। তাঁরা জানেন এতে তাদের মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়। ফলে হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। যদি বক্তৃতা দেয়া বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করার ব্যাপার থাকে তখন হেঁচকি বন্ধ করা যায় না। আমি আজ পর্যন্ত এমন কোনও গায়িকাকে দেখিনি যাঁর গলায় কোন–না–কোন সমস্যা নেই। এ হল টেনশনের অন্যতম প্রতিফলন।

কারও কারও শরীর এমনভাবে চুলকায় যে চুলকাতে চুলকাতে শরীরের আর কিছু বাদ থাকে না, সব লাল হয়ে যায়। দাগ পড়ে যায়। একদিন এক মহিলা এসে বললেন, আজ তাঁর মেয়ের বিয়ে। সেই মেয়ের সমস্ত গায়ে এবং মুখে আর্টেকেরিয়ায় ভরে গেছে। আমি অবশ্য তাৎক্ষণিক সুস্থতার জন্য ওষুধ দিয়েছি। কিন্তু পরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারলে সে নিজেই তার অবস্থার উন্নতি করতে পারত। কারণ অসুখ বড় কথা নয়, বিয়ের ভয় থেকেই তার এ সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

কিছু রোগ আছে মানসিক দৌর্বল্য যেগুলোর লক্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। এজন্যই বললাম আত্মবিশ্বাস যাঁদের আছে, তাঁরা তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হয়ে উঠতে পারেন। একজন চিকিৎসক হিসেবেই বলছি, শুধু টেবলেট মিকশ্চার বা প্রেসক্রিপশন দিয়ে সব রোগমুক্তি সম্ভব নয়। প্রত্যেক রোগের জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন নেই। সামাজিক, পারিবারিক, মানসিক ইত্যাদি নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকেও রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এসব রোগজীবাণু অণুবীক্ষণে দেখা যায় না। কিন্তু সাদা চোখেই ধরা পড়ে।

শুধু পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন নয়, মানসিক পরিবর্তন — মনকে শক্তি দেয়া, সাহস দেয়া টেনশনমুক্তির অন্যতম উপায়। এর প্রয়োজনীয়তা ছিল, আছে, থাকবে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে, প্রতিটি সমাজে আমির-ফকির জ্ঞানী-মূর্খ যে-ই হোন না কোনও-না-কোনও সময়ে তাঁর 'টেনশন' হবেই। টেনশন থেকে মুক্তির পথও আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসবে। সবাই এ সমস্যাটি যত সহজে যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন ততই মঙ্গল। মনে রাখতে হবে শরীর ও মন অবিচ্ছেদ্য। শরীরের চেয়ে মনের গতি, শক্তি, পরিধি সবই ব্যাপক। বহুলাংশে সীমাহীন।

* যোগ ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'টেনশনমুক্ত জীবনের জন্য শিথিলায়ন'-শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে লেখকের বক্তৃতার প্রবন্ধরূপ।

গ্রন্থকারের সাথে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাক্ষাৎকার

বাংলার বাণী ২৭ জুলাই, ১৯৮২

দেশের প্রয়োজনে প্রণীত নীতি বানচালের চক্রান্ত চলেছে ক্ষতিকর ওষুধ সম্পর্কে চিকিৎসকদের সচেতন করে তুলতে হবে সর্বপ্রথম

প্রফেসর নুরুল ইসলাম বলেছেন সরকারের ঘোষিত নতুন জাতীয় ওষুধনীতিকে সফল করতে হলে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধ সম্পর্কে সর্বপ্রথম দেশের চিকিৎসকসমাজকে সচেতন করতে হবে। এসব বিষয়ে তাঁদের যথাযথভাবে প্রভাবিত করে জাতি ও জনগণের সার্বিক স্বার্থ সম্পর্কে দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে। কারণ ওষুধের প্রেসক্রিপশন তাঁরাই লেখেন।

'বাংলার বাণী'তে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইন্‌স্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন এ্যান্ড রিসার্চ ও পি.জি. হাসপাতালের পরিচালক, জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়নের জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ চিকিৎসক প্রফেসর নুরুল ইসলাম এ কথা বলেন।

তিনি বলেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ও বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে যেসব ওষুধ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং জাতীয় ওষুধনীতিতে যেগুলোকে বাদ দেয়ার কথা বলা হয়েছে সেসব ওষুধ সম্পর্কে মেডিকেল স্টুডেন্টদেরও পর্যন্ত জ্ঞান দিতে হবে। সাথে-সাথে সেমিনার, আলোচনাসভা অনুষ্ঠান, পত্রপত্রিকা টেলিভিশন ও রেডিওসহ সকল তথ্যমাধ্যমে প্রচার চালিয়ে এসব বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত ও সচেতন করতে হবে। আর প্রত্যেক

ফার্মেসীতে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক বলে ঘোষিত ওষুধের তালিকা টাঙান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

ডা: ইসলাম জানান নতুন ওষুধনীতি গ্রহণের ফলে বছরে ৬০ থেকে ৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে। কারণ অহেতুক ওষুধ বন্ধ হবে।

এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রফেসর ইসলাম ছাড়াও বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য প্রফেসর আবদুল মান্নান, ডা: আজিজুর রহমান, ডা: এম.কিউ.কে. তালুকদার ও ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দানে প্রফেসর ইসলামকে সাহায্য করেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

বর্তমান ওষুধনীতি গ্রহণের পটভূমি ব্যাখ্যাকালে প্রফেসর ইসলাম বলেন মাত্র তের দিনে এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে যে বক্তব্য রাখা হচ্ছে তা ঠিক নয়। এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে স্বাধীনতা লাভের ঠিক পর থেকেই। বিগত দশ বছর ধরে বিভিন্ন ফোরামে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধ সম্পর্কে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রণীত ১৯৪০ সালের ওষুধনীতির দুর্বলতা সম্পর্কে আমরা বারবার বলেছি। কিন্তু এতদিন পর বর্তমান সরকারের আমলেই শুধু আমরা পুরাতন নীতির আমূল পরিবর্তন করে নতুন জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়নে সক্ষম হয়েছি।

মাত্র ৩০টা ওষুধ বাদ গেছে

প্রফেসর ইসলাম বলেন নতুন নীতিতে ১৭০০ ওষুধ বাদ দেয়া হয়েছে বলে কেউ কেউ জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন ; আসলে তা ঠিক নয়। বাংলাদেশে মূল ওষুধ ছিল মাত্র ১৫০টি। তাকেই বিভিন্ন কোম্পানী ৪০০০ বিভিন্ন নাম দিয়ে চালায়। এই মূল ওষুধ থেকে মাত্র ৩০টি ওষুধ বাদ গেছে।

উল্লেখ্য যে, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাদ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৯৭২ সালেই। স্বাধীনতার পরে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়, তাতে ডা: ইসলামসহ বর্তমান কমিটির আরও তিনজন সদস্য ছিলেন। তদানীন্তন কমিটি যে প্রক্রিয়া শুরু করে তারই ফলে এখানে প্রচলিত স্বাধীনতা-পূর্ব কালের ৮০০০ ওষুধের সংখ্যা ১৯৮১ সালে কমে ৪১৪০টিতে দাঁড়ায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তখনও মূল ১৫০টি ওষুধ বিভিন্ন কোম্পানী বিভিন্ন ব্রান্ডে বা নামে ৮০০০ ওষুধ হিসেবে চালাত।

প্রফেসর ইসলাম বলেন, নতুন ওষুধনীতিতে সাধারণ সব রোগের চিকিৎসার জন্য ১৫০টি ওষুধকে অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে বলা হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষতিকারক নয় হিসেবে ১২টি ওষুধ গ্রাম-পর্যায়ে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ক্ষতিকারক নয় বলে এসব ওষুধের জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীরাও ব্যবস্থাপত্র দিতে পারবেন। ক্যান্সারসহ অন্যান্য অতি জটিল রোগের জন্য আরও ১০০টি ওষুধ নির্দিষ্ট আছে, যার জন্য শুধু বিশেষজ্ঞরাই প্রেসক্রিপ্শন দেবেন।

কোন সংকট হবে না

এক প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর ইসলাম বলেন, যেসব ওষুধ বন্ধ করা হয়েছে তা অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক, তার জন্য শূন্যতা কিংবা সংকট সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। কারণ মানুষের রোগের চিকিৎসার জন্য যা দরকারী ও উপকারী তা তো ঠিকই রয়ে গেছে। বরং অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধ ব্যবহারে যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিত ও নতুন রোগ সৃষ্টি করত, তা বন্ধ হলে মানুষের দৈহিক ও আর্থিক দু'দিকেই লাভ হবে। আসলে দরকারী ওষুধের কোন ক্রাইসিস হবে না, 'রাদার দেয়ার শ্যাল বি এ ক্রাইসিস অফ লস ফর সাম'। যারা অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করে জনগণকে ঠকিয়ে মুনাফা করত, তাদেরই সংকট দেখা দেবে।

হৈ-চৈ ও চক্রান্ত

ওষুধনীতি ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এর বিরোধিতায় কোন-কোন মহলের সক্রিয় তৎপরতা প্রসঙ্গে প্রফেসর ইসলাম বলেন, ওষুধনীতি নিয়ে বিশেষ মহলের হৈ-চৈ-এর প্রধান কারণ তাদের দীর্ঘদিনের প্রতারণার মুখোশ খসে পড়েছে। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বেচে আর অল্প খরচে অতি মুনাফা করা যাবে না। মিথ্যা প্রচারের ফানুস উড়িয়ে আর মানুষকে ভুলান যাবে না।

অনেকে এই ওষুধনীতির জন্য তাঁকেই দায়ী করছেন কেন? এ প্রশ্ন করলে প্রফেসর ইসলাম হেসে বলেন, আমি জনগণের বেশি উপকার করছি বলেই মনে হয়। এ ধরনের বিরোধিতা বা দোষারোপ নতুন নয়। স্বাধীনতার পরে বিশেষজ্ঞ কমিটি যখন অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধ বাদ দেয়ার কাজ শুরু করে, তখনও এ ধরনের হৈ-চৈ ও বিরোধিতা হয়েছে।

তিনি বলেন, কোন দেশে কি ওষুধ চলবে এবং তার উপকারিতা-অপকারিতা

সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জনগণের শিক্ষাগত অবস্থার উপর নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে যে-দেশে শতকরা মাত্র ২০ ভাগ ওষুধ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুসারে কেনা হয়, অপরদিকে সরাসরি হাটবাজার বা ফার্মেসী থেকে মানুষ শতকরা ৮০ ভাগ ওষুধ কেনেন, সেখানে সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে এ রকম ওষুধ থাকাই উচিত নয়। তিনি বলেন অতীতে আমার বিরুদ্ধে দস্তগীর কমিটি গঠিত হয়েছিল, তদন্তশেষে তা যে রিপোর্ট দেয় তা আর প্রকাশিত হয়নি। কারণ এই কমিটি আমার কার্যক্রমে কোন দোষ না পেয়ে প্রকারান্তরে আমার পক্ষেই মতামত প্রকাশ করে।

আমরা আগেই সন্দেহ করেছিলাম নতুন ওষুধনীতি নিয়ে বেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। সেজন্য আমরা বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধে একথা বলেছি যে, কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এই ওষুধনীতি মনঃপূত না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বলেন, নতুন ওষুধনীতি বানচাল করার জন্য একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। এর মাধ্যম হল ওষুধনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক বলে ঘোষিত ওষুধ সম্পর্কে ভুল ও অসত্য তথ্য পরিবেশন করে জনমনে সংশয় সৃষ্টি, বাদ দেয়া ওষুধের উপকারিতা সম্পর্কে মনগড়া বক্তব্য প্রচার, ওষুধের সংকট সম্পর্কে গুজব ছড়ান প্রভৃতি।

কথাপ্রসঙ্গে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন কাশির ওষুধ বা কফ্ মিকশ্চারের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব অপ্রয়োজনীয় ওষুধে লাভের পরিমাণ অনেক বেশি। কারণ এর জন্য কোন দামী উপকরণের প্রয়োজন হয় না। সর্দি-কাশির ওষুধে আফিমজাতীয় পদার্থ থাকে। এর আসক্তির কারণে হোক কিংবা অল্প খরচের ফলে রোগীর মনে যে বিশ্বাস জন্মায় তার জন্য হোক, এসব বেশি চলে। লাভ প্রচুর বলে ব্যবসায়ীদেরও নজর সেদিকে বেশি, তাই প্রয়োজনীয়তা কম থাকলেও এগুলোই বেশি তৈরি করা হয়। এগুলো জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচলিত এবং লাভজনক বলে অনেক কোম্পানী বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তাদের পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চমানের অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি বন্ধ করে এসবই তৈরি করে। যে-কোন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর বিক্রির হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, তাদের প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় ওষুধের বিক্রির হার এবং সে অনুপাতে লাভের পরিমাণও অনেক বেশি। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এত বছরের মধ্যে এসব কোম্পানী যদি প্রয়োজনীয় ও দরকারী ওষুধ তৈরিতে নজর দিত ও অধিক পরিমাণে তৈরি করত, তাহলে বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে যে পরিমাণ ওষুধ আমদানি করা হয়,

নিশ্চিতভাবেই তা বহুলাংশে কমে যেত। আমাদের এখনও বছরে প্রায় ৩০ কোটি টাকার ওষুধ আমদানি করতে হয়।

তিনি বলেন, বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সাধারণ কাশিতে গরম পানি খেয়ে যে ফল পাওয়া যায় তার বেশি কোন কফ্ মিকশ্চার দিতে পারে না। অন্যদিকে আসল রোগের চিকিৎসা না করে অনেক ক্ষেত্রে কাশির মতো লক্ষণের চিকিৎসা করতে গিয়ে শুধু অহেতুক পয়সা খরচই নয়, মূল রোগের জটিলতাও বেড়ে যেতে পারে। যেমন একজন যক্ষ্মা রোগী যদি বিজ্ঞাপনের কুহকে কাশির ওষুধ খান তাহলে তাঁর আসল রোগের চিকিৎসা হবে না। কিন্তু গড়ে উঠা অন্ধ বিশ্বাসের ফলে সাময়িক উপশম হতে পারে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর ইসলাম বলেন, নতুন ওষুধনীতির ফলে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, এ নীতির জন্য অভিনন্দন আসবে কেন।

তিনি বলেন, অনেকে স্বাস্থ্যনীতির আগে ওষুধনীতি প্রণয়নের সমালোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য : স্বাস্থ্যনীতি ও ওষুধনীতি পরস্পরের সম্পূরক। ওষুধনীতি স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কাজকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে। আমাদের আশু প্রয়োজন রোগের চিকিৎসা, তাই ওষুধনীতিকে ধরেছি।

তিনি বলেন, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক বলে আমরা যে ওষুধ বন্ধ করেছি তার প্রত্যেকটির কারণ বলেছি। কোনটিই খামখেয়ালি করে করিনি। বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে তার উল্লেখ আছে। কোন্ নীতিমালা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে, কি কারণ দেখিয়ে আমরা এসব ওষুধ বন্ধ করেছি, তা জনগণের কাছে তুলে ধরা সরকারের কর্তব্য।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা

অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবসা বন্ধ করতে হবে

'ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগী মারা গেল' — বিচিত্রার সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক এ বাক্যটির সঙ্গে কমবেশি পরিচিত। বিশেষ করে যাঁরা স্কুলে বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের দু'টো ঘটনার মধ্যে সময়ের পার্থক্য নিরূপণে বেগ পেতে হয়েছে। বাংলাদেশের এই সনাতনী বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে।

সাম্প্রতিককালে সে বাস্তবতায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। টেলিভিশনের দর্শকরা একটি বিজ্ঞাপন হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন। যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় আবেদন হিসেবে — 'একজন মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। যদি কারও কাছে . . . ওষুধটি থেকে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে . . . টেলিফোনে যোগাযোগ করুন।'

প্রায় দু'শ ওষুধনির্মাতা প্রতিষ্ঠান যখন সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের জন্য বিভিন্ন নাম ও মাত্রার প্রায় দু'হাজার ওষুধ তৈরি করছে তখন এই হচ্ছে আমাদের বাস্তবতা। বাজারে প্রয়োজনীয় ওষুধ নেই অথবা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ছড়াছড়ি। সুন্দর মোড়কে সরবরাহকৃত ওষুধ ক্রেতাসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে হলেও প্রয়োজন বা জীবন বাঁচানর তাগিদ কোন নিষেধ মানে না।

অসুস্থ হলে ডাক্তার চাই, চাই ওষুধ। আধুনিক মানুষের এ সমস্যা নিত্যদিনের। এ সমস্যার কারণেই মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছে ওষুধ কোম্পানীগুলো। বাজারজাত করেছে বিভিন্ন লেবেলের ওষুধ, বাস্তবে যার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশে সে সমস্যা আরও প্রকট। ১০ কোটি জনগণের স্বাস্থ্য–সুবিধে নিশ্চিত করার জন্য বাজার ছেয়ে গেছে অপ্রয়োজনীয় ওষুধে। ডাক্তার, হাসপাতাল, রোগী, সবাই আটকা পড়েছেন ওষুধের বেড়াজালে। আর ওষুধ বিক্রি করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে বহুজাতিক সংস্থাগুলো।

হরহামেশা ছোটখাট অসুস্থতায় বিজ্ঞাপনের চমকে বন্দী মানুষ। ডাক্তারের শরণাপন্ন না হয়ে ছুটেন ওষুধ–বিক্রেতার কাছে। পরিণতিতে আলসারের ভয়ে যিনি এসপিরিন খান না তিনিই বিনাদ্বিধায় সেবন করছেন প্যারাপাইরিন। যে

প্যারাপাইরিনে নির্মাতার ভাষাতেই রয়েছে পূর্ণমাত্রার এসপিরিন। নির্মাতা সুকৌশলে তা লিখে দিয়েছে ওষুধের গায়ে যাতে সরকারী আইনের নিয়ন্ত্রণে পড়তে না হয়। সেইসঙ্গে জনপ্রিয়তার খরচ পুষিয়ে নেবার জন্য ক্রেতার উপর চাপিয়ে দিয়েছে বাড়তি পাঁচ পয়সার বোঝা। অথচ কোনভাবেই প্যারাপাইরিনের বাড়তি দাম যুক্তির ধোপে টেকে না।

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার ওষুধনির্মাতাদের চাপেই দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। সম্প্রতি এমন সব ওষুধের দাম বাড়ান হয়েছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

অনুন্নত বিশ্বের জ্ঞানবর্জিত মানুষ সন্দেহ পোষণ করেন না বলেই ওষুধনির্মাতা বহুজাতিক সংস্থাগুলো ক্রমাগত এমন সব ওষুধ বাজারজাত করছে যা উন্নত বিশ্বে নিষিদ্ধ। কিন্তু সমস্যার সমাধান কোথায়?

বাংলাদেশে যে ওষুধ উৎপাদিত হয় তার শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন করে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলো। এরা আবার দু'ধরনের। অনেকেরই বাংলাদেশে ওষুধ তৈরির কারখানা থাকলেও বেশ কিছু কোম্পানী রয়েছে যাদের কোন কারখানা এখানে নেই। তারা অন্যের যন্ত্রপাতি ভাড়া নিয়ে ওষুধ তৈরি করে নিজেদের লেবেল লাগিয়ে বাজারে ছেড়ে দেয়। আর ওষুধ তৈরির এই প্রক্রিয়ায় বন্দী হবার ফলে বাংলাদেশকে দিতে হচ্ছে কাঁচামাল আমদানির জন্য কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। বছরের পর বছর সাধারণ মানুষের জন্য ওষুধ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা হচ্ছে বিঘ্নিত।

বর্তমান সরকারের কৃচ্ছ্রতাসাধনের ও ব্যাপক মানুষের জন্য জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানর ঘোষিত নীতির প্রেক্ষিতে সময় এসেছে বর্তমান ওষুধনীতিমালার পুনর্মূল্যায়ন। অপ্রয়োজনীয় ওষুধের কাঁচামাল আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ করতে হবে।

যে-কোন ওষুধ বিশেষ কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে এটা প্রমাণিত। একই ওষুধ তৈরিতে যখন বহু উপাদান ব্যবহৃত হয় তখন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

ওষুধ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যেহেতু সবসময় আমাদের কাছে আসে না তাই অজ্ঞতা আমাদের গ্রাস করে। আর এ কারণেই ক্যান্সার হতে পারে এমন ওষুধ মেন্সট্রোজেন টেবলেট বিক্রি হচ্ছে আমাদের বাজারে। লাভ করছে বর্ধিত মূল্যের সুবিধে। এর সুযোগে হাটে, ঘাটে, গঞ্জে, বাজারে, ট্রেনে, বাসে বিক্রি হচ্ছে

ডেকয়ডিন টেবলেট, যার কোন সুফল এখনও প্রমাণিত হয়নি। মদ বিক্রি বন্ধ হলেও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কালমেঘ, যার ভেতরে এলকোহলের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ।

জনগণকে তাই সচেতন হতে হবে। ওষুধ গ্রহণের আগে জানতে হবে 'কেন এই ওষুধ?' কেননা শারীরিক দুর্বলতার জন্য আমরা প্রায়ই এমন সব ভিটামিন গ্রহণ করি যার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কার শরীরে কোন ধরনের ভিটামিন প্রয়োজন তা যাচাই না করে ব্যবস্থাপত্রে লিখে দেয়া হয় মালটিভিটামিন টেবলেট বা সিরাপ। সবসময় যে ডাক্তার ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেন এমন নয়। রোগীরাও এজন্য চাপ দিয়ে থাকেন।

প্রফেসর ইসলাম মনে করেন বাংলাদেশে চিকিৎসাপেশায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের অনুসরণ করা হয়ে আসছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা সিনিয়রদের অনুসরণ করেন। উচ্চশিক্ষিত কিংবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা কোন্ রোগে কোন্ প্রেসক্রিপ্শন করেন তা অনুসরণ করেন তার চেয়ে একটু নবীন কম অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা। ঢাকার বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করেন জেলা শহরের চিকিৎসকরা। তাঁদের অনুসরণ করেন তাঁদের নিম্নস্তরে কার্যরত চিকিৎসকরা। এবং শিক্ষিত চিকিৎসকদের অনুসরণ করেন গ্রামের অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত চিকিৎসকরা। গ্রামের এই চিকিৎসকদের কেউ কেউ কোন ট্রেনিং পেয়েছেন, কেউ কেউ পাননি। গ্রামের লোকেরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এই চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। কারণ আমরা ডাক্তার দিতে পারিনি। গ্রামীণ ডাক্তাররা গ্রামবাসীদের জন্য ওষুধ দেন — প্রেসক্রিপ্শন লেখেন।

প্রফেসর ইসলামের এ মন্তব্যের বাস্তবতা মেনে নিলে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরে যিনি রয়েছেন তাঁর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে, উপর থেকে তা যখন সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছায় তখন ব্যবস্থাপত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে। কেননা মধ্যবর্তী পর্যায়ে যুক্ত হয় ওষুধ কোম্পানীগুলোর বিজ্ঞাপন এবং দক্ষ মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের পরামর্শ। সর্বস্তরের ডাক্তার যদি কোন রোগে মাত্র একটি ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেন, তাহলে মধ্যবর্তী পর্যায়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয় অপ্রয়োজনীয় ভিটামিনের বোঝা।

প্রফেসর ইসলাম মনে করেন শিক্ষিত ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র লেখার সময় নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে হবে।

আমাদের সমাজে অনেকে অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধ গ্রহণ করেন। এটা শহরে-গ্রামে সবখানেই চালু আছে। যেমন : 'দাঁতে ব্যথা হয়েছে — এই ওষুধটি

খাও।' এগুলো নির্ভর করে ওষুধ কোম্পানীর চমৎকার মনোহারী বিজ্ঞাপন ও প্রচারের উপর। এসব বিজ্ঞাপনে মনে হয় এক-একটি ওষুধ সংশ্লিষ্ট রোগের জন্য মহৌষধ। এতে নৈতিক দিকের প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু কোন কোম্পানী কতটা নীতিমালা মেনে চলছে, তা মেনে চলানতে আমাদের আইনগত শক্তি কতটুকু আছে তাও একটি প্রশ্ন।

কখনও কখনও বিজ্ঞাপনে এমন মুখ ও ভাষা ব্যবহার করা হয় যা সহজেই মনকে বন্দী করে। প্যারাপাইরিনের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশের সমাজে যাঁরা উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার কারণে মাথাব্যথার শিকার তাঁদের মনকে বন্দী করতে প্যারাপাইরিনের প্রচারে নারীসমাজের একজনের সুন্দর মুখ এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, স্বামী অসুস্থতা নিয়ে ফিরে এলে স্ত্রী বলে দেন প্যারাপাইরিনের কথা, যাতে সে ওষুধ সেবনে 'প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটান যায়'।

গ্রাইপ ওয়াটারের বিজ্ঞাপনেও একই কায়দা। ছোট্ট শিশুর কান্না দিয়ে ব্যাকুল করা হচ্ছে মায়ের মন। যাতে তিনি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসতে পারেন সর্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয় গ্রাইপ ওয়াটার।

বাংলাদেশের গ্রাম-এলাকার শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার এবং প্রায় ৯ হাজার ডাক্তার রয়েছেন শহর এলাকায়। সে অনুযায়ী প্রতি ৪০ হাজার গ্রামবাসীর জন্য ১ জন ডাক্তার এবং শহরে প্রতি ১০ হাজারের জন্য ১ জন ডাক্তার রয়েছেন। কত জনসংখ্যায় কতজন ডাক্তার থাকা আবশ্যক তার কোন আদর্শসংখ্যা নেই। বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা ও ডাক্তারের অনুপাত বিভিন্ন।

বিলাত বা আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশের হাসপাতালে অনেক বেশি সংখ্যক ডাক্তার নিয়োজিত। কিন্তু সে তুলনায় হাসপাতালে রোগীদের সেবার মান মোটেও উন্নত নয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা ডাক্তার-জনসংখ্যার অনুপাত চিকিৎসা-সুবিধা বা সেবার মানের একমাত্র নির্ধারক নয়।

বাংলাদেশে চিকিৎসা-সুবিধা উন্নয়নের জন্য যদি ধরে নেয়া হয় যে ৫ বছরের মধ্যে গ্রামে গ্রামে ডাক্তার পৌঁছান হবে তবে তা হবে অসম্ভব ব্যাপার। আগামী ২০ বছরেও তা সম্ভব হবে না। ২০০০ সালে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে সময়ের মধ্যে 'সবার জন্য সুস্বাস্থ্য', এমন পরিকল্পনা আমরা করছি। সে ভিত্তিতে প্রত্যেক গ্রামে ডাক্তার পাঠান হবে অসম্ভব ব্যাপার। এজন্য করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। তা হল আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যে স্তরেরই হোন না কেন কিছু চিকিৎসা-সুবিধা গ্রহণ করছেন। অশিক্ষিত ডাক্তারের

কাছ থেকে হলেও গ্রামের লোক ওষুধ খাচ্ছেন। এবং গ্রামের ডাক্তার সামান্যতম হলেও উপকার করছেন। বর্তমানে যাঁরা চিকিৎসা করছেন তাঁদের মধ্যে যত জনকে সম্ভব চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করতে হবে। এঁদের ব্যবহারের জন্য যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণের জন্য গ্রাম-ডাক্তারদের সম্মতিও রয়েছে। গ্রামডাক্তারদের ছাড়া শুধু বাংলাদেশে কেন উন্নত দেশেও চিকিৎসাব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না।

বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী যে-কোন কোম্পানীকেই ওষুধ তৈরির জন্য ওষুধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। এ কর্তৃপক্ষের কতগুলো শাখা আছে। এর মাধ্যমে কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন করা হয়। তারপর রেসিপি কমিটি ওষুধের রেজিস্ট্রেশন করে। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোন ওষুধ তৈরি করা যায় না। রেজিস্ট্রেশন দেবার পর যদি দেখা যায় যে ওষুধ খারাপ তবে তার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে রেসিপি কমিটি বিশ্ববাজারে যে-সমস্ত ওষুধ আছে তার রেসিপি অনুযায়ী এখানকার ওষুধের রেসিপি অনুমোদন দিয়ে আসছিল। এখন দেখা যাচ্ছে অনেক ওষুধের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেগুলোর অনুমোদন দেয়া হচ্ছিল। রেসিপি কমিটির সদস্যরা সময়ের অভাবে ওষুধের উপাদান ভাল করে যাচাই করে দেখতে পারেন না। এই সুযোগেই প্যারাসিটামলে মিলিয়ে দেয়া হচ্ছে শতকরা দশ ভাগ এলকোহল।

প্রফেসর ইসলামের ভাষায় ওষুধের রেসিপি অনুমোদন সংক্রান্ত আইন বাংলাদেশে আছে। সে আইনের দুর্বলতা আছে এবং আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রেও বাধা আছে।

দেখা গেছে রেসিপি কমিটি অনুমোদন দিয়েছে এমন সব ওষুধের উপযোগিতা সম্পর্কে রেসিপি কমিটির সদস্যরাই প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন। এর কারণ রেসিপি কমিটির সদস্যদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন। একসময় যে তথ্যের ভিত্তিতে রেসিপি কমিটি অনুমোদন দিয়েছে পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সেসব তথ্য পরিবর্তিত হয়েছে। ওষুধের ক্ষেত্রে এমনটি হয়। দশ বছর আগে যাকে ওষুধ বলে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, দশ বছর পর দেখা গেছে সে ওষুধের কোন কার্যকারিতা নেই।

রেসিপি কমিটির মূল কাজ হচ্ছে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আইন অনুযায়ী কোন ওষুধের রেসিপি অনুমোদন। অনুমোদিত রেসিপি অনুযায়ী কাজ না করলে বর্তমান

আইন অনুযায়ী রেসিপি কমিটি আইন প্রয়োগকারী হিসেবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

বর্তমানে ওষুধ প্রশাসনকে কারও কাছে দায়ী থাকতে হয় না। এমন যদি হয় যে কোন রোগী-ক্রেতা যদি কোন ওষুধ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলেন তবে ওষুধ প্রশাসনকে তার জবাব দিতে হবে, তাহলে ওষুধ প্রশাসন ভাল কাজ করতে পারবে।

আগে যেসব ওষুধের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলোই উপযুক্ত নয়। এগুলো যেভাবে বাজারে পাওয়া যায় সেভাবে পাওয়ার যৌক্তিকতা নেই। এর ফলে অর্থব্যয় করে রোগী যে ওষুধ খাচ্ছেন তার পুরো উপকার তিনি পাচ্ছেন না। কিন্তু সে পয়সা দিয়ে রোগী যদি টনিক না খেয়ে অন্য খাবার খান তাতে তাঁর উপকার বেশি হবে। যেমন বহু ভিটামিন একসঙ্গে বোতলে সিরাপ আকারে মিশিয়ে টনিক হিসেবে খাওয়ানর প্রয়োজন নেই। কারণ এতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন পাওয়া যাচ্ছে না। তার চেয়ে প্রতিটি ভিটামিন আলাদা টেবলেট করে উৎপাদন করলে ডাক্তার প্রয়োজনীয় ভিটামিনের ব্যবস্থাপত্র দিতে পারবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিংবা অন্য কোন সূত্র থেকে কোন ওষুধ সম্পর্কে খারাপ বা অনুপযোগিতার তথ্য পাওয়া গেলে সেগুলো আমাদের দেশে বন্ধ করে দেয়া উচিত। এটা রেসিপি কমিটির দায়িত্ব। কিন্তু এ বিষয়ে আইনের দুর্বলতা এই যে রেসিপি কমিটিকেই প্রমাণ করতে হবে ওষুধটি খারাপ কিংবা তার কোন উপযোগিতা নেই। এতে ওষুধ প্রস্তুতকারক ওষুধটি ভাল বলে দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে যায়।

বাংলাদেশে যেসব ওষুধ তৈরি হয় তার মান নিয়ন্ত্রণ বা পরীক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এতে বাজারে নিম্নমানের ওষুধ আসছে। মান নিয়ন্ত্রক বিভাগ স্থাপন করার জন্য প্রত্যেক প্রস্তুতকারকের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রশ্ন উঠতে পারে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠান সংকটের সম্মুখীন হবে। সংকট থেকে বাঁচাতে হলে সরকারকে কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

বাংলাদেশের ওষুধ উৎপাদনে সবচেয়ে আগে গুরুত্ব দেয়া উচিত মৌলিক কিছু ওষুধ তৈরি করায় যা কিনা সাধারণ রোগসমূহের প্রতিকার করবে। আমাদের দেশের বাজারে যত ওষুধ পাওয়া যায় তার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রয়োজনীয় ওষুধের প্রেসক্রিপশনও বেশি দেয়া হয়। কোম্পানীগুলো দেখছে যে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বেশি চলে বা বেশি বিক্রি হয়। তাই তারা অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরিও করে বেশি। প্রফেসর ইসলাম মনে করেন

অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানা যদি উৎপাদন-ক্ষমতার বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদনে ব্যয় করে তবে তা প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরির লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। এ ধরনের শিল্পের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

যেসব ওষুধের প্রয়োজন নেই সেসব ওষুধের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া উচিত। কি কি ওষুধ প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে তালিকা তৈরি করেছে তার বেশ কয়েকটি বাদ দিয়েও ওষুধ উৎপাদন করে চাহিদা মেটান যেতে পারে। বাংলাদেশের বাজারে ছয়শ'রও বেশি অপ্রয়োজনীয় ওষুধ রয়েছে। এসব ওযুধের জন্য কাঁচামাল আমদানি করতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় না করে তার বদলে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ আমদানি করলে সকল শ্রেণীর রোগীর সুবিধা হত। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বা ওষুধের কাঁচামাল আমদানি করার জন্যই ৭০/৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এভাবে এ টাকা ব্যয় না করে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ তৈরিতে ব্যয় করা উচিত।

বর্তমানে কিছু কিছু টনিক বাজারে চালু আছে যেগুলো পানীয় হিসেবে বাজারজাত করা হয়। যেমন গ্লুকোজ ডি। এতে রয়েছে গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন ডি। অথচ এতে শুধু গ্লুকোজ থাকলেই যথেষ্ট ছিল এবং অন্যগুলোর সংমিশ্রণের ফলে এর দাম বেড়ে গেছে। গ্লুকোজের সঙ্গে বিভিন্ন সংমিশ্রণের বিভিন্ন নাম দিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ এসব সংমিশ্রণের কোন যৌক্তিকতা নেই।

বাংলাদেশে আয়ুর্বেদ এবং কবিরাজী চিকিৎসার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা সুপ্রাচীন এবং যথেষ্ট উপকারীও। কিন্তু বর্তমানে আয়ুর্বেদ ওষুধ প্রস্তুতকারীরা মদের খোলা বাজার তৈরি করে ফেলেছে। প্রফেসর ইসলাম বিদ্রূপ করে বলেন, আয়ুর্বেদ কারখানাকে যদি এভাবে মদ তৈরি করতে দেয়া হয় তবে নীতিগতভাবে মদের কারখানাও চালু করে দেয়া উচিত।

সংবাদপত্র খুললে দেখা যায় যৌনরোগ, হাঁপানি, অর্শ, একশিরা, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের মহৌষধ বা বিনা অস্ত্রোপচারে ভাল করে দেবার বিজ্ঞাপন। এগুলোর কোন কার্যকারিতা আসলে নেই, যে-কোন বিবেকবান মানুষই এ ধরনের বিজ্ঞাপনে আস্থা আনতে পারেন না। কিন্তু সংবাদপত্রে বা প্রচারমাধ্যমে এ ধরনের বিজ্ঞাপনের ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রচারমাধ্যমের নিয়ন্ত্রকরা অল্প

কিছু পয়সার জন্য এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করে প্রকৃতপক্ষে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করছেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে নিজেদের আত্মীয়স্বজনের অসুখে সংবাদপত্র-মালিকরা এ ধরনের ওষুধ গ্রহণ করবেন কি? যদি না করেন তবে এ ধরনের বিজ্ঞাপন ছেপে তাঁরা নীতিবিরুদ্ধ কাজ করছেন। আইন করে এসব বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া উচিত। কারণ জনগণকে কুশিক্ষা এবং ভাঁওতাবাজি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের।

রেজিস্ট্রেশন দেয়ার পরই ওষুধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। নির্দিষ্ট সময় পর পর রেজিস্ট্রেশন পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয় রেসিপি কমিটিতে যেসব ব্যক্তিকে সদস্য মনোনীত করা হবে তাঁদের পেশাগত শিক্ষা অত্যন্ত উচ্চমানের হওয়া উচিত। তাঁদের আধুনিক গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। যে-কোন লোক যে-কোন সময় যদি রেসিপি কমিটিতে আবেদন করেন তবে তা তৎক্ষণাৎ পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের কেন্দ্রীয়ভাবে মান নিয়ন্ত্রক গবেষণাগার বসান উচিত এবং এ গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ওষুধ প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে আদায় করা উচিত।

অনেক কোম্পানী শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন না করে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন করছে। প্রফেসর ইসলাম বলেছেন, 'এরা জনস্বাস্থ্যের জন্য ওষুধ উৎপাদন করে না, নিজেদের স্বাস্থ্য বৃদ্ধিই তাদের লক্ষ্য।'

বাংলাদেশের জনগণ ওষুধ প্রস্তুতকারীদের 'রাধা চক্করে' এখন বন্দী। কিন্তু এ অবস্থা চলতে পারে না। পৃথিবীর বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ (শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা) জনগণের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই ওষুধ সংক্রান্ত নীতিমালার পরিবর্তন করেছে।

আমরা বহুজাতিক ওষুধ উৎপাদনকারীদের পুরোপুরি তাড়িয়ে দিতে চাই না। আমরা চাই এমন ব্যবস্থা, যাতে তাঁরা প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন করবেন, অপ্রয়োজনীয় নয়। সারা বিশ্বে আজ এ ব্যাপারে মতৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

এজন্য এখানে যাঁরা ওষুধ তৈরি করবেন, তাঁদের উৎপাদিত ওষুধের পক্ষে বৈজ্ঞানিক তথ্য হাজির করতে হবে। এ তথ্যের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশনা, বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া, ইউরোপিয়ান ফার্মাকোপিয়া প্রভৃতির উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

সর্বরোগের প্রতিকার হিসেবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার এখন প্রবণতা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একসঙ্গে একটির বেশি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ অত্যন্ত বিপদজনক। আবার টেট্রাসাইক্লিনের মতো এন্টিবায়োটিক শিশুদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। এ ধরনের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া উচিত।

আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রতারিত করা হয় ভিটামিনের নামে। পাশ্চাত্যে যে কারণে ভিটামিন প্রয়োজন, তার অনেকগুলোই আমাদের দেশে অনুপস্থিত। আমাদের যেসব ভিটামিন প্রয়োজন তা আলাদাভাবে প্রয়োজন। যদি প্রতিটি ভিটামিন আলাদা ইউনিট হিসেবে উৎপাদিত হয় তাহলে ভিটামিন ব্যয় বহুলাংশে কমে যাবে। এবং সব ধরনের ভিটামিনই টেবলেট আকারে বাজারে ছাড়তে হবে। প্যাকিং এবং মনোহারী বোতলে বন্দী করে দাম বাড়ান চলবে না। একইসঙ্গে বোতল এবং প্যাকিং-এর জন্য কোম্পানীগুলো ক্রেতাদের কাছ থেকে কোন অর্থ আদায় করতে পারবে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা বিশ্বের জনগণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে ২৪৮টি ওষুধের তালিকা তৈরি করেছে। এর বেশি কোন ওষুধ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা নেই। আমাদেরও সে নিয়ম মেনে চলা উচিত। এ ভিত্তিতেই সর্বনিম্ন পর্যায়ে গ্রাম-ডাক্তারের কাছে ১২টির বেশি ওষুধ থাকবে না। গ্রামডাক্তাররা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পর শুধু এ ওষুধগুলোই ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন, অন্য কোন ওষুধ নয়। একইভাবে নির্ধারিত থাকবে উপরের পর্যায়ের ওষুধের সংখ্যা।

ওষুধের যে চক্রান্তে আমরা আবদ্ধ তা থেকে এখনই জনগণকে মুক্তি দিতে হবে। বেআইনী ঘোষণা করতে হবে প্রায় দু'হাজার ওষুধ। আমরা চাই জীবনরক্ষাকারী ওষুধ যা সুলভ মূল্যে সমস্ত পর্যায়ে পাওয়া যাবে।

ওষুধনীতি প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকার মতামত

গার্ডিয়ান ১৬ই জুলাই, ১৯৮২

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের উচিত বাংলাদেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করা

বাংলাদেশ সরকার এমন একটা ব্যবস্থা নিয়েছেন যা কোন উন্নয়নশীল কিংবা উন্নত দেশেও হয়নি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের উচিত বাংলাদেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবের প্রায় পুরোটাই বাংলাদেশের ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশে অনুসরণ করা হয়েছে।

বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা গার্ডিয়ানের এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ওষুধনীতির ফলে অধিকাংশ বাংলাদেশী তাঁদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ পাবেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত এই সমীক্ষায় বলা হয়, বাংলাদেশ ২৫০টি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা তৈরি করেছে। ২৩৭টি ক্ষতিকারক ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং প্রায় ১ হাজার ৫শ অন্যান্য ওষুধ আস্তে-আস্তে তুলে নিতে বলেছে।

এই ওষুধনীতির ফলে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ক্ষুব্ধ হয়েছে। কারণ তারাই এ দেশের ওষুধের বাজার নিয়ন্ত্রণ করত।

পত্রিকায় বলা হয়, বিশেষজ্ঞ কমিটি যাঁরা এই নীতি প্রণয়ন করেছেন, তাঁরাই ক্ষতিকারক ওষুধ চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক, মাল্টিভিটামিন, কফ্ সিরাপ, গ্রাইপ ওয়াটার, অতিমাত্রার এলকোহল-মিশ্রিত উপাদান, এনাবলিক (যা বিশেষভাবে শিশুদের দেয়া হয়), ক্লিওকুইনসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক ওষুধ।

সমীক্ষায় বলা হয়, যারা হাসপাতালের বিপদজনক ওষুধ খোলা বাজারে বিক্রি করবে, তাদের জরিমানা করার ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছে।

ট্রিবিউন

৩১ জুলাই, ১৯৮২

বাসস জানায়, লন্ডনের প্রভাবশালী দৈনিক 'দি ট্রিবিউন' বলেছে, বাংলাদেশ সরকারের নতুন ওষুধনীতি বৎসরে ২০ লক্ষ পাউন্ড বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সক্ষম হবে এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহে সরকার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তা করবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রিকার এক ভাষ্যে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রস্তুতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে স্থানীয় শিল্পকে সুবিধাদি প্রদানে আগ্রহী, লাইসেন্স সংক্রান্ত বর্তমান চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং স্থানীয় প্রস্তুতকারকগণ যে সকল ওষুধ প্রস্তুত করবেন সেগুলি বহুজাতিক কোম্পানীগুলিকে আর আমদানি করতে দেয়া হবে না।

নতুন নীতিতে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলি অসন্তুষ্ট। বাংলাদেশের সূত্র আভাস দিয়েছেন যে, কতিপয় বৃহৎ কোম্পানী অত্যাবশ্যকীয় ওষুধসহ দেশে সকল উৎপাদন–সুবিধাদি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার হুমকি দিচ্ছে।

বাংলাদেশে বৎসরে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ডের ওষুধের বাজার রয়েছে। যদিও সেখানে ১ শ ৭৬টি কোম্পানী ওষুধ প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত, তথাপি বাংলাদেশের বাজারের শতকরা ৮০ ভাগ মাত্র ৮টি বহুজাতিক কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করছে।

ইন্ডিয়া টু–ডে

২৩ অক্টোবর, ১৯৮২

বাংলাদেশ দেখিয়ে দিল

ভারতবর্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরাপদ নয় এমন সব ওষুধের জন্য বর্তমানে যাঁরা মৌলিক নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে ব্যস্ত, বাংলাদেশ তাঁদের জন্য উদাহরণ হতে পারে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ তার বাজারজাত ওষুধের প্রায় অর্ধেকের উপরই বিক্রয়–নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

প্রায় চার হাজার প্রচলিত ওষুধের মধ্যে দু'শ সাঁইত্রিশটি ক্ষতিকারক বলে বাতিল করা হয়েছে এবং বাকি পনের'শ পাঁচটি ওষুধ অপ্রয়োজনীয় বলে আগামী ন' মাসের মধ্যে বাজার থেকে তুলে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞা এমন সব ওষুধের উপর আরোপ করা হয়েছে যেগুলোর বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থামূলক অভিযান ভারতেও চলে আসছে।

যেমন একাধিক এন্টিবায়োটিকের সংযোজন, বিভিন্ন বেদনানাশক ওষুধের সংযোজন, সংমিশ্রিত কাশির ওষুধ, টনিক, বলবর্ধক স্ট্যারয়েড লজেন্স, বিতর্কিত ডায়রিয়ার ওষুধ এবং বেশি এলকোহলযুক্ত ওষুধসমূহ।

ঢাকায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেজর জেনারেল শামসুল হক ওষুধনীতি ঘোষণা করে বলেন যে, এর লক্ষ্য হল ওষুধের গুণগত মান ও উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধসমূহ সহজলভ্য করা।

প্রখ্যাত চিকিৎসক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে প্রধান করে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশক্রমে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়।

ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত অতিপ্রয়োজনীয় ২২০টি ওষুধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি বহুলাংশে দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারে। অথচ এই উদ্যোগের প্রতি কোন–কোন মহল ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে।

দেশে শতকরা ৮০ ভাগ ওষুধ মাত্র আটটি বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। নতুন ওষুধনীতি শুধু পদ্মা নয় পটোমাককেও প্রদীপ্ত করেছে।

আমেরিকান কোম্পানীগুলো নগ্নভাগে এই ওষুধনীতি সংশোধনের জন্য বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করতে প্রয়াস পাচ্ছে এবং কোন কোন কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করার হুমকিও দেয়।

ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন — ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

সম্পাদকের প্রতি

ওষুধের গুণাগুণ বিচার করা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমি লক্ষ্য করেছি, কতগুলো ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এবং কতগুলো পশ্চিমা দেশ তথা যুক্তরাষ্ট্রেও অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত হয়েছে। প্রশ্ন জাগে এ ধরনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিদেশে 'যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার্থে' অপ্রয়োজনীয়

এবং ক্ষতিকর ওষুধ বিদেশে চালু রাখার সুপারিশ করবেন, এটা কি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ চান?

ওষুধশিল্পের প্রতি সমঝোতার বশবর্তী হয়ে মস্তিষ্কের ক্ষতিকারক, এমনকি অন্ধত্বের কারণ হতে পারে এই ধরনের ওষুধ ইচ্ছার বিরুদ্ধে রপ্তানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থে আঘাত হানবে। বস্তুতঃ এই ধরনের প্রক্রিয়া উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবে।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে, শুধু অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ নয়, আমাদের পশ্চিমা দেশগুলোও তা অনুসরণ করবে। এখানে ওষুধ প্রস্তুত এবং বাজারজাত করার যে ব্যবস্থা চালু আছে, সেটাকে আরও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকারের ওষুধনীতিকে বিশ্ববাসীর সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটা প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সদরুদ্দিন আগা খান
জেনেভা

গ্রন্থকারের কাছে কয়েকটি চিঠি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

প্রিয় অধ্যাপক ইসলাম,

আপনার ২৩ জুন, ১৯৮২ সালের চিঠি এবং তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ সরকারের ড্রাগ কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ সালের একখানা কপি আমার কাছে পাঠিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।

আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের ওষুধনীতি এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা প্রণীত হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত।

জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়নে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ নির্বাচনে ভবিষ্যতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আপনাদের মতামত এবং উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী।

আপনারই বিশ্বস্ত
ডা: বি শংকরন
পরিচালক
ডিভিশন অব ডায়াগনোসটিক,
থেরাপিউটিক এন্ড রিহেবিলিটেটিভ
টেকনোলজী

জেনেভা
২৭শে জুলাই, ১৯৮২

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রান্সিসকো

প্রিয় অধ্যাপক ইসলাম,

আমি যুক্তরাষ্ট্র তথা সারা বিশ্বে প্রেসক্রিপশন এবং ওষুধনীতির সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছি।

এ-বিষয়ে বিগত ১৫ বছর ধরে আমি পর্যবেক্ষণ করে আসছি। ১৯৬৫–৬৯ সাল পর্যন্ত আমি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ বিভাগে সহকারী সচিব ছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধনীতির উপর দু'টো গবেষণায় ড: মিলটনের সাথে আমি জড়িত। এগুলো হল 'পিল্‌স্‌, প্রফিট এন্ড পলিটিক্স' এবং 'পিল্‌স্‌ এন্ড দি পাবলিক

পার্স'। এছাড়া 'প্রেসক্রিপ্‌শন ফর ডেথ' গ্রন্থে ড: সিলভারম্যান এবং মিয়া লিডেকার–এর সাথে আমিও গ্রন্থকার। এ বই ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস থেকে এ বছর প্রকাশিত।

সম্প্রতি আপনার নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি ও বাংলাদেশের জাতীয় ওষুধনীতি সম্বন্ধে আমি অবগত হয়েছি। আমার মতে আপনার কমিটির সুপারিশ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এতে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ওষুধ থেকে জনসাধারণ রেহাই পাবেন। ওষুধের জন্য বরাদ্দ টাকা যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহৃত হবে।

আমরা জানি এ ধরনের কাজ সমাধা করা তত সহজ নয়। তবে নিঃসন্দেহে আপনার কমিটি একটা সংকটময় পরিবেশে অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছে। এই অবদান শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সারা বিশ্বের জন্য।

আপনারই অনুগত
ফিলিপ আর লি
অধ্যাপক, সোশ্যাল মেডিসিন

১৭ আগষ্ট, ১৯৮২

ইউনাইটেড নেশান্স কনফারেন্স অন ট্রেড এন্ড ডেভেলাপমেন্ট

প্রিয় অধ্যাপক ইসলাম,

আপনার দেশের জন্য একটা উন্নতমানের ওষুধনীতি প্রণয়নে আপনি যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এজন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আমরা মনে করি বাংলাদেশের ওষুধনীতি বিশ্বের যত বেশি অধিবাসীর সামনে তুলে ধরা যাবে, ততই মঙ্গল। সেজন্য আমি আপনার কমিটির রিপোর্ট 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলাপমেন্ট'–এর 'ওষুধ' শীর্ষক বিশেষ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি এই সংখ্যা সম্পাদনা করছি এবং আশা করি মার্চ, ১৯৮৩ সালে এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে।

এই সুযোগে আলাদাভাবে ওষুধপত্রের উপর আমাদের কিছু দলিল আপনার কাছে পাঠালাম। শ্রদ্ধান্তে —

আপনারই বিশ্বস্ত
সুরেন্দ্র জে পেটেল
ডাইরেক্টর
টেকনোলজী ডিভিশন

১০ নভেম্বর, ১৯৮২

লেখকের অন্যান্য বই

১৯৬৩	**A Simplified Tuberculosis Control Programme for East Pakistan**
১৯৬৪	**Tropical Eosinophilia**
১৯৬৯	**Symposium on Medicine**
১৯৭৪	**Essentials of Medical Treatment**
১৯৭৭	**Medical Diagnosis and Treatment, First Edition**
১৯৭৮	স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু কথা
১৯৭৮	**History of IPGMR**
১৯৮০	**Medical Diagnosis and Treatment, Second Edition**
১৯৮৪	প্রেসক্রিপ্শন, প্রথম সংস্করণ
১৯৮৫	**Prescriptions and Professionals**
১৯৮৫	প্রেসক্রিপ্শন, দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯৮৬	প্রেসক্রিপ্শন, পশ্চিম বঙ্গ সংস্করণ
১৯৮৬	পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, প্রথম সংস্করণ
১৯৮৭	**Medical Diagnosis and Treatment, Third Edition**
১৯৯০	পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯৯১	তামাক ও ধূমপান : অভিমত — প্রশ্ন — উত্তর **Tobacco-Smoking : Opinions—Questions—Answers**
১৯৯১	জীবনস্রোতে
১৯৯২	সবাক বিবেক **The Voice of Conscience**
১৯৯৩	কিছু ভাবনা **Some Thoughts**
১৯৯৩	ভাসানী ও শেখ মুজিব (যন্ত্রস্থ)

জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলাম এ দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠ আই. পি.জি.এম আর.এর রূপকার—'ফাউন্ডিং ফাদার' হিসেবেই কেবল নন, অসামান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও তৃতীয় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় ওষুধ নীতির অন্যতম স্রষ্টা হিসেবেও বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী। কর্তব্যানুরাগ তাঁকে শুধু মহান মানুষে পরিণত করেনি, গত পাঁচ দশকের সাধনা ও ত্যাগ তাঁকেই করে তুলেছে এক প্রতিষ্ঠান। তাঁর চিকিৎসা, তাঁর সংস্পর্শ, তাঁর জনভাষণ, গবেষণা ও প্রশাসন, এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বাইরে দূর গাঁয়ে জনজীবনে তাঁর মিশে যাবার দিকগুলো লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। মওলানা ভাসানীর অন্তিম দিনগুলো কেটেছে তাঁরই কাছে। ১৯৮৯ সনে বঙ্গভবনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করার কথা প্রেসিডেন্ট এরশাদ উচ্চারণ করেছেন এ ব্যক্তিত্বকে কাছে রেখে।

জন্ম তাঁর ১৯২৮ সালে ১লা এপ্রিল, চট্টগ্রামে। মা বেগম গুলমেহের তাঁর জীবনে অপরিমেয় প্রভাব রেখেছেন। বাবার নাম সৈয়দুর রহমান। তাঁর দু'মেয়ের নাম দীনা ও নীনা ইসলাম, এক পুত্র আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম। আনোয়ারা ইসলাম তাঁর সহধর্মিণী।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের ১৯৫১র এম.বি.বি.এস. প্রফেসর ইসলাম বিলাতের ওয়েলস ভার্সিটির টি.ডি.ডি.তে প্রথম স্থান অধিকার করার পাঁচ মাসের ব্যবধানে প্রথম পরীক্ষাতেই এম.আর.সি.পি. (এডিন) হয়েছিলেন '৫৬ সনে। ঢাকা, মিটফোর্ড, এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার পর '৬৩ সালে আবার তিনি যান বিলাতে, এবার নাফিল্ড ফেলোশীপে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। এখানেই যকৃৎ রোগের উপর তাঁর ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়। ব্রিটিশ সাময়িকী তাঁকে অভিহিত করেছে আই.পি.জি.এম.আর. এর ফাউন্ডিং ফাদার বলে। '৬৫ থেকে '৮৭র ৩১শে মার্চ জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাঁর হাতে। লন্ডন রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস '৬৭তে বিনা পরীক্ষায় এম.আর.সি.পি. ডিগ্রী দিয়েছে তাঁকে। এ অঞ্চলে এ বিরল সম্মান এটাই ছিল প্রথম। আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শতেক গবেষণা নিবন্ধ। একাডেমী অব সায়েন্সের স্বর্ণপদক বিজয়ী এ চিকিৎসা বিজ্ঞানী '৬৩র প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক, '৮৫র কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, '৭০এর সিতারা-ই-ইমতিয়াজ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৯০ এবং ১৯৯২র স্মারক স্বর্ণপদক, দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ভারতের গোল্ডেন গ্রাহক সেবা পদক এবং পাকিস্তানের মদিনাতুল হিকমতের ওসিকা-এ-আতরাফ-সহ অজস্র পদক অর্জন করেছেন। বিশ্বনন্দিত আধুনিক, আই.এ.এইচ.এস. এবং ইউ.এস.টি.সি.র (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের) তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ইসলামিক মেডিকেল মিশন তাঁরই সৃষ্টি। মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, জাতীয় এইডস্ কমিটি, জনসংখ্যা কাউন্সিল, বার্ডেম নেশানেল কাউন্সিল, একাডেমিক অব সায়েন্সস ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাংলায় তাঁর পুস্তক 'পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ' গ্রন্থ 'প্রেসক্রিপ্শন' ও ইংরেজীতে 'মেডিকেল ডায়াগনোসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট' আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। সুলেখক, অমায়িক ও জনসেবক এ চিকিৎসক রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকসহ অজস্র পেশার মানুষের কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। জাতীয় অধ্যাপক ইসলাম আজও এ দেশের সর্বস্তরের আর্ত মানুষের কাছে নিজেকে হাজির করছেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অক্লান্ত সমাজসেবী-রূপে।-না. মো.

'আধি–ব্যাধির বলিষ্ঠতর মোকাবেলার জন্যে মনকে তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপ্‌শন অতুলনীয় ভূমিকা পালন করবে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

. . . এ প্রেসক্রিপ্‌শন সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে প্রণীত। রোগবিশেষে তাঁর প্রেসক্রিপ্‌শন যেমন অমোঘ গণ্য হয়ে এসেছে, জাতীয় ধ্যানধারণার [চিকিৎসা–সংক্রান্ত] গলদ নিরসনেও একইভাবে ফলপ্রসূ হোক তাঁর নতুন 'প্রেসক্রিপ্‌শন'।
বইটি প্রতিটি ঘরে ঠাঁই পাওয়ার দাবি রাখে।'

দৈনিক বাংলা
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

'এক কথায় চিকিৎসা জগতে বর্তমান জটিলতা কিংবা ব্যাধি থেকে রেহাই পেতে হলে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের 'প্রেসক্রিপ্‌শন' একটা সুযোগ্য প্রেসক্রিপ্‌শন বা ব্যবস্থাপত্র।'

সচিত্র বাংলাদেশ
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

'মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সুখ নিয়ে জঘন্য যে পাপ–ব্যবসা চলেছে তার হুবহু চিত্র তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর একহাত নেবার সাহসী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল ওপার বাংলার যশস্বী চিকিৎসক নুরুল ইসলামের লেখা 'প্রেসক্রিপ্‌শন' বইটিতে . . . অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধ সম্পর্কে সর্বপ্রথম দেশের চিকিৎসক সমাজকে সচেতন এবং দায়িত্বশীল করে তুলতে সাহসী অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সৎ চেষ্টার তুলনা নেই।'

সাপ্তাহিক দেশ
১১ আগস্ট ১৯৮৪, কোলকাতা

'আকর্ষণীয় রচনাবলী পড়তে পড়তে হ্যানরিক ইবসেন রচিত নাটকের ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। তাঁকে গ্রন্থকারের সাথে তুলনা করা চলে। এখানে চিকিৎসক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরাজিত হন। আমি অধ্যাপক ইসলামের সফলতা কামনা করি। কারণ এটা অনস্বীকার্য যে বইটি লিখে তিনি একটি বিরাট জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রত্যেকের জন্যে এটা অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।'

বাংলাদেশ টাইমস্‌
২১ জানুয়ারি ১৯৮৪

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী ওষুধনীতি বিশ্বে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে তৈরি করা হয়। এতে অবশ্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মুনাফাপ্রবণতা দারুণ চোট খায় এবং তারা প্রয়োজনীয় ওষুধ বানাতে বাধ্য হয়।
ওষুধ নীতির প্রেক্ষাপট, চিকিৎসক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে অধ্যাপক ইসলাম 'প্রেসক্রিপ্‌শন' নামে একটি বই লিখেছেন। প্রকাশকাল ১৯৮৪। আলোড়ন তুলেছে পাঠকমহলে। প্রথম সংস্করণ শেষ।
. . . বইটিতে ঘুরে ফিরে যে কথাটা খোলসা করা হয়েছে, তা হল — সব অসুখে ওষুধ লাগে না। অনেকগুলো ওষুধ একসাথে দিলে অনেক উপকার হবে, এসব অযৌক্তিক মিথ্যা ধারণার বশে আমরা আর কতদিন নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকবো? নিতান্ত অসহায় অনেকাংশে নিরুপায় রোগীদের সমস্যাজর্জরিত না করে, সংকটমুক্ত করে এটাকে নীতিগত এবং জাতীয় অনুভূতির মাধ্যমে বিচার করতে হবে।

দৈনিক আজকাল
৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, কোলকাতা